বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ একটি নৈতিক বিশ্লেষণ

মুসতাক আহমদ

RB
B
302.23
AHB
C . 1

Acc: 466278

এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ

এপ্রিল, ২০১২

GIFT

বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ একটি নৈতিক বিশ্লেষণ

মুসতাক আহমদ

Dhaka University Library
466279

466279

এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ
এপ্রিল, ২০১২

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আমার বাবা

মরহুম আবুল কাসেম

আমার মা

সেতারা বেগম

466270

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ একটি নৈতিক বিশ্লেষণ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার এম. ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষণা কর্ম। এই অভিসন্দর্ভটি তথ্যসূত্রে উল্লেখিত তথ্য ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের অনুকরণে রচনা করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি পূর্বে কোথাও প্রকাশ বা ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

মুসতাক আহমদ

(মুসতাক আহমদ)

এম. ফিল. গবেষক

রেজি ঃ নং-৩২

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৪-২০০৫

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ।

466273

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সার্টিফিকেট

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুসতাক আহমদ (রেজিঃ ৩২, শিক্ষাবর্ষঃ ২০০৪-২০০৫, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক উপস্থাপিত **"বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ একটি নৈতিক বিশ্লেষণ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি। অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য জমাদানের অনুমতি দেওয়া হলো।

(অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানম)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধীন ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে আমি এম. ফিল. গবেষণার জন্য নিবন্ধন লাভ করি। আমার এ গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানম। আমি খুবই মুগ্ধ যে, শতভাগ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে ব্যস্ততার মাঝেও একজন শিক্ষক নিজের অকৃত্রিম মাতৃস্নেহে তাঁর ছাত্রকে সব রকম সহযোগিতা, সহানুভূতি, উৎসাহ দিয়ে গবেষণার জগতে নিবেদিত করতে পারেন এবং পাশাপাশি নিজেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মূলত এ গবেষণা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও সক্রিয়তা সহযোগিতা মূল ভূমিকা পালন করেছে। বিগত চারবছরই তিনি গঠনমূলক উপদেশ দিয়েছেন। আমি গভীরভাবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

আরও অনেকের মূল্যবান পরামর্শ ও সক্রিয় সহায়তা নিতে হয়েছে এ গবেষণা কর্ম পরিচালনায়। তাঁদের মধ্যে বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের প্রায় সবাই সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন।

অভিসন্দর্ভ যে ক'টি বিষয়কে সম্পৃক্ত করেছে তার মধ্যে 'গণমাধ্যম' একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। আবার গণমাধ্যমের সঙ্গে দর্শনের মতো বিশেষ করে পরিবেশ নীতিবিদ্যার মতো একটি অধিক তাত্ত্বিক বিষয়কে একীভূত করে গবেষণার মূল কক্ষপথে পরিভ্রমণের জটিল কাজটি সহজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ, তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়েছেন দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব রোবায়েত ফেরদৌস। দর্শন বিভাগের সহকারি অধ্যাপক মোহাম্মদ দাউদ খাঁন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর সহযোগিতা কাজটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

দৈনিক মানবজমীন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, *দৈনিক যুগান্তর* নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল আলম, উপ-সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রতন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে সাইফুল আলম ও রফিকুল ইসলাম রতনের কাছ থেকে বিগত একবছর ধরে নানাভাবে সাহায্য-সহোযোগিতা নিয়েছি। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণাটিতে একটি জরীপ আর আধেয় বিশ্লেষণের আড়ালে আরও একটি জরীপ রয়েছে। এসব কাজের *সময় টেলিভিশনের* সিনিয়র রিপোর্টার আবুল কালাম আজাদ, *আমাদেরসময়* স্টাফ রিপোর্টার মহিউদ্দিন মাহী, *নিউ নেশন* ও *দৈনিক বণিক বার্তার* বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার যথাক্রমে এম এম জসিম ও নূর-ই-আলম

Dhaka University Institutional Repository

পিন্টুসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খাইরুল ইসলাম, নাজমুস সাদাত প্রমুখ তথ্য সংগ্রহসহ আনুষঙ্গিক কাজে আমার সঙ্গে অনেক পরিশ্রম করেছেন। আর কারিগরী বিভিন্ন কাজে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা মোঃ আমিনুর রহমান। তাদের কাছে আমি ঋণী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অষ্টম সেমিস্টারের ছাত্রী আকলিমা আহমদ অনুবাদ ও তথ্য বিশ্লেষণ কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

চূড়ান্তভাবে আমার পরিবারের সদস্যদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাদের অকুণ্ঠ সমর্থন আমাকে গবেষণা কাজে নিবেদিত ও আগ্রহী করেছে। আর সর্বোপরি সুচিন্তিতভাবে এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ঢাকা

এপ্রিল, ২০১২

মুসতাক আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিষ্পাপ ভূক্তভোগী বাংলাদেশ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মানুষের অনৈতিক ও বেপরোয়া ভোগবাদী জীবনের নিষ্ঠুর-নির্মমতার শিকার এ দেশের কোটি কোটি মানুষ। জাতিসংঘের হিসেবে বর্তমানে যে হারে তাপমাত্রা বাড়ছে, তা অব্যাহত থাকলে আগামীতে বাংলাদেশের ১৭ ভাগ ভূমি বঙ্গোপসাগরের পানিতে বিলীন হয়ে যেতে পারে। আমাদের অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগের 'গ্রেটওয়াল' সুন্দরবন আর থাকবে না। অন্যদিকে জনমত গঠন ও জনগণের ওপর প্রভাব সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের বিকল্প গণমাধ্যমই। এমনকি একুশ শতকের গণমাধ্যমকে তার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে 'মানচিত্র প্রণয়নকারী' হিসাবেও বিবেচিত করা হয় (Carvalho and Burgess, 2006)। এই অবস্থায় বাংলাদেশের আসন্ন সম্ভাব্য বিপদে গণমাধ্যমের করণীয় রয়েছে।

বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকার নৈতিক বিশ্লেষণ করতে এ গবেষণা করা হয়েছে। এ গবেষণা পরিচালনার জন্য দেশের মানুষকে নমুনা হিসেবে বেছে নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহর, উপজেলা ও ইউনিয়নের অধিবাসীদের মধ্য থেকে নমুনা করা হয়। গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি (Survey), আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analisis), ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণী পদ্ধতি বা মূলপাঠ বিশ্লেষণ (Textual Analysis), বর্ণনামূলক পদ্ধতির পাশাপাশি আংশিক পর্যবেক্ষণও এ গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোকে পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়িত্ব নিরূপনে সমগ্রবাদ (Holistic) এবং পরিবেশের প্রতি মানুষকে দায়িত্বশীল করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিরূপনে এজেন্ডা সেটিং, গণমাধ্যম ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্ব এবং গণমাধ্যম ব্যবস্থা নির্ভরতা তত্ত্বকে তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। এরবাইরে গবেষণায় বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধানের নিমিত্তে ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ (in-depth interview) বা নিগূঢ় সাক্ষাতকারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা হয়।

গবেষণায় গণমাধ্যমের ব্যাপারে বৃহত্তর জনসমাজ বা পত্রিকার পাঠক, টিভি দর্শক ও রেডিও শ্রোতাদের চমকপ্রদ নানা তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে গণমাধ্যম সম্পর্কে নেতিবাচক চিত্রও উঠে এসেছে। ঢাকার বাইরে বিশেষ করে রাজধানী থেকে দূরের জেলাগুলোতে এই এক দশক আগেও এক দিনের পত্রিকা এর পরের দিন পৌছাতো। কিন্তু পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এখন ঢাকা থেকে সবচেয়ে দূরের জেলায়

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোচ্চ দিনের গোধূলিলগ্নে পত্রিকাটি পৌঁছে যায়। এর চেয়েও যেখানে বড় বিপ্লব এসেছে সেটা হলো তথ্যপ্রযুক্তি। হালের বিস্ময় মোবাইলের কথা বাদ দিলেও মানুষ রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে আটলান্টিকের ওপারে যুক্তরাষ্ট্রে কি ঘটছে তা মুহূর্তে জেনে যাচ্ছে। এর কারণ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লব। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত স্যাটেলাইট বা ডিশ এন্টেনার সংযোগ পৌঁছে গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির প্রভাবে ইউনিয়নে ইউনিয়নে তথ্যসেবা কেন্দ্রে (ইউআরসি) ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার রয়েছে। ফলে স্যাটেলাইট টেলিভিশন, পত্রিকাগুলোর মধ্যাহ্ন সংস্করণ, ওয়েবভিত্তিক বিভিন্ন বার্তা সংস্থা প্রতিনিয়ত তথ্য ও সংবাদ আপলোড করছে। এ কারণে একদিকে মানুষের তথ্যপ্রাপ্তি সহজ হয়েছে, আরেকদিকে তথ্য তৃষ্ণাও বেড়েছে। এর বাইরে বেসরকারি খাতের এফএম রেডিও প্রতিঘন্টার বা সংবাদ বুলেটিনে মানুষকে তথ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। এরপরও মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, বেতার, ওয়েবভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমের বাইরে দৈনিক সংবাদপত্রের চাহিদা কোনও অংশে কমেনি।

গবেষণায় দেখা গেছে, এখনও প্রায় অর্ধেক বা ৪৯.২৫% মানুষ পত্রিকা এবং টিভি উভয় মাধ্যমের সংবাদ পড়ে ও শুনে থাকে। নানা কারণে যারা টিভির খবর দেখতে পারে না, এমন ১৮.৪৬% মানুষ পাওয়া গেছে তারা পত্রিকার খবর পড়ে। এর বিপরীতদিকে ১৫.৩৮% মানুষ আছে যারা অবশ্য পত্রিকা পড়ে না কিন্তু টিভির খবর দেখে। কিছু মানুষ পাওয়া গেছে যারা সময় পেলে টিভি-পত্রিকা উভয়টির দ্বারস্থ হয়। এ ধরণের ১৩.৮৪% লোক কেবল সময় পেলে পত্রিকা পড়ে আর ১২.৩০% সময় পেলে বা মাঝে-মধ্যে টিভির খবর দেখলেও পত্রিকা পড়ে না। কিন্তু এই যুগেও ৪.৬১% লোক পাওয়া গেছে যারা টিভি বা পত্রিকা কোন কিছুরই খবর দেখে না, শোনেও না। রাজনীতির চেয়েও খেলার খবরের পাঠক সবচেয়ে বেশি, ৪০%। তবে মানুষের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও শেষপাতার খবর বেশি পড়ার প্রবণতা রয়েছে, যা মোট ৩৮.৪৬%। ৩৬.৯২% লোক সবধরণের খবরই পড়েন। টেলিভিশনের দর্শকদের ক্ষেত্রেও একইভাবে খেলার খবরের দর্শক বেশি, ৪০%। এরপরে রয়েছে সবধরণের খবর দেখার দর্শক সংখ্যা যা ৩৮.৪৬%। টিভিতে রাজনৈতিক খবরের প্রতি আগ্রহী এমন ৩৬.৯২% লোক পাওয়া গেছে।

মানুষ সাধারণত সকালে পত্রিকা পড়তে চায়। হকার পত্রিকা দিয়ে যাওয়ার পরপরই গরম পত্রিকা নেড়ে দেখার প্রতি অনেকে আগ্রহ রয়েছে। এছাড়া বিকালে বা রাতেও অনেকে খবরের কাগজ পড়ে তবে এরা সাধারণত ঢাকার বাইরের অধিবাসী। বিলম্বে পত্রিকা পৌঁছানোর কারণে তারা বিকালে বা রাতে পড়তে বাধ্য হয়। আর টিভির খবর দেখা হয় রাতে। দেখা গেছে, পত্রিকার খবর সকালে পড়ে ৬৩.০৭%, বিকালে পড়ে ৩.০৭% এবং রাতে পড়ে ৩.০৭% লোক। এর বাইরে সময় পেলে পড়ে ১০.৭৬% আর সারাক্ষণ পড়ে ১.৫৩% লোক। আর রাতে ৪০% মানুষ টিভির খবর দেখে থাকে। সময় পেলে টিভির খবর দেখে এমন লোক পাওয়া গেছে ১২.৩০%। আর সারাক্ষণই টিভির খবর থেকে নিজেকে আপডেট রাখে ২৪.৬১% লোক। এই অংশটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারক বা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত, যারা নিজ নিজ অফিসে খবরের চ্যানেল ধরে রাখেন বা খবরের সময়ে চ্যানেল ঘুরিয়ে খবর দেখে থাকেন। এভাবে মোটের ওপর পত্রিকা পাঠক ৮১.৫৩% আর টিভির খবরের দর্শক ৭৬.৬১% পাওয়া গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গণমাধ্যম সম্পর্কে মানুষের নেতিবাচক ধারণাও রয়েছে। বিশেষ করে প্রকাশিত-প্রচারিত সংবাদ ৫২.৩০% লোকের কাছেই মাঝে-মধ্যে অসত্য মনে হয়। আর ২৩.০৭% 'মাঝে-মধ্যে' শব্দটি ব্যবহার না করেই সরাসরি বলেছেন হ্যাঁ; অসত্য খবর প্রকাশ বা প্রচারিত হয় গণমাধ্যমে। তবে ১৩.৮৪% লোকের কাছে টিভি-পত্রিকার খবর কখনো অসত্য মনে হয় না। আর যাদের কাছে অসত্য মনে হয় তাদের মধ্যে ৪৬.১৫% লোক অবশ্য সঠিক তথ্যটা জানতে বিকল্প পন্থা গ্রহণ করে বা অন্য পত্রিকা পড়ে কিংবা টেলিভিশনের খবর দেখে থাকে। কিন্তু ৪০% লোকের এ বিষয়ে কোন মন্তব্যই নাই।

সংবাদপত্র ও টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানে নিউজ ম্যানেজারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো সাধারণত পাঠকরা পত্রিকার কোন পৃষ্ঠাগুলো বেশি পড়ে। কেননা, পরিবেশের সংবাদ কাভারেজ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে এটা বের করা জরুরি ছিলো। দেখা গেছে, তাদের ৪০% মনে করেন পাঠক-দর্শকরা খেলার খবর পড়তে সাধারণত আগ্রহী। তবে এটা সর্বোচ্চ সংখ্যা নয়। নীতি-নির্ধারকদের ৬০% মনে করেন, পাঠকরা সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় বেশি পড়ে। আর ২০% লোক মনে করেন মফস্বল ও পরিবেশ/জলবায়ু সংক্রান্ত খবর বেশি পড়ে পাঠক। টেলিভিশন কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন, মানুষ সাধারণত প্রাইমটাইমে বা সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত টিভির খবর দেখে।

পরিবেশ সংক্রান্ত খবর কাভারেজের ব্যাপারে ৫৩.৮৪% লোক পাওয়া গেছে যারা মনে করেন পরিবেশ ইস্যুর খবর যে পরিমাণ কাভারেজ পাচ্ছে, তা যথেষ্ট নয়। অবশ্য ১৫.৩৮% লোক মনে করে যথেষ্ট। এ অবস্থায় ৪৬.১৫% মানুষ মনে করে গণমাধ্যম নিজে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না। বিপরীত দিকে ১২.৩০% লোকে মনে করে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে গণমাধ্যম।

বাংলাদেশ টেলিভিশন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ার পাশাপাশি তার সারাদেশ কাভারেজ দেয়ার সক্ষমতা রয়েছে। এ অবস্থায় তারা পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে থাকে তা নিরূপন করতে গিয়ে দেখা যায়, ২১.৫৩% লোক মনে করেন বিটিভি পরিবেশ সংক্রান্ত খবর মোটামুটি কাভার করে। আর ৩০.৭৬% মনে করে কম কাভার করে। বাংলাদেশ বেতার পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদ কতটা কাভার করে তা খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেলো ৬১.৫৩% মানুষ বাংলাদেশ বেতার শোনে না। এ অবস্থায় বিটিভি ও বেতারের পরিবেশ ইস্যুর খবর কাভারেজে মাত্র ১৬.৯২% লোক খুশি। আর অসন্তুষ্ট লোকের সংখ্যা ৩৬.৯২%। ৪৬.১৫% লোক এই প্রশ্নের জবাব দেন নি। গণমাধ্যমে সাধারণত প্রত্যেক ইস্যুর জন্য বিটভিত্তিক আলাদা দায়িত্বপ্রাপ্ত রিপোর্টার থাকেন। কিন্তু প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংক্রান্ত নিউজের কাভার করার জন্য বিট হিসাবে দায়িত্বে নির্দিষ্ট রিপোর্টার থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছে মাত্র ৭৫ভাগ প্রতিষ্ঠানে। বর্তমানে পরিবেশদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের জাতীয় বিষয়গুলো (যেমন : দেশের দক্ষিণাঞ্চল বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া) ৬৪.৫৮% মানুষই জানে। তবে ২০.৮৩% মানুষ এ তথ্যগুলো জানে না। প্রসঙ্গত, গণমাধ্যমের বিপ্লবের যুগে জনগণের এভাবে তথ্য না জানাটা গণমাধ্যমের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। আর যারা জানে, তাদের ৩৫.৪৮% পত্রিকা থেকে, ৯.৬৭% টিভি থেকে আর রেডিও থেকে ৩.২২% জেনেছে। এরবাইরে অবশ্য পত্রিকা ও টিভি উভয় মাধ্যম থেকে তথ্য জানার হার বেশি পাওয়া গেছে। এই উভয় মাধ্যম থেকে জেনেছে

Dhaka University Institutional Repository

এমন লোকের হার ৩৫.৩৮%। পরিবেশের আন্তর্জাতিক খবরের মধ্যে হিমালয় ও এন্টার্কটিকার বরফ গলা বা মালদ্বীপের মন্ত্রিসভার পানির নীচে প্রতীকী কেবিনেট মিটিং করার মতো খবর ৫৬.২৫% লোকেই জানে। বিপরীত দিকে এসব তথ্য জানে না এমন রয়েছে ২৯.৯৬% লোক। গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, গণমাধ্যমের দেশপ্রেম নিয়ে পাঠক-দর্শকদের মতামত। ৪৪.৬১% মানুষ মনে করে গণমাধ্যম কর্মীদের দেশপ্রেম আছে। কিন্তু সমস্যা যা তা হলো রাজনৈতিক মতাদর্শে। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে সংবাদ লেখা ও উপস্থাপন পত্রিকা ও টিভি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর ৩৩.৮৪% লোকে মনে করে, গণমাধ্যম কর্মীদের দেশপ্রেমে ঘাটতি রয়েছে।

অন্যদিকে আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের তিনটি সংবাদপত্রের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সংবাদ কাভারেজ দেয়ার চিত্র তুলে আনা হয়েছে। এরমাধ্যমে মূলত গণমাধ্যম বর্তমানে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব কতটা পালন করছে, কিভাবে করছে- তা বের করা হয়েছে। এতে দু'টি বিষয় পরিস্কার হয়েছে। এক. সংবাদপত্র পরিবেশ ইস্যুকে এজেন্ডা হিসাবে সেট করে (প্রয়োজনে)। এরপ্রমাণ হলো ২০০৯সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনের আগে তিনটি পত্রিকাই বিশেষসংখ্যা বের করেছিলো। অথচ তারাই ২০০৮সালের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের আগে (কপ-১৪) তেমন রিপোর্টই কাভারেজ দেয়নি। তখন তাদের দৃষ্টি ছিলো ওইবছরের (২০০৮) জাতীয় নির্বাচনের দিকে। দুই. অতীতের চেয়ে বর্তমানে সংবাদপত্রের পরিবেশ ইস্যুর সংবাদ কাভারেজ বেড়েছে এবং দিন দিন বাড়ছে।

গণাধ্যমের কাজ হলো বৃহত্তর সমাজের মানুষকে নিয়ে। কিন্তু পৃথিবীর দেশে দেশে এর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট, অসম্পূর্ণ, অশুদ্ধ ও উত্তেজক খবর পরিবেশনের অভিযোগ রয়েছে (Carvalho and Burgess, 2006)। পরিবেশের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত সংবাদ রচনা ও প্রকাশের চিত্র সব দেশেরই সাধারণ চিত্র। এ অবস্থায় গণমাধ্যম বিশেষ করে গণমাধ্যম কর্মীদের নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করা জরুরি। তাদের কাজের মানদণ্ড হবে সামগ্রিক ও পরিপ্রেক্ষিতবাদ। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম পরিবেশ নিয়ে এজেন্ডা সেট করে কাজ করতে পারে। কাজের ধরণের আনুষ্ঠানিক বা দিবসভিত্তিক হবে না। বর্তমান গবেষণায় এসব দিকনির্দেশনা ও নীতি প্রণয়নেরই প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকার নৈতিক বিশ্লেষণের স্বল্প পরিসরের এ গবেষণা থেকে ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ গবেষণার দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে মনে করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নম্বর

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন i

সার-সংক্ষেপ iii

সারণী তালিকা x

রেখাচিত্র xi

চিত্র xii

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা

১.১ প্রারম্ভিকা ১

১.২ গবেষণার পটভূমি ২

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ৩

১.৪ পূর্বানুমান ৪

১.৫ ব্যবহৃত পরিভাষা বা প্রত্যয় সমুহের সংজ্ঞায়ন ৫

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি ৭

১.৭ গবেষণার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা ৯

১.৮ সমগ্রক ও নমুনায়ন ১০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নীতিবিদ্যা, পরিবেশ নীতিবিদ্যা ও গণমাধ্যম

২.১ নীতিবিদ্যার ইতিহাস ১৪

২.২ নীতিবিদ্যার প্রকারভেদ ১৫

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ পরিবেশ নীতিবিদ্যা ১৬

২. ৪ গণমাধ্যম ১৭

২.৫ গণমাধ্যমেই গণযোগাযোগ ২০

২.৬ গণযোগাযোগের ইতিহাস ২১

২.৭ গণমাধ্যমের অন্তঃসারশূন্যতা ২২

২.৮ এমবেডিং জার্নালিজম ২৪

২.৯ যেভাবে কাজ করে গণমাধ্যম ২৫

তৃতীয় অধ্যায় ঃ পরিবেশ ও গণমাধ্যম : তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও সম্পর্ক নির্ণয়

৩. ১ পরিবেশ ও পরিবেশ নীতিবিদ্যার সম্পর্ক ২৮

৩.১.১ অমানবকেন্দ্রিক যন্ত্রতুল্য মূল্য ৪২

৩.১.২ মানবকেন্দ্রিক যন্ত্রতুল্য মূল্য ৪২

৩.১.৩ অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য ৪২

৩.১.৪. মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য ৪৩

৩. ২ পরিবেশ ও গণমাধ্যমের পারস্পরিক সম্পর্ক ৪৬

৩. ৩ গণমাধ্যম ও জনসমাজ : সম্পর্ক অন্বেষা ৫১

৩.৩.১ ম্যাজিক বুলেট থিওরি ৫২

৩.৩.২ দ্বিধাপ প্রবাহ ৫২

৩.৩.৩ বহুধাপ তত্ত্ব ৫৩

৩.৩.৪ ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্ব ৫৪

৩.৩.৫ গণমাধ্যম ব্যবস্থা নির্ভরতা তত্ত্ব ৫৬

৩.৪ গণমাধ্যম ও জনমানুষ : সম্পর্ক নির্ণয় ৫৯

৩.৪.১ তথ্য উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা ৫৯

৩.৪.২ গবেষণা ফলাফল ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পরিবেশ : বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতি

৪.১ পরিবেশের নানা কাল ৮৪

৪.২ পরিবেশ : বিশ্ব পরিস্থিতি ৮৯

৪.৩ পরিবেশ : বাংলাদেশ পরিস্থিতি ৯৭

৪.৪ পরিবেশ : ভিন্নমত ১০৫

৪.৫ পরিবেশ : রাজনীতি, বাণিজ্য, তহবিল ও অন্যান্য ১০৭

৪.৬ তিনটি পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ ও ফলাফল মূল্যায়ন ১১০

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার

৫.১ বিশেষজ্ঞ সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ১১৩

৫.২ সারাংশ ও সুপারিশ ১১৬

তথ্যসূত্র ১১৮

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট : ক

গবেষণার প্রশ্ন ১২৩

বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্র ১২৭

বাংলাদেশের টেলিভিশন ১৪০

বাংলাদেশের বেতার ১৪০

বার্তা সংস্থা ১৪১

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

রোপারের (Ropoer) বহুধাপ প্রবাহ মডেল	৫৪
সংবাদপত্র পাঠ ও টেলিভিশনের খবর শোনা-দেখা	৬০
যে পাতার খবর বেশি পড়া হয়	৬১
যে ধরণের খবর বেশি দেখে থাকে	৬১
মানুষ সাধারণত কখন পত্রিকা পড়ে বা টেভিলিশন দেখে	৬২
পত্রিকা ও টিভির খবর কখনো অসত্য মনে হয় কি না	৬৩
কোনও প্রতিবেদন অসত্য মনে হলে পাঠক-দর্শক কি করে	৬৪
পত্রিকা বা টিভির খবর অসত্য মনে হওয়ার কারণ	৬৪
পাঠক পত্রিকার কোন পৃষ্ঠাগুলো বেশি পড়ে	৬৫
পরিবেশ/জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর খবর সাধারণত ট্রিটমেন্টের চিত্র	৬৬
দর্শকরা কোন কোন সময়ে টিভির খবর বেশি দেখে থাকে	৬৬
প্রাইমটাইমে যেসব নিউজকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়	৬৭
পরিবেশ/জলবায়ু সংক্রান্ত সংবাদ ট্রিটমেন্ট দেয়ার পলিসি	৬৭
পরিবেশ ইস্যুর খবর যে পরিমাণ কাভারেজ পাচ্ছে, তাতে জনগণ যথেষ্ট কি না	৬৭
গণমাধ্যম তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে কিনা	৬৮
বেতারের শ্রোতা	৬৯
বাংলাদেশ বেতার ও এফএম রেডিও'র মধ্যে শ্রোতা সংখ্যা নির্ণয়	৬৯
বাংলাদেশ টেলিভিশন পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে	৭০
বাংলাদেশ বেতার পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে	৭১
বিটিভি ও বেতারের পরিবেশ ইস্যুর খবর কাভারেজে সন্তুষ্ট কিনা	৭১
গণমাধ্যমে পরিবেশ বিটে রিপোর্টার আছে কিনা	৭২
পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে সম্ভাব্য জাতীয় দুর্যোগের তথ্য জানার হার	৭২
যেসব মাধ্যম থেকে মানুষ পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য জেনে থাকে	৭৩

Dhaka University Institutional Repository

হিমালয় ও এন্টার্কটিকার বরফ গলাসহ পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক তথ্য জানার হার ৭৪
পরিবেশ পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংবাদ জানার মাধ্যম ৭৪
বিজ্ঞাপন দেয় এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের পরিবেশ দুষণের রিপোর্ট সেন্সর হয় কিনা ৭৪
গণমাধ্যমের দেশপ্রেম নিয়ে মতামত আছে কিনা ৭৪

রেখা চিত্র

রোপারের (Ropoer) বহুধাপ প্রবাহ মডেল ৫৪
সংবাদপত্র পাঠ ও টেলিভিশনের খবর শোনা-দেখা ৬০
যে পাতার খবর বেশি পড়া হয় ৬১
যে ধরণের খবর বেশি দেখে থাকে ৬২
মানুষ সাধারণত কখন পত্রিকা পড়ে ৬৩
মানুষ সাধারণত কখন টেভিলিশন দেখে ৬৩
পত্রিকা ও টিভির খবর কখনো অসত্য মনে হয় কি না ৬৪
কোনও প্রতিবেদন অসত্য মনে হলে পাঠক-দর্শক কি করে ৬৫
পাঠক পত্রিকার কোন পৃষ্ঠাগুলো বেশি পড়ে ৬৬
পরিবেশ ইস্যুর খবর যে পরিমাণ কাভারেজ পাচ্ছে, তাতে জনগণ যথেষ্ট কি না ৬৮
গণমাধ্যম তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে কিনা ৬৮
বেতারের শ্রোতা ৬৯
বাংলাদেশ বেতার ও এফএম রেডিও'র মধ্যে শ্রোতা সংখ্যা নির্ণয় ৭০
বাংলাদেশ টেলিভিশন পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে ৭০
বাংলাদেশ বেতার পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে ৭১
বিটিভি ও বেতারের পরিবেশ ইস্যুর খবর কাভারেজে সন্তুষ্ট কিনা ৭২
পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে দেশের প্রায় ১৮ভাগ ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভে ডুবে যাওয়াসহ জাতীয় সম্ভাব্য দুর্যোগের তথ্য জানার হার ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

যেসব মাধ্যম থেকে মানুষ পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য জেনে থাকে ৭৩

গণমাধ্যমের দেশপ্রেম নিয়ে মতামত আছে কিনা ৭৫

বাতাসে কার্বনসহ বিভিন্নধরণের গ্যাসের পরিমাণ ৯৪

আধেয় বিশ্লেষণ : ডিসেম্বর ২০০৯ ১১১

আধেয় বিশ্লেষণ : ডিসেম্বর ২০০৮ ১১২

স্থির চিত্র

শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে কার্বন (সালফার-ডাই-অক্সাইড) নির্গমনের চিত্র ৯১

বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া ৯১

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ প্রারম্ভিকা

বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলোচিত ইস্যু হচ্ছে পরিবেশদুষণ। অন্যদিকে চলমান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হলো গণমাধ্যম। মানুষের চিন্তারজগত থেকে শুরু দৈনন্দিন জীবনের গতি-প্রকৃতি অনেকসময়ে নির্ধারণ করে এই গণমাধ্যম। পরিবেশ বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয় হওয়ার কারণ হচ্ছে, মানবসভ্যতা বর্তমানে অস্তিত্বের প্রশ্নে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। পৃথিবীর টিকে থাকা, বর্তমান প্রজন্মের স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং অনাগত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য কোনও ধরণী থাকছে কি না, সেটা নিয়ে আজকে শংকা তৈরি হয়েছে। অর্থ্যাৎ মানবজীবনের আজকের অন্যতম বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এই পরিবেশদূষণ পরিবেশ দুষণের নানা নেতিবাচক প্রভাবের একটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা। পরিবেশের অন্যান্য উপাদান যেমন পানি, মাটি ইত্যাদি তার আপন বৈশিষ্ট্য হারালে প্রভাবটা সংশ্লিষ্ট উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বায়ু বা বায়ুমণ্ডল যদি দুষণের শিকার হয়, তাহলে তা একাই পরিবেশের অন্যসব উপাদানকে আক্রান্ত করে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটনা পরিবেশের এই শেষোক্ত দূষণেরই কুফলের ফলশ্রুতি। যা প্রভাব আজকে এতই সর্বগ্রাসী ও সুদূরপ্রসারী যে এটা ভাবনাঢ আতঙ্কিত হওয়ার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। আর একারণে এটার ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী 'শীর্ষস্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষক, নীতি-নির্ধারক, পরিবেশবিদ, গবেষকসহ সংশ্লিষ্টরা এই ইস্যুকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় রেখেছেন। এই অবস্থায় বিশ্বের সেরা আলোড়িত বিষয়টি এই বিশ্বেরই আরেক প্রভাবশালী হাতিয়ার গণমাধ্যমেরও আলোচ্য বিষয়ের বাইরে নয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিশেষ করে ষাটের দশক থেকে এটি গণমাধ্যমে প্রাধান্য পায়। আর একাডেমিশিয়ান, পরিবেশকর্মী এবং রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারক পর্যায়ে গুরুত্ব পেয়েছে আরও আগে। কিন্তু এরপরও তার দূষণ আর ক্ষতিসাধন থেমে থাকেনি।

পৃথিবীকে যদি একটি নৌকার সাথে তুলনা করা হয় আর এই নৌকাটি যদি উত্তাল সমুদ্রে চলন্ত থাকে, তাহলে যে বিপদের আশংকা করা হচ্ছে তা থেকে একই বাহনের যাত্রী হিসেবে বাংলাদেশ কেন বিশ্বের দেশ শংকামুক্ত নয়। যে কারণে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা সবাইকে একইসঙ্গে এই ইস্যুতে কাজ করতে হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও পরিবেশ দূষণের শিকার হচ্ছে। শিল্পের অবাধ বিস্তার,

Dhaka University Institutional Repository

যথেচ্ছা ব্যবহার, মানুষের উদাসীনতা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিসাধন- এক কথায় বিভিন্ন কারণে নানাভাবে ধীরে ধীরে পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ছে। এ অবস্থায় পরিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও এর সদ্ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বিভিন্ন মহল ও ফোরাম পৃথক প্লাটফর্মে নিজস্ব আঙ্গিকে এ নিয়ে বিস্তর কাজ করছে। পরিবেশবিদরা পরিবেশ সুরক্ষায় আন্দোলন করছেন। একাডেমিশিয়ান ও গবেষকরা বিস্তর গবেষণা করছেন। নীতি-নির্ধারকরা কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছেন। সবার উদ্দেশ্য গণসচেতনতা সৃষ্টি। এরমাধ্যমে গণচাপ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বনে পরিবেশদূষণ বন্ধ করা। পাশাপাশি পরিবেশদূষণকারী হিসেবে চিহ্নিত বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামক 'কার্বন' নিঃসরণকারী উন্নত জাতিগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে দূষণ বন্ধের বাইরে পৃথিবীকে বিপন্ন ও ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করানোর দায়ে ক্ষতিপূরণ আদায়। এই কাজটি কার্যকরভাবে করতে পারে গণমাধ্যম। অন্যভাবে বললে এব্যাপারে কাজ করার জন্য গণমাধ্যমের দায় রয়েছে। কেননা, বিশ্ব উষ্ণায়ন, বিশ্বায়নের ফসল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জীবন, মানুষের বিচ্ছিন্নতা, প্রভাবের সূত্র ইত্যাদি বিবেচনায় মানুষের জীবন আজ জটিল থেকে জটিলতর পর্যায়ে পৌছে গেছে। সমাজ যখন জটিল থেকে আরও জটিলতর হয়ে ওঠে, গণমাধ্যমগুলির সাথে সমাজের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাত্রা সমান্তরালে তীব্র হয়ে ওঠে। গণমাধ্যম প্রযুক্তির উৎকর্ষ ঘটে। এমনি পর্যায়ে পৌছিয়ে মানুষকে অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ করে গণমাধ্যম। তখন গণমাধ্যমগুলিও শ্রোতা-দর্শকের কাছে ক্রমেই বেশি অনন্য ও চমৎকার উপায়ে তথ্য যোগান বৃদ্ধি করে চলে। গণমাধ্যমগুলোর ওপর পাঠক-দর্শক-শ্রোতার নির্ভরশীলতা তুঙ্গে ওঠার আরও একটি কারণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সমাজে পরিবর্তনশীলতা ও সংঘাতের পরিস্থিতির উপস্থিতি। দারিদ্র্য আর অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে এই অবস্থাটিও বিশ্বে বা বাংলাদেশে বর্তমানে বিরাজমান। সমাজের স্থিতিবিধায়ক শক্তিগুলোর পাশাপাশি পরিবর্তনশীলতা ও সংঘাত পরিস্থিতির শক্তিগুলিও কার্যকর। এ অবস্থায় পরিবেশদুষণ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যম পরিকল্পিতভাবে ইতিবাচক করতে পারে, সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত। আর এ প্রেক্ষাপটেই প্রশ্ন আসে গণমাধ্যম পরিবেশ সুরক্ষায় কি ভূমিকা পালন করছে এবং কি করা উচিত? এসব প্রশ্নের জবাবের সঙ্গে অর্থ্যাৎ গণমাধ্যমের দায়িত্বপালনের সঙ্গে নৈতিকতার প্রশ্ন চলে আসে। সে কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের কি ভূমিকা থাকতে পারে তার একটি নৈতিক বিশ্লেষণের জন্যই এই গবেষণা। গবেষণা উদ্দেশ্য পূরণে নীতিবিদ্যা, পরিবেশ, পরিবেশ নীতিবিদ্যা, গণমাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনায় তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, গণমাধ্যমগুলোর বর্তমান দায়িত্বপালনের মাত্রা, এ নিয়ে গণমানুষের ভাবনা ও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদি নিরূপন শেষে এব্যাপারে উপসংহারে এব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার পটভূমি

বর্তমান যুগকে তথ্যপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের অনুশাসনের যুগ বলা হয়। মানবজীবনের চিন্তাভাবনা আর সিদ্ধান্তের অনেক রসদ যুগিয়ে থাকে গণমাধ্যম। আরও একটু খোলসা করে বললে মানবজীবনের প্রায় সবকিছুই এখন

Dhaka University Institutional Repository

গণমাধ্যম প্রভাবিত। গণমাধ্যম মানুষের অভ্যাস, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করছে। অন্যদিকে ভোগবাদী মানুষের বিববাস্পে পরিবেশের আজ বিপন্নদশা। পরিবেশ সুরক্ষার সচেতনতা মানুষের মাঝে কবে এসেছে, তা দিনক্ষণ ঠিক করে বলা না গেলেও প্রথম ১২৭২সালে ইংল্যান্ডে কয়লা পোড়ানো নিষিদ্ধের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষার পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। এরপর এতটা বছর কেটে গেলো। এই ফাঁকে পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে বিশ্বের বিভিন্ন জাতিসমুহের পুঞ্জ 'জাতিসংঘ' এ নিয়ে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা গঠনের পাশাপাশি পরিবেশ দিবস, ধরিত্রী দিবস, জনসংখ্যা দিবস, নিরাপদ পানি দিবসসহ নানা দিবসের আড়ালে মূলত পরিবেশ সচেতনতা ও সুরক্ষার আন্দোলনই চালানো হচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নের প্রতিযোগিতা, বিশ্বে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের নেশা আর কিছু মানুষের বেপরোয়া ভোগবাদী মনোভাব কোনও দিবস উদযাপন আর প্রচেষ্টাকেই সফল হতে দিচ্ছে না। অথচ পৃথিবী নামক একটি অভিন্ন নৌকার যাত্রী হিসেবে ঝড় উঠলে আমরা কেউই রেহাই পাবো না; যেমনিভাবে নগরে আগুন লাগলে দেবালয়ও রক্ষা পায় না। একটি একক ইউনিট হিসেবে সমগ্র পৃথিবীই আজ বিপন্ন। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবী এবং পৃথিবীর অধিবাসী হিসেবে মানুষের এই মহাবিপদকালে কেবল নৈতিকবোধ এবং নৈতিক জীবনযাপন পদ্ধতিই পারে মানুষকে নিবৃত্ত করতে। বিপরীত দিকে গণমানুষের ওপর কার্যকর প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যমও এ ব্যাপারে সফল ভূমিকা রাখতে পারে। এই অবস্থায় গণমাধ্যমের অনুশাসনের যুগে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের নৈতিক কর্তব্য কি এবং মানুষের নৈতিকবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় মানুষেরই বা করণীয় কি তা নিরূপনের চেষ্টা করা হয়েছে এ গবেষণায়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মানুষ গণমাধ্যম থেকে কতটা সেবা গ্রহণ করে, পরিবেশ পরিবর্তনজনিত সমসাময়িক বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক ইস্যু কতটা জানে কিংবা এসব জনগণকে জানাতে গণমাধ্যমই বা কি ও কতটা ভূমিকা রাখছে- এসব বিশ্লেষণ করা হয়েছে গবেষণায়। সর্বোপরি বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকার নৈতিক বিশ্লেষণ বিষয়ে এ গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়েছে।

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

মানবজীবনে গণমাধ্যমও বর্তমানে একটি অন্যতম অভাববোধের জায়গা দখল করেছে। প্রথম সারির গণমাধ্যম সংবাদপত্র, টেলিভিশন আর রেডিও- এই তিনটির পাঠক, দর্শক, শ্রোতা দিন দিন বাড়ছেই। এর বাইরে গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচ্য অন্যান্য উপাদান যেমন ইন্টারনেট, মোবাইল, লোকসংগীত, বই এমনকি যোগাযোগের বাকিসব উপাদানের মাধ্যমে মানুষ তথ্য জানছে। তথ্যপ্রযুক্তির বহুল বিস্তার, মোবাইল ফোন-বিপ্লব, ক্রয়ক্ষমতা, অবকাঠামোগত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, রাজনৈতিক সচেতনতা এমনকি আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা মানুষকে গণমাধ্যমের দিকে টানছে। ফলে মানুষ তথ্য জানছে। গণমাধ্যম তথ্যতৃষ্ণা এমনভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে যে, এটার কারণে এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও যোগাযোগে দারুন গতিশীলতা এনেছে। পরিবর্তন করছে মানুষের মানসিকতা, মূল্যবোধ, আচরণ এমনকি চরিত্র। 'বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায়

Dhaka University Institutional Repository

গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ একটি নৈতিক বিশ্লেষণ' শিরোনামের এ গবেষণা থেকে মানুষের গণমাধ্যম-নির্ভরতা, পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যম কি করেছে, করছে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিবেশ পরিস্থিতি ইত্যাদি দেখা হয়েছে। প্রায় সতের কোটি মানুষের দেশে এবং সুজলা-সুফলা নদীমাতৃক বাংলাদেশের পরিবেশদূষণের চিত্র গণমাধ্যমে প্রকাশের বহুমাত্রিক দিক বের করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হয়েছে গণমাধ্যম পাঠ ও ব্যবহারের তুলনামূলক দিক। গণমাধ্যম কোনধরণের খবর বেশি কাভারেজ করে, মানুষেরই বা রুচি কি কিংবা মানুষ কোনধরণের খবর বেশি পড়তে-দেখতে-শুনতে আগ্রহী, গণমাধ্যম ম্যানেজারদের ঝোঁক কোন দিকে বেশি, পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদ তারা কতটা ও কিভাবে কাভারেজ দেন, এক্ষেত্রে সমস্যা-সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা কোথায়।

দেশের অধিকাংশ মানুষই এখন যোগাযোগ মাধ্যম ও প্রযুক্তির আওতায় রয়েছে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ছাড়াও ব্যক্তিগত, পারিবারিক বহুপক্ষীয় ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য জানছে। পাঠ্যবই, প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন পরীক্ষার বই, ক্লাসে শিক্ষকের লেকচার, সভা-সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর বিভিন্ন প্রভাব সম্পর্কে জানছে। এ অবস্থায় গণমাধ্যমের মৌল উপাদান বিবেচনায় সংবাদপত্র, টেলিভিশন আর রেডিও কোনও নিয়ামক শক্তি কিনা সেটাই এ গবেষণা থেকে বের করার চেষ্টা করেছি।

এই গবেষণায় গণমাধ্যমের বিভিন্ন সীমাবদ্ধা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। গণমাধ্যমের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন এবং তা সত্ত্বেও মানুষ কতটা গণমাধ্যমমুখি তা উঠে এসেছে। এ গবেষণা থেকে দেশের মানুষের পরিবেশ সচেতনতার মাত্রা, গণমাধ্যমের বর্তমান করণীয়, গণমাধ্যমের কাছে পরিবেশের সংবাদ কাভারেজ দেয়ার ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যাশা, এ ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতি মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত এবং সেই কাঙ্খিত আচরণ গঠনে গণমাধ্যম কি ভূমিকা পালন করতে পারে বা এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের কাম্য কাভারেজ কেমন হওয়া উচিত এসব সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও সমৃদ্ধ গবেষনার জন্য বেশকিছু সুপারিশ সম্ভব হবে বলে আমি গবেষণার এ বিষয়টি বেছে নিয়েছি।

১.৪ পূর্বানুমান

বিশ্ব পরিবেশদূষণ ঘটছে। ফলশ্রুতিতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে। আর এই দূষণ ও উষ্ণায়নের জন্য দায়ী সার্বিকভাবে মানুষের অনৈতিক কার্যক্রম। উন্নয়নের জন্য মোহান্ধ উন্নত ও উন্নয়নপ্রত্যাশী জাতিগুলো তাদের লাগামহীন-নির্বিচার শিল্প বিস্তারের কারণে পরিবেশের প্রধান উপাদান পানি, বায়ু, মাটিসহ শব্দ দূষণ ঘটাচ্ছে। বায়ুতে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন ছাড়া এবং ওজনস্তরের ক্ষয়ের কারণে কার্বন শোষণকারী প্রধান তিন খাত বায়ুমণ্ডল, অগভীর সমুদ্র ও বৃক্ষমালা (কার্বন) শোষণ করে ধরিত্রীকে পরিশুদ্ধ করতে পারছে না। আবার সব কার্বন প্রাকৃতিকভাবে পরিশোধন না হওয়ায় বাতাসে যে কার্বন অবশিষ্ট থাকছে তা সূর্যের তাপমাত্রা বায়ুমণ্ডল ধরে

Dhaka University Institutional Repository

রাখছে। ফলে উষ্ণায়ন থেকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। আবার জলবায়ু বিষয়টি জাতীয় হওয়ার পাশাপাশি বৈশ্বিক ইস্যু হওয়ায় দূষণ রোধ এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি আদায়ে বিশ্ব নাগরিক সম্প্রদায় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকারের ওপর চাপপ্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। তথ্যবিপ্লবের যুগ হওয়ায় গণমাধ্যম এ ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং রেডিও জনগণের মাঝে ইস্যুটির ভয়াবহ প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে এ ব্যাপারে সরকার তথা বিশ্ব বিবেকের ওপর চাপপ্রয়োগে ভূমিকা রাখতে। কিন্তু গণমাধ্যম তার সামর্থ্য অনুযায়ী জনমত গঠনে ভূমিকা রাখছে না। পরিবেশের ব্যাপারে জনগণের অবগতি আর গণমাধ্যমের প্রভাব সংক্রান্ত পূর্ববর্তী কিছু গবেষণা পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত পূর্বানুমান গঠন করা হয়েছে।

১. মানুষের ওপর গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

২. মানুষ গণমাধ্যম দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৩. তথ্য জানতে মানুষ গণমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়। এজন্য বেশির ভাগ মানুষ পত্রিকা পড়ে নইলে টিভির খবর দেখে ও বেতারের খবর শুনে থাকে।

৪. গণমাধ্যমের খবর দ্বারাই মানুষকে পরিবেশদূষণ ও পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য বেশি অবহিত করা সম্ভব। কিন্তু সে দায়িত্ব গণমাধ্যম যথাযথভাবে পালন করছে না।

৫. পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে গণমাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। এব্যাপারে গণমাধ্যম যথাযথ দায়িত্ব পালনে নিবেদিত করা সম্ভব কেবল তাকে (গণমাধ্যম) নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমেই।

১.৫ ব্যবহৃত পরিভাষা বা প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞায়ন

'বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ একটি নৈতিক বিশ্লেষণ' বিষয়ে এ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলো যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা এখানে আলোচনা করা হলো-

বাংলাদেশ ঃ

এ গবেষণায় বাংলাদেশ বলতে বোঝানো হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে আমরা যে সবুজ-শ্যামল, সুজলা-সুফলা একটি ভূ-খণ্ড অর্জন করেছি তাকে। পৃথিবীর মানচিত্রে মোট স্থল ভাগের মাত্র ০.১ ভাগ স্থল নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। তবে গবেষণায় বাংলাদেশ বলতে এই ভূ-খণ্ডের বাইরে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা হিসেবে যে ২০০ নটিক্যাল মাইল পেয়েছি তাকেও বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাপক জনসংখ্যা অধ্যুষিত ছোট একটি দেশ। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৮৬ লাখ ৯২ হাজার। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১ হাজারের বেশি মানুষ বসবাস করে। এরফলে এটি পৃথিবীর অন্যতম জনবসতিপূর্ণ দেশে পরিণত হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাবে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশ। মোট আয়তনের ৬ শতাংশ জায়গা নদী ও অন্যান্য স্থলভূমি দ্বারা বেষ্টিত। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ দেশগুলির একটি এটি।

পরিবেশ ঃ

পরিবেশ বলতে এক কথায় সার্বিক বাস্তুতন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে লব্ধ আমাদের চারপাশে যে সব সপ্রাণ প্রাণী ও নিস্প্রাণ বাস্তুজগত রয়েছে যেমন জড়-অজড় বস্তু, পাহাড়-পর্বত, মাটি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, খালবিল, নদীনালা, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। আমরা প্রতিনিয়ত এসব উপাদান ব্যবহার করে থাকি। মানবজীবন পরিবেশের এসব উপাদানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

সুরক্ষা ঃ

গবেষণায় সুরক্ষা বলতে পরিবেশকে নিরাপদ রাখাকে বোঝানো হয়েছে। সুরক্ষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে Protection শব্দকে বেছে নিয়েছি। Pocket Oxford Dictionary-তে এর অর্থ keep safe, defence, immunity from violence ইত্যাদি প্রতিশব্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায়ও এসব প্রতিশব্দ ছাড়াও সুরক্ষা বলতে লক্ষ্যঅর্জন, সংরক্ষণ (preserve), বিপদমুক্ত (free of danger), বিশ্বাসযোগ্য (reliable), মূল্যবান (valuable), নির্ভরযোগ্য (dependable), অপব্যবহার থেকে রক্ষা (conserve from misuse), ক্ষতিসাধন থেকে রক্ষা করা (prevented from doing harm), সঙ্গতিপূর্ণসহ ভালো গুণাবালীসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য (reliable of consistently good character or quality) ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

গণমাধ্যম ঃ

গণমাধ্যমের তালিকায় সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও থেকে শুরু করে ইন্টারনেট, মোবাইল, গণসঙ্গীত/লোকসঙ্গীত, বই, সাময়িকী, মিছিল-সমাবেশ ইত্যাদিকে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। বর্তমান গবেষণায় কেবল সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং রেডিওকে বোঝানো হয়েছে।

ভূমিকা ঃ

এ গবেষণায় ভূমিকা বলতে কর্তব্যপালন, অবদান রাখা, দায়িত্বপালন, উদ্দেশ্যপূরণ, ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

নৈতিক ঃ

নৈতিক শব্দ দ্বারা এখানে সৎ, যথাযথ, দায়িত্বপূর্ণ, ভালো ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ

বিশ্লেষণ শব্দ দ্বারা এখানে পর্যালোচনা, তুলনা, দায়িত্ব নিরূপন এবং সমীক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণার্থে এই গবেষণায় মোট চারটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, মাঠপর্যায়ের জরিপ (Survey), আধেয় বা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis), Textual Analysis এবং বর্ণনামূলক (Descriptive) পদ্ধতি। একইধরণের তথ্যসমুহের গাণিতিক প্রকাশ গবেষণায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। কিন্তু বিষয়টি তুলনামূলক নতুন হওয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য পাওয়া যায় না। গবেষণার প্রকৃতিগতভাবে এটি মূলত গুণগত গবেষণা (qualitative research), যা সাংব্যাখ্যামূলক (interpretative)। গুণগত গবেষণা পদ্ধতির শর্তপূরণার্থে একটি প্রশ্নমালার (Open ended) ভিত্তিতে মাঠপর্যায়ে জরিপ চালানো হয়েছে। জরিপকালে সাক্ষাতকার ছাড়াও আলোচনার মাধ্যমে তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়। ওই সাক্ষাতকার এবং আলোচনার কিছু বাচ্য (*Verbatim*) সরাসরি উপস্থাপন করা হয়েছে। এর বাইরে গবেষণায় বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধানের নিমিত্তে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক বা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারক, নীতি দার্শনিক, রাজনৈতিক নেতা, সরকারি আমলা, এনজিও কর্মী নিয়ে একটি প্যানেল করা হয়। যাদের কাছ থেকে ইন-ডেপথ বা নিগূঢ় সাক্ষাতকারের (*in-depth interview*) (ওয়াইমার ও ডোমিনিক, ২০০০ : ১২২)[১] মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করা হয়। এই নিগূঢ় সাক্ষাতকার নেয়ার উদ্দেশ্য হলো, পরিবেশের মতো একটি তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক ও কঠিন বিষয় সাধারণ মানুষের অতটা বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। অথচ মানবজীবনের বর্তমান সময়কার সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় দুর্যোগের ঘনঘটা নিয়ে ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। এ কারণে যাদের সাক্ষাতকার নেয়া হয় তারা বিশেষজ্ঞ আর সচেতন শ্রেণী যারা পরিবেশ, দর্শন ও গণমাধ্যমের সঙ্গে কোন-না-কোনভাবে জড়িত, ।

প্যানেলটি হচ্ছে-

ড. হাছান মাহমুদ, মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ বিজ্ঞানে পিএইচডি

ড. গালিব আহসান খান, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

---

[১] গবেষণায় সাক্ষাতকারের ব্যবহার নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। তবে বেশির ভাগেই সাক্ষাতকারকে জরিপ গবেষণা পদ্ধতির সহায়ক বা সহযোগী পদ্ধতি বলে মনে করেন। গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাতকারকে নিগূঢ় সাক্ষাতকার হিসেবে দেখেছেন। আর Berger এর মতে, Interviews are one of the most widely used fundamental qualitative research techniques (Berger, A. A., 2000, *Media and Communication Research Method*, Thousand Oaks, Sage Publication, p-111.)।

Dhaka University Institutional Repository

মতিউর রহমান চৌধুরী, সম্পাদক, মানবজমীন

আজিজুল ইসলাম ভূইয়া, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

সাইফুল আলম, নির্বাহী সম্পাদক, যুগান্তর

সৈয়দ আবদাল আহমাদ, নির্বাহী সম্পাদক, আমার দেশ ও সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেসক্লাব

ড. আবদুল হাই সিদ্দিক, উপদেষ্টা (বার্তা), বাংলাভিশন

আবুল খায়ের, নগর সম্পাদক, ইত্তেফাক

রোবায়েত ফেরদৌস, সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবুল বাশার সেলিম, প্রধান বার্তা সম্পাদক, রেডিও টুডে

ড. মনজুরুল হান্নান, উপ-সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়,

হাসান হাফিজ, সাধারণ সম্পাদক, পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম

ইলিয়াস হোসেন, অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর, ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

ইফতেখার মাহমুদ, পরিবেশ বিষয়ক সিনিয়র রিপোর্টার, প্রথম আলো

মোস্তফা কামাল, উন্নয়নকর্মী, ইকুইটিবিডি

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে, আধেয় বা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (*Content Analysis*)। এ পদ্ধতিতে কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে গণমাধ্যমে (সংবাদপত্র) প্রকাশিত সংবাদকে বিষয় হিসেবে নিয়ে তার সংখ্যাতাত্ত্বিক তুলনা করা হয়েছে (জেরি এবং জেরি, ১৯৯১ : ১১৭)। এক্ষেত্রে দেশের তিনটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র প্রথম আলো, যুগান্তর, ডেইলি স্টার-এ পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদ, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় এবং ফিচার কি পরিমাণ কাভারেজ পেয়েছে তার উপর গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হয়। কারণ, প্রথম আলো ও যুগান্তর বাংলা ভাষায় আর ডেইলি স্টার ইংরেজি ভাষায় ঢাকা[২] থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে বহুলপ্রচারিত ও প্রভাবশালী।

তৃতীয় যে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়েছে সেটি হলো ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণী। এক্ষেত্রে Texual Analysis বা প্রাপ্ত ও লভ্য তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ করা হয়। Texual Analysis হলো কোন নির্বাচিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে তার মূলপাঠ সংক্রান্ত (*main text*) আলোচনা। Texual Analysis-এর সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ (*Discourse Analysis*)। একে (*Discourse*) সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে- 'পর্যালোচনা হলো কোন কিছুর বাস্তবিক জ্ঞান' (*Discourse is designed as 'knowledge of (some aspect of) reality'*)(রায়, ২০১১ : ১১৮)। কোন কোন সমাজতাত্ত্বিকরা বলেছেন, পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ হলো যা মূলপাঠের অর্থের ওপর প্রাধান্য খুবই কম দেয়। বরং তা মূল্যায়নের চেয়ে বরং অনেকটা

---

[২] ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো জাতীয় দৈনিক হিসাবে বিবেচিত। এসম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট ক-তে দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

সাংব্যাখ্যামূলক। [*Discourse analysis explores into the meaning of a very few texts and is based on interpretation rather than measurement*](প্রাগুক্ত)।

গবেষণার চতুর্থ পদ্ধতিটি হলো বর্ণনামূলক। এটির সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বর্ণনামূলক পদ্ধতি হলো যা কোনও শাখা বা এলাকার প্রদত্ত জনসংখ্যা বা সংশ্লিষ্ট শাখার (*faculty*) নির্ভুল তথ্য ও বৈশিষ্ট্য পদ্ধতিগতভাবে উপস্থাপন করে। (*Descriptive method attempts to describe systematically and accurately the facts and characteristics of a given population or area of interest under any faculty*). এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, বর্ণনামূলক পদ্ধতি এমন পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে যা সংগৃহিত তথ্য যেভাবে আছে সেভাবে তার পর্যবেক্ষণ কৌশল দাবি করে। ... এটা বিদ্যমান চিত্র ব্যাখ্যা করে। [*The descriptive method deals with a situation that demands the technique of observation as principal means of collecting data. ... It describes the existing phenomena.*] (প্রাগুক্ত)।

১.৭ গবেষণার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণা একদিকে যেমনি সামাজিক বিজ্ঞানের আরেক দিকে নিখাঁদ তাত্ত্বিক বিষয়কেও অন্তর্ভূক্ত করে। যে কারণে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা অনুভূত হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় কোনো কিছুই ধ্রুব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সর্বদা প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি যাবার একটা চেষ্টা করা হয়। এছাড়া প্রতিটি গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু সমস্যার মুখে পড়তে হয়। পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের নৈতিকতার সাথে ভূমিকা পালন বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমাকেও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার মুখে পড়তে হয়েছে। আমার গবেষণার জন্য বাংলাদেশের মানুষের কাছ থেকে সঠিক তথ্যটা দরকার ছিল। গণমাধ্যম বা সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রেডিও পড়া, দেখা ও শোনা যেহেতু মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। একইভাবে গণমাধ্যমের নিউজ ম্যানেজাররা বিজ্ঞাপনের কারণে নিউজ প্রকাশ-প্রচারের ক্ষেত্রে সেন্সরশীপ আরোপ করেন কিনা, বা দেশের বেশির ভাগ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক যেহেতু ব্যবসায়ী/শিল্পপতি/কালো টাকার অধিপতি, তাই এর মালিকপক্ষ পরিবেশদূষণের খবর প্রকাশ-প্রচারে কতটা বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, আদৌ করেন কিনা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক নমুনা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নিমরাজি ছিল। তবে নমুনাদের কাছ থেকে সঠিক তথ্যটি বলানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা ছিল গবেষণায়। অবশ্য যারা প্রশ্নপত্র পূরণ করে গণমাধ্যম, পরিবেশদূষণ ও পরিবেশদূষণের তথ্য জানা না জানা সম্পর্কে নিজের তথ্য দিয়েছেন তারা সত্যিকার অর্থে কতটুকু নির্ভুল তথ্য দিয়েছেন তা যাচাই করার কোনো উপায় ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া গবেষণা একটি ব্যয়বহুল কাজ। একাডেমিক এ গবেষণায় কোনো প্রকার পৃষ্ঠপোষক পাওয়ার সুযোগ না থাকায় ব্যাপক পরিসরে এ গবেষণা পরিচালনা সম্ভব হয়নি। বলাইবহুল্য জরিপ পদ্ধতির মৌলিক অসুবিধাগুলোও এ গবেষণার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১.৮ সমগ্রক ও নমুনায়ন

আলোচ্য গবেষণার সমগ্রক হচ্ছে সারাদেশের গণমাধ্যম তথা সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রেডিও'র পাঠক-দর্শক-শ্রোতা। গবেষণার জন্য নমুনায়নের ক্ষেত্রে নমুনা সংখ্যা মোট নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৫ জন। স্পষ্টত এটি একটি অসীম সমগ্রক। এতো বিশাল নমুনা সমগ্রক থেকে এত অল্প নমুনা নেয়ার বিষয়টি অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। কৈফিয়ত হিসেবে বলে রাখি, ব্যাপক পরিসরের না হওয়ার সীমাবদ্ধতার কারণে এবং সর্বোপরি একাডেমিক গবেষণা হওয়ায় এই বিপুল নমুনা সমগ্রক থেকে ৬৫ জনকে নমুনা নেয়াটা যৌক্তিক বলেই মনে করছি। তাছাড়া যে ক্ষেত্রে নমুনা এককের সংখ্যা ৩০ বা তার চেয়ে কম, সে ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানবিদরা নমুনাকে ক্ষুদ্রাকৃতির নমুনা বলে চিহ্নিত করেছেন। নমুনা এককের সংখ্যা ৩০ এর বেশি হলে সাধারণত তাকে বৃহদাকৃতির নমুনা ধরা হয় (ডব্লিউ ওয়াট, ১৯৯৬)। সে হিসাবে এই গবেষণার জন্য নির্বাচিত নমুনাকে বৃহৎ আকারের নমুনা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে দেশের একাধিক স্থান (রাজধানী এবং বিভিন্ন জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত), বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা, শ্রেণী ও পেশার নারী-পুরুষকে সরল দৈবচয়ন (*Random Sampling*) নমুনা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। কিঞ্চিত ধারণা পেতে এই নমুনা থেকে পরিচালিত গবেষণা সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নমুনায়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সংখ্যার সমতার পরিবর্তে বসবাসের স্থান/এলাকা ও পেশাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নীতিবিদ্যা, পরিবেশ নীতিবিদ্যা ও গণমাধ্যম

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ। চারপাশে বিভিন্ন কিছুর মধ্যে প্রাণময় (living entity) ও প্রাণহীন (non-living entity) বস্তুসহ একটি জগত রয়েছে। প্রকৃতি হচ্ছে পরিবেশের মূলকেন্দ্র। পরিবেশের মধ্যে মানুষের বাইরে আছে প্রাণহীন জড়-অজড়, পাহাড়-পর্বত, মাটি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, খালবিল, নদীনালা, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি। মানবজীবন পরিবেশের এসব উপাদানের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

গুহাবাসী অসহায় আদিম মানুষ থেকে আজকের বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগের অত্যাধুনিক মানুষ। মানব ইতিহাসে মানুষের এই অবস্থার উত্তরণ বা নিছক খাবারের সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘোরাঘুরির পর্যায়ের দলবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের পর্যায় থেকে বিচার-বিবেচনার সর্বোত্তম ও উন্নতির চরম শিখরে আরোহনকারী মানুষের ইতিহাস এক গর্বের ও সফলতার ইতিহাসের নামান্তর। দীর্ঘ এই ইতিহাসে মানুষ তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের বদৌলতে হোক আর জ্ঞান-বুদ্ধির ব্যবহারে প্রভাব খাটিয়ে হোক- পরিবেশ ও প্রতিবেশের সবকিছুর ওপর সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে আসছে। সবকিছুই তার ভোগ আর সেবায় নিয়োজিত। প্রকৃতির সবকিছুকে নিজের ইচ্ছায় মানুষ বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতির প্রায় সবকিছুই তাই সে নিজের প্রয়োজনে ও সাহায্যে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। চাঁদের পর মঙ্গল গ্রহে এখন মানুষের পদাঙ্ক চিহ্নিত হয়েছে। সমুদ্রের তলদেশের খবর মুহূর্তেই নিয়ে আসছে। মাটির নীচে লুকায়িত খনিজসম্পদ তো বহুআগে থেকেই মানুষ সংগ্রহ করছে। পৃথিবীর কোথায় কোন খনিজসম্পদ সংরক্ষিত আছে স্যাটেলাইটের বদৌলতে মুহূর্তে তাও পেয়ে যাচ্ছে মানুষ। এমনিভাবে প্রকৃতি আজ মানুষের দাসে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটা সত্যি যে মানুষ একটি বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমেরই অধিবাসী। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ও ক্ষমতাবান প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তার পরিবেশ আর প্রতিবেশের একই ইকোসিস্টেমের অন্তর্ভূক্ত। শুধু মানুষ নয়, কোন প্রাণীই এই ইকোসিস্টেমের বাইরে নয়। প্রকৃতির প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। এটা একটি মালায় গাঁথা প্রত্যেকটি পুঁথির মতোই। তাই এই পরিবেশের প্রতি অনাচার করলে অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর মতো মানুষও তার শিকার হতে বাধ্য। নিছক হিংস্রপ্রাণী হওয়া সত্ত্বেও বাঘের বিলুপ্তি শুধু পরিবেশেরই ভারসাম্য নষ্ট করবে না, তা মানুষের জন্যও বয়ে আনবে ক্ষয়ক্ষতি। আবার ভোগবাদী ও উন্নত জীবনের জন্য এয়ার কন্ডিশন, ফ্রিজ, গাড়ি থেকে শুরু করে আধুনিক বিভিন্ন প্রযুক্তি উৎপাদন থেকে শুরু করে ব্যবহার পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়েই পরিবেশকে ভারি করে তুলছে। একদিকে মানুষ এসব ভোগ করে

Dhaka University Institutional Repository

উল্লাস করছে, অন্যদিকে বিপদকে ঘণিভূত করছে। কেননা, এসবকিছুই চূড়ান্ত রূপে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান ও একমাত্র কারণ হলো উষ্ণায়ন। শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং এসব প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্যাদির (ব্যবহারের ফলে) নিঃসরণকৃত গ্রীন হাউজ গ্যাস (GHG) বায়ুমণ্ডলে যে প্রতিনিয়ত মিশছে তার পেছনে রয়েছে মানুষ। এরফলে সার্বিক পরিবেশের ওপর চাপ পড়ছে। উষ্ণায়নের কারণে খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মরুকরণ, ঘূর্ণিঝড়, মেরুঅঞ্চলের বরফ গলা, সমুদ্রস্তর সবকিছুই হচ্ছে। জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেলে (আইপিসিসিসি) দেয়া তথ্য থেকে জানা গেছে, গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণের কারণে ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৮ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। তবে বিশ্ব যদি এখনই কার্বন নির্গমন না কমায়, তাহলে এ তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার আরও বেশি হবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ।

এই অবস্থায় প্রকৃতি ও প্রতিবেশের সাথে মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত- এই প্রশ্ন স্বভাবতই সামনে চলে আসে। তবে এই প্রশ্নটা হলো নৈতিকতার বিষয়। এই বিষয়টি নীতিবিদ্যার আলোচ্য সূচিভূক্ত। নীতিবিদ্যার প্রকৃতি ও আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী নৈতিকতার আদর্শনিষ্ঠ অংশেই এর আলোচনার প্রাধান্য, পরানীতি বিদ্যায় নয়। কেননা, নৈতিকতার প্রায়োগিক আলোচনাটি আদর্শনিষ্ঠ প্রচলিত নীতিবিদ্যায় স্থান পেয়েছে। তবে তাই বলে নীতিবিদ্যার পরানীতিবিদ্যা অংশের আলোচনায় পরিবেশ অন্তর্ভূক্ত নয়, তাও নয়। কেননা, আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা আর পরা নীতিবিদ্যা এই উভয় নীতিবিদ্যাই মূলত একই লক্ষ্যে ধাবিত হয় ও একই বিষয়ের অনুসন্ধান করে। এ বিষয়ে পিটার সিঙ্গার বলেন, তাত্ত্বিক দিক পরিপূর্ণভাবে মহৎ কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে শুভ নয়- এমন কোনো আদর্শ পদ্ধতির আলোচনা নীতিবিদ্যা নয়। তার মতে, যে নৈতিক অবধারণ ব্যবহারিক থেকে শুভ নয়, তা অবশ্যই তাত্ত্বিক থেকে ত্রুটিতে বিজড়িত। কারণ নৈতিক অবধারণের সার্বিক লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা

বাংলা 'নৈতিক' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ ethics। এই ethics শব্দটি এসেছে গ্রীক ethos শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো রীতিনীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদি। অনেক সময় ethics-কে moral philosophy বা নীতিদর্শন নামেও অভিহিত করা হয়। moral শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন mores থেকে। এর অর্থও রীতিনীতি, অভ্যাস। এভাবে ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, কোন কিছুর প্রতি বা ব্যাপারে কাম্য আচার-আচরণ নির্ণয়ের জন্য সে ক্ষেত্রে ethics-এর নির্দেশনা বা অনুশাসনের অবতারণা করা যায়। এজন্য এথিক্সকে মানুষের রীতি বা আচরণ সম্পকীর্য় বিজ্ঞানও বলা হয়।

একটি বিষয় সর্বজন জ্ঞাত যে, ethics বা নৈতিক বা নৈতিকতার যে আলোচনা, তা হয়ে থাকে 'নীতিবিদ্যায়'। তাই আমাদের কাঙ্খিত আলোচনার স্বার্থে অর্থ্যাৎ ethical অনুশাসনের দিকনির্দেশনা আলোকপাতের স্বার্থেই নীতিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সহজভাবেই বলে নেয়া ভালো যে, নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে যে বিদ্যায়, তাকে 'নীতিবিদ্যা' বলে। মানুষ স্বেচ্ছাকৃতভাবে যে আচরণ করে থাকে সেটার মূল্যায়ন করে থাকে নীতিবিদ্যা বা

Dhaka University Institutional Repository

ethics। উইলিয়াম লিলি (William Lillie) বলেন যে, সমাজবদ্ধ মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালত্ব, মন্দত্ব নিয়ে আলোচনা করে যে বিদ্যা সেটাই হলো নীতিবিদ্যা (লিলি, ১৯৫৬ : ১-২)।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই নৈতিকতা কি? আগেই বলা হয়েছে, ইংরেজি ethics আর বাংলা নৈতিকতা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো রীতিনীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তির 'আচার-আচরণ' আর 'রীতিনীতি' কিংবা 'ভালো', 'মন্দ', 'উচিত', 'অনুচিত' ইত্যাদি প্রয়োগ করা বা নিয়ে কাজ করতে হয়ে থাকে মানুষের। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে ফলাফল আর উপযোগিতার ভিত্তিতে এসব শব্দ দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মূল্যায়নকারী বা ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিতর্ক আর জটিলতার অবতারণাও ঘটে থাকে। আর তখনই সেখানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে নীতিবিদ্যার। অর্থ্যাৎ, নীতিবিদ্যা উল্লেখিত শব্দের যথার্থ অর্থ, ভালত্ব এবং মন্দত্ব জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান দেবার চেষ্টা করে থাকে। আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ভালো-মন্দ, উচিৎ-অনুচিৎ ইত্যাদি যেহেতু ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই নীতিবিদ্যাকে মানুষের চরিত্র বা আচরণ সর্ম্পকীয় বিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে। নীতিবিদ্যা মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া, অভ্যাস আর আচরণ এবং চরিত্রের মূল্য বিচার করে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, নীতিবিদ্যা হলো মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ ভালত্বের বিজ্ঞান (*Ethics is the science of the highest good of human life*)।

সুতরাং, পরিবেশের মতো আলোচ্য বিষয়টি নৈতিক বিশ্লেষণের বিষয়। ভোগবাদী বিশ্বে মানুষেরই অনাচারের ফলশ্রুতি এই পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটি। এর কারণে মানুষের সার্বিক জীবন আজ তটস্থ, বিপর্যস্থ ও বিপর্যয়ের বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে। তাই নীতিবিদ্যার আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে অত্যাবশ্যক। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে নীতিবিদ্যার স্বরূপ তুলে ধরা প্রয়োজন। অর্থ্যাৎ, বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকার ব্যাপারে পর্যালোচনা আর সিদ্ধান্তের স্বার্থে আমাদের 'নৈতিকতা' বা 'নীতিবিদ্যা' সম্পর্কে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা জরুরি।

প্রখ্যাত নীতিতত্ত্ববিদ উইলিয়াম লিলি (১৯৫৬) তাঁর *'An Introduction To Ethics'* গ্রন্থে নীতিবিদ্যার ব্যাপারে বলেছেন, This just the kind of question with which ethics deals- what is the true meaning of such words as good and right and ought which are used so commonly in every day conversation. তিনি আরও বলেন, We may define ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies- a science which judges this conduct to be right or wrong to be good or bad or in similar way.

আরেক চিন্তাবিদ জন এস ম্যাকেঞ্জি (১৯৯৭) তাঁর *'A Manual of Ethics'* গ্রন্থে বলেছেন, Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct. It is general theory of the conduct and considers the actions of human being with reference to their rightness or wrongness, their tendency to good or to evil.

Dhaka University Institutional Repository

নীতিবিদ্যার কাজ মানব আচরণের মূল্যায়ন। আর সাধারণভাবেই মূল্যায়নের সঙ্গে মানদণ্ডের প্রসঙ্গ আসে। কেননা, কোন একটি মানদণ্ডকে সামনে রেখেই মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। আবার আচরণের মানদণ্ড হিসাবে কোনটি গ্রহণ করা হবে, এটা নির্ধারণ নিয়েও নীতিবিদ্যায় তৈরি হয়েছে দীর্ঘ বিতর্কের। এসব বিতর্কের ফলশ্রুতি হিসাবে উপযোগবাদ, বুদ্ধিবাদসহ নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

২.১ নীতিবিদ্যার ইতিহাস

নৈতিকতার ইতিহাস নতুন নয়। উইলিয়াম লিলির (১৯৫৬) মতে, যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে, মূলত তখনই এর উদ্ভব। দলবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে মানুষ কিছু রীতিনীতি মানতো। সেটাও একধরণের নৈতিকতা। সেটা ছিলো সহজাত বিষয়। সময়ের পরিবর্তনে পরবর্তীতে প্রথা এবং চেতনার স্তরও আসে। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে সহজাতভাবে যেসব নীতি মান্য করা হতো, কালক্রমে তাই গোষ্ঠীর প্রথায় পরিণত হয়। আর এই গোষ্ঠীর প্রথা চর্চার ফলে একপর্যায়ে তা ব্যক্তিপর্যায়ে বিচার-বিবেচনা দ্বারা মান্য হয়েছে। এই ব্যক্তিপর্যায়ের অবস্থা অবশ্যই ব্যক্তির চেতনার ফলশ্রুতি।

উল্লেখিত তিনটি পর্যায়ের সমাপ্তি ঠিক কবে ঘটে তা অবশ্য দিনক্ষণ ঠিক করে বলা যায় না। তবে প্রাচীন গ্রীসে ৫০০ খ্রিস্ট পূর্বে শুরু হয়ে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মেট ১০০০হাজার বছর দার্শনিক চিন্তাধারার চর্চা ও বিকাশের প্রমাণ মেলে। এই সময়ে অধিবিদ্যক (*metaphysical*), তত্ত্ববিদ্যক (*ontological*) এবং নৈতিকতা (*ethical*) সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে। খ্রিস্টীয় ৫০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত সময়ের দর্শন ছিলো ধর্মাশ্রিত। ওইসময়ের নীতিবিদ্যা ছিলো ধর্মের ব্যাখ্যার আড়ালে। চার্চীয় অনুশাসন আর যুক্তিহীনতা নৈতিকতাকে দৈব-প্রত্যাদেশের বিষয়ে পরিণত করে।

১৫০০সালের পর ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব জাগরণের মধ্যদিয়ে স্বাধীন ও যৌক্তিক চিন্তা মানুষ ফের শুরু করে। চার্চ ও গোষ্ঠী প্রথার আর্গল ভেঙ্গে নীতিচিন্তা বেরিয়ে আসে মুক্তবুদ্ধির সওয়ারে। তখন একইসাথে মানুষের নীতিসম্পর্কিত চিন্তা নৈতিক তত্ত্বে রূপ লাভ করে। এরপর সেই উনিশ শতক এবং বিশ শতকের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত নীতিবিদ্যার নিত্য নতুন মতবাদ আর দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্গী করে নীতিবিদ্যার নিরন্তর পথচলা অব্যাহত রয়েছে। কালের বিচারে উনিশ শতক পর্যন্ত সময়টাকে অবশ্য আধুনিক এবং পরবর্তী সময়টাকে সমকালীন ও এরও পরবর্তী সময়টাকে উত্তর আধুনিক যুগের চিন্তা বলে ধরে নেয়া হয়। এরমধ্যে ১৮শতকের দিকে অনুসঙ্গ মনোবিজ্ঞানের (*associationist psychology*) প্রভাবে বাটলার, হিউম, স্মিথ প্রমুখ দার্শনিকরা চেতনাকে (*conscience*) নৈতিকতার বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করেন। উনিশ শতকে হার্বার্ট স্পেন্সার, লেসলি স্টিফেন প্রমুখ নৈতিকাকে বির্বতনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেন। জার্মান দার্শনিক হেগেল, গ্রীণ প্রমুখ এই তত্ত্বের অনুসারী। উনিশ শতকের শেষের দিকে নৈতিকতার ক্ষেত্রে উপযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তারই প্রভাবে জেরেমী বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ দার্শনিক ভিন্ন ধারার তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। আর বিংশ শতকের প্রথম দিকে জি ঈ ম্যুর পূর্ববর্তী বিভিন্ন নীতিতত্ত্বের সমালোচনা করে নতুন ধারার দৃষ্টিভঙ্গিও প্রবর্তন করেন। মূলত তারসময় থেকেই নীতিদর্শন থেকে সমকালীন নীতিবিদ্যা

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।আধুনিক যুগের নীতিবিদ্যা হিসাবে সুখবাদ, উপযোগবাদ, কান্টের নীতিবিদ্যা বা কান্টের বুদ্ধিবাদ বা আকারবাদ, পূর্ণতাবাদ ও সজ্ঞাবাদকে বিবেচনা করা হয়। আর সমকালীন নীতিবিদ্যা হিসাবে সমকালীন প্রকৃতিবাদ, অপ্রকৃতিবাদ, আবেগবাদ পরামর্শবাদ ও নৈতিক যুক্তিকে বিবেচনা করা হয়।

২.২ নীতিবিদ্যার প্রকারভেদ

প্রাচীন যুগ (গ্রীক পর্ব) থেকে শুরু করে বিশ শতক পর্যন্ত নৈতিক চিন্তাকে প্রধানত দু'টি ধারায় বিভক্ত করা যায়। তা হলো- প্রচলিত বা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা (*normative ethics*) ও ভাষাতাত্ত্বিক বা পরানীতিবিদ্যা (*meta-ethics*)। প্রচলিত বা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। তা হলো- তাত্ত্বিক (*theoritical*) ও প্রায়োগিক (*practical*)। এগুলির বাইরে বৈজ্ঞানিক বা বর্ণনামূলক (*scientific or descriptive ethics*) নামে আরও একধরণের নীতিবিদ্যা রয়েছে।

প্রচলিত বা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার কাজ হলো মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি মূল্যায়নের জন্য আদর্শ বা নৈতিক মানদণ্ড ও নিয়মাবলীর তাত্ত্বিক অনুসন্ধানসহ এদের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। নৈতিক মূল্য বিচারের জন্য বিভিন্ন নীতিবিদ বিভিন্ন আদর্শের কথা বলেন। এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক নীতিবিদ্যায় সুখবাদ, উপযোগবাদ, বিচারবাদ, পূর্ণতাবাদ, সজ্ঞাবাদসহ বিভিন্ন মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে। তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যার কাজ হচ্ছে, মানুষের চারিত্রিক আচরণ ও নৈতিক নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের জন্য যে সকল নৈতিক মানদণ্ড ও নিয়মাবলীর প্রয়োজন সেগুলির অনুসন্ধান ও অনুশীলন করা। আর প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার প্রধান কাজ হচ্ছে নৈতিক মানদণ্ড ও নিয়মাবলী প্রয়োগ করে সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাসমুহ মূল্যায়ন ও সমাধানের চেষ্টা করা। পিটার সিঙ্গার প্রায়োগিক নীতিবিদ্যাকে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বলেন এবং এটা নৈতিকতার প্রয়োগগত বিদ্যা বলে মনে করেন (সিঙ্গার, ২০০৪ : ২)।

পরানীতিবিদ্যা তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত নৈতিক ভাষার ধারণাগত ও নৈতিক বিশ্লেষণ করে থাকে। অর্থ্যাৎ এই ধারার দার্শনিকরা মনে করেন যে, নৈতিকতার আদর্শনিষ্ঠ আলোচনার পরও এর আরও কিছু কাজ থেকে যায়। ওইসব কাজের মধ্যে নৈতিকতায় ব্যবহৃত পদ বা শব্দসমুহের অর্থ উদ্ধার ও বিশ্লেষণের দিক রয়েছে। পরানীতিবিদ্যা নৈতিক শব্দ, উচ্চারণ এবং বাক্যসমুহের যৌক্তিক প্রকৃতি, নৈতিক যুক্তির স্বরূপ এবং যেসব উপাদান নিয়ে নৈতিকতার সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হয়, সেসব পর্যালোচনা করে।

তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে, প্রচলিত নীতিবিদ্যার বিরোধিতার ফলশ্রুতিতে পরানীতিবিদ্যা গড়ে উঠলেও আসলে নীতিবিদ্যার এই প্রকার দু'টি সময়ের ব্যবধানের বা দু'সময়ের দু'টি ভিন্ন রূপ বৈ কিছু নয়। এগুলি যদিও বিপরীতধর্মী বলে মনে হয়, আসলে তা নয়। পিটার সিঙ্গার বলেন, তাত্ত্বিক দিক পরিপূর্ণভাবে মহৎ কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে শুভ নয়, এমন কোনো আদর্শ পদ্ধতির আলোচনা নীতিবিদ্যা নয়। তার মতে, যে নৈতিক অবধারণ ব্যবহারিক থেকে শুভ নয়, তা অবশ্যই তাত্ত্বিক থেকে ত্রুটিতে বিজড়িত। কারণ নৈতিক অবধারণের সার্বিক লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা (প্রাগুক্ত)। অর্থ্যাৎ, ব্যবহারিক বা

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়োগিক বাস্তবতার বাইরে কোন তাত্ত্বিক দিক হতে পারে না। সুতরাং নীতিবিদদের মধ্যে বাহ্যত যে বিভক্তি তা চিন্তার বিভক্তি মাত্র।

উল্লেখ্য, ষাটের দশকে ব্যবহারিক বা প্রয়োগিক নীতিবিদ্যার সূত্রপাত ঘটে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের নীতিবিদ্যাবিরোধী মনোভাব থেকে। তারা বলেছিলো যে, নীতিবিদ্যা হলো সেই দার্শনিক আলোচনা যা অর্থহীন নৈতিক আলোচনারই নামান্তর। নৈতিক বাক্যগুলোকে তারা আবেগ সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করেছিলেন। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের সূত্র ধরেই দার্শনিকরা নীতিবিদ্যক আলোচনায় যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেন। এরফলে বেরিয়ে আসে যে, নৈতিক মূল্যায়নের সময়ে কেবল আবেগ প্রকাশ পায় না, সিদ্ধান্তও প্রকাশিত হয়। মূল্যায়ন আর যৌক্তিকতা নিরূপন এক বিষয় নয়। কোন একটি কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং কাজটি যুক্তিযুক্ত করা দু'টি বিষয়। এই যে দুটি বিষয়, এদেরকে ঘিরেই পরবর্তীতে নীতিবিদ্যার আর্দর্শনিষ্ঠ দিকে নতুন একটি ধারা সৃষ্টি হয়। আর সেটি হলো প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা। এই নীতিবিদ্যা চিকিৎসা, ব্যবসা, পরিবেশ, গর্ভপাত, আত্মহত্যা, কৃপাহত্যাসহ আধুনিক মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে।

২.৩ পরিবেশ নীতিবিদ্যা

নীতিবিদ্যার এই নানা প্রকারের মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো পরিবেশ নীতিবিদ্যা। এটা নীতিবিদ্যার আদর্শনিষ্ঠ দিকটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরিবেশ নীতিবিদ্যাও দর্শনের অন্যান্য শাখার মতোই একটি শাখা এজন্য যে, দর্শনের অন্যান্য শাখার পরিবেশ নীতিবিদ্যায়ও বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। যেমনিভাবে নীতিবিদ্যা মানব আচরণ নিয়ে আলোচনা করে, তেমনিভাবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ও মানব আচরণ। এখানে দার্শনিক মতবাদ রয়েছে, যার মাধ্যমে আচরণের যৌক্তিকতা ও নীতিমালা তৈরি করা যায়। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় নৈতিকতার প্রয়োগিক আলোচনা গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অর্থ্যাৎ, এটা প্রায়োগিক নীতিবিদ্যারই একটি নতুন শাখা।

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিভিন্নপ্রকার মূল্য, উচ্চ ও নীচু শ্রেণীর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিবেশ দুষণের কারণ ও প্রতিকারের উপায়ন মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়। এটা সমাজে বসবাসকারী মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব, এমনকি বর্তমান সমাজে পরিবেশে বিরাজমান জীবজন্তুর কতটুকু স্বাধীনতা ভোগের অধিকার আছে বা আদৌ নেই- তাও পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় (খালেক, ২০০৬ : ৩২৩।

একারণেই পরিবেশ নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলা হয়ে থাকে যে, এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক জগতে বিরাজমান মূল্যের একটি সুবিন্যস্ত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। রলস্টন পরিবেশ নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, পরিবেশ নীতিবিদ্যা হলো একটি যৌক্তিক বিধিবিধানের নাম যার আলোচনা প্রাকৃতিক জগত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রজাতি সমুহের ব্যাপারে দায়িত্বপালনের বিষয়টি অনুসন্ধান করে। (*Environmental*

Dhaka University Institutional Repository

ethics is a systematic account of values carried by natural world, coupled with an enquiry into duties towards animals, plants and species.) (প্রাগুক্ত,)

ডোনাল্ড শিরার (Donald Scherer) ও টমাস এটিগ (Thomas Attig) তাদের সম্পাদিত *'Ethics and the Environent'* গ্রন্থে বলেন, পরিবেশ নীতিবিদ্যা একটি সাধারণ নীতিবিদ্যা যেখানে আলোচ্য বিষয় হিসাবে পরিবেশের বিষয়াদিই কেবল বিবেচিত হয়। তারা আরও বলেন, অধিকন্তু পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিশেষায়িত নীতিবিদ্যার চেয়েও বেশি কিছু। এটা সাধারণভাবে এমন কোন ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয় না যেখানে কেবল গতানুগতিক নীতি দ্বারা সম্পদের ক্ষতিসাধন ও দুষণ নিয়ে আলোচনা করে না। বরং এটা বাস্তুতন্ত্রকে বোঝার জন্য মৌলিক নৈতিক নীতি পুর্নগঠন ছাড়া আর কিছুই নয়।

(*Environmental ethics, however, is more than a specialized ethic. It is emerging not to simply as a field in which traditional principles are applied to situations of resource depletion and pollution, but rather as one in which a dominating question is whether an enhanced understanding of ecosystems will entail the transformation of fundamental ethical principles, not just new applications.*) (Scherer and Attig, 1983 : 2)

২. ৪ গণমাধ্যম

গণমাধ্যম পরিভাষাটি প্রকৃতপক্ষে 'গণযোগাযোগ' পরিভাষার সংক্ষিপ্ত। আমরা যদি 'গণ' এবং 'মাধ্যম'কে আলাদা চিনতে চাই তাহলে 'গণ' এবং 'যোগাযোগ'কে আলাদাকরণের মাধ্যমেও তা সম্ভব। কেননা গণযোগাযোগের জন্যই গণমাধ্যম।

গণ বা mass শব্দটির ব্যাপারে ইংরেজি The Concise Oxford Dictionary (নবম সংস্করণ) থেকে অনেক গেছে। সুনির্দিষ্ট অর্থ হিসাবে 'গণ' শব্দটির প্রতিশব্দ উল্লেখ করতে গেলে 'অনির্দিষ্ট আকারের কোনও বিষয়কে সঙ্গতিপূর্ণকরণ' বা 'বিষয়সমুহের একটি নিবিড় সমষ্টিকরণ' বা 'একটি বৃহৎ সংখ্যা বা পরিমাণ'কে বোঝানো যায়। কিন্তু এই যে অর্থ দেখানো হয়েছে, সেটা যদি গণমাধ্যমের 'গণ' হয় তবে অর্থটা কমবেশি ভিন্ন হবে। এই গণকে তখন আর শব্দার্থের শব্দ হিসাবে না নিয়ে পরিভাষার শব্দ হিসাবে নিতে হবে। আর তখনই সমাজতাত্ত্বিকরা 'গণ' শব্দটির আলাদা অর্থ নেবেন। তখনই এর অর্থ করা যায় 'বৃহৎ দর্শক-শ্রোতা-পাঠক', 'যাবতীয় কর্ম', 'গণহত্যা' ইত্যাদির নির্দেশিত অর্থের প্রতি। সুতরাং বলা যায়, এটা (গণ) আসলে 'ব্যাপক' অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাংলা ও ইংরেজি অভিধানে যোগাযোগের আলাদা অর্থ রয়েছে। গণমাধ্যমের আলোচনায় যোগাযোগকে যদি বার্তা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তা অযথার্থ হয় না। তবে এটা ঠিক যে যখনই 'যোগাযোগ' শব্দটির তথ্য সংক্রান্ত ব্যবহার আসে, তখনই তার সঙ্গে মিডিয়ার ধারণা উপস্থিত হয়। 'যোগাযোগ' শব্দটি মিডিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যকে ছদ্মবেশে ধারণ করতে ঝুঁকে পড়ে। একইসাথে তাদের আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের অনুরূপ হিসাবে বৃহৎক্ষেত্রের যোগাযোগকে চিন্তা করার প্রবণতার উদ্ভব ঘটায়।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, গণমাধ্যম কি? তাহলে বলা যায়, সাধারণভাবে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, রেডিও এবং বিজ্ঞাপনকে বোঝায়। বই, ম্যাগাজিন, মিউজিক, টিভি শো, ক্যাবল চ্যানেল, চলচ্চিত্র, থিয়েটার, সংবাদপত্র ও টিভি স্টেশন এরসাথে বইপ্রকাশনাও (বিশেষ করে জনপ্রিয় গল্প বা উপন্যাস) এবং পাশ্চাত্যে সঙ্গীতের পপশিল্প ও উপমহাদেশে লোকগীতিকে যুক্ত করা যায়। যেমনঃ ১৯৫২সালে ভাষা আন্দোলনের আগে-পরে রচিত ও গাওয়া আর ১৯৭১সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন গানকে এ ধরণের যোগাযোগের আওতায় আবদ্ধ করা যায়।

আর যদি জানতে চাওয়া হয় 'সংবাদ' কি, তাহলে এককথায় বলা যায়- 'সংবাদ' (*News*)-এর নির্ধারিত কোন একক সংজ্ঞা নেই। পাঠক, সাংবাদিক, সংবাদপত্রের মালিক- একেকজনের সংবাদ একেক ধরণের (চৌধুরী, ২০০৯ : ১৫)। এরপরও সহজ করে বললে, সংবাদ হলো চলতি তথ্য। সংবাদ এমন একটা কিছুর বিবরণ যা লোকজনের কাছে কৌতুহলোদ্দীপক। তবে আগামীতে যা ঘটতে পারে, তার আভাস থেকেও সংবাদ হতে পারে। এমনকি ভবিষ্যদ্বানী, ভবিষ্যতে কোন বিষয়ের সম্ভাব্য ধারণাদান, জল্পনা-কল্পনাও সংবাদ হতে পারে। তবে এর সম্ভাবনা পরিসর বেশ সীমিত। যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিচেল চার্নলি সংবাদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, সংবাদ আজকের নিটোল মোড়কে থরে থরে সাজানো আগামীকালের ইতিহাস। আর অধুনালুপ্ত নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের অন্যতম নগর সম্পাদক স্ট্যানলি ওয়াকার বলেন, সংবাদ হলো মানুষের অভিলাষের জোয়ার্ট-ভাটা, মানুষের গ্লানি ও মহিমার একটা মোটামুটি পরিমাপ। ...সংবাদ হচ্ছে মানুষের অবিশ্বাস্য নীচুতা ও অতুলনীয় সাহসের সেরা দলিল।

আসলে গণমাধ্যমের বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা রয়েছে। গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা একটা সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন তাকে আমরা তথ্য এবং বিনোদন পণ্যের বৃহৎ বিতরণের চিন্তনকে সামনে রেখে দেয়া সংজ্ঞারূপে চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে গণমাধ্যমের কার্যপরিধি, কর্মপন্থা, সেবা বা তথ্য উপস্থাপনা, পৌছানোর ইচ্ছা-মানসিকতা ইত্যাদিতে পরিবর্তন আসে। একসময়ে ছাপার হরফের তথ্যের জন্য পরের দিন সকাল এমনকি সন্ধ্যা বা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো এই বাংলাদেশে। ব্রডশিট (বড় আকারের) পত্রিকা হাতে আসলেই কেবল দেশ-বিদেশ সম্পর্কে জানা যেতো। এরপর টেরিস্ট্রিয়াল বা জাতীয় টেলিভিশনের বদৌলতে এই অপেক্ষার প্রহর কমে। যেমন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিটিভির মাধ্যমে গ্রাম-গঞ্জের লোকজন (সুবিধা থাকা সাপেক্ষে) রাতের মধ্যে একধরণের তথ্য অবগত হওয়ার সুযোগ পায়। চলতি শতকের গোড়ার দিকে ও গত শতকের শেষের দিকে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের আগমনে এই তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হতে শুরু করে। গত কয়েকবছরে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের চ্যানেলের সংখ্যার পাশাপাশি এফএম রেডিও স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে সাথে বিলম্বে তথ্য প্রাপ্তির পরিবর্তে অল্প সময়ে তথ্য মিলছে। ব্যাপারটি সহজ থেকে সহজতর হয়ে পড়ছে। ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে ইন্টারনেটের ব্যবহার যখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন বৃহৎ ক্ষেত্রে জনগণ থেকে জনগণের মধ্যকার

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগের সম্ভাবনা নাটকীয়ভাবে প্রসারিত হয়েছিল। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষ করে ইন্টারনেটের এই বিকাশের পরও ওয়েবভিত্তিক সংবাদপত্রের পাশাপাশি ব্রডশিট পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইন্টারনেট সংস্করণও পরের দিন ভোর নয়, ওইরাতেই তথ্য সেবা পৌছে দিচ্ছে পাঠককে। আর বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন পত্রিকা মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্য সংস্করণ বের করে ইন্টারনেটে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে যে কারও সম্প্রচারের সুযোগ রয়েছে। মুঠোফোনের বদৌলতে বড় কোন আয়োজন করে টেলিভিশন, বিদ্যুৎ লাইন, এন্টেনা বা ডিশ লাইন টেনে সুসজ্জিত সুস্থির পরিবেশের আর প্রয়োজন পড়ে না এখন। বাসে বা ট্রেনে করে কেউ যাচ্ছে কোথাও কিংবা মর্নিং ওয়ার্কে বের হয়েছে; কাজ সারতে সারতে চলার পথে খবর শোনার বিষয়টিও মুঠোফোন আর এফএমের বদৌলতে অথবা শুধু মুঠোফোনের মাধ্যমেও কিন্তু সেরে নেয়া সম্ভব হচ্ছে।

সুতরাং সময় এবং প্রযুক্তির পরিবর্তন ও অগ্রগতির সাথে সাথে গণমাধ্যমের পরিধির এই ব্যাপক বিস্তৃতির বিষয়টি সামনে রেখে এর সংজ্ঞায়নের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে পুনঃসংজ্ঞায়নের। জুলিয়ান হ্যারিস ও স্ট্যানলি জনসন তাদের 'দ্য কমপ্লিট রিপোর্টার' গ্রন্থে বলেছেন, 'সংবাদ হচ্ছে সকল চলতি ঘটনাবলীর সংমিশ্রন যার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ রয়েছে এবং সেরা সংবাদ হচ্ছে তাই যা অধিকাংশ পাঠককে আগ্রহী করে তোলে। কার্ল ওয়ারেন তার 'মডার্ন নিউজ রিপোর্টিং' গ্রন্থে বলেন, সংবাদ হচ্ছে মানবগোষ্ঠীকে আগ্রহী করে তোলে এমন কিছুর সময়োচিত রিপোর্ট বা সেরা সংবাদ হচ্ছে যা অধিকাংশ পাঠককে আগ্রহী করে তোলে।

কানাডার যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ রোওল্যান্ড লরিমার (Rowland Lorimer) তিনি 'গণযোগাযোগ : নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু সংজ্ঞা' (আহমেদ ও অন্যান্য, ২০০৯ : ১১৫) শীর্ষক প্রবন্ধে তিনটি ভিন্ন উপ-অনুচ্ছেদের সমন্বয়ে গণযোগাযোগের একটি নতুন সংজ্ঞার প্রস্তাব করেছেন। লরিমারের মতে, যোগাযোগ গত শতকের শেষ দশক থেকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে একটি বৃহৎ ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। গণযোগাযোগ হলো মেধার রাষ্ট্র এবং আন্তঃরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রেরণ, যার মাঝে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ তথ্য অথবা বিনোদনের প্রচার, বিকেন্দ্রীভূত তথ্য অথবা বিনোদনের বিতরণ বা প্রচার এবং বৃহৎ ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত মিডিয়ানির্ভর মিথষ্ক্রিয়ার যোগান হয়ে থাকে। এখানে মোট তিনটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এগুলো হলো- ১. কেন্দ্রীভূত বৃহৎ তথ্য অথবা বিনোদনের প্রচার, ২. বিকেন্দ্রীভূত তথ্য অথবা বিনোদনের বিতরণ বা প্রচার এবং ৩. বৃহৎ ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত মিডিয়ানির্ভর মিথষ্ক্রিয়ার যোগান।

প্রথমটি হলো মুদ্রণ, স্ক্রিন, অডিও, সম্প্রচার, অডিও ভিজুয়্যাল এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃহৎ অপরিচিত অডিয়েন্সের জন্য তথ্য এবং বিনোদনের যৌথ বাণিজ্যিক অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদন। সরকারি এবং বেসরকারি উভয়ধরণের ভোগের জন্য জনগণের কার্যাবলীর নির্দিষ্ট কোনও ক্ষেত্রে এটা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, ম্যাগাজিন, বই, ধারণকৃত ও পারফর্ম করা সঙ্গীত এবং বিজ্ঞাপন এই প্রকারের গণমাধ্যম। দ্বিতীয়টি বা বিকেন্দ্রীভূত গণগোযোগাযোগ মূলত জনগণের প্রবেশযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

চ্যানেল। স্বতন্ত্র বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিস্তৃত বিতরণযোগ্য প্রতীকী উৎপাদন এটা। তবে কখনো কখনো এটাও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যেমন ওয়েব, ই-মেইল।

তাই দেখা যাচ্ছে, গণমাধ্যম যেখানে প্রযুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর জোর দিয়েছে, সেখানে গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার ওপর মনোযোগ প্রদান করে। আর সার্বিকভাবে বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রচার ও প্রকাশ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে বলা যায়, নিয়ন্ত্রণহীন বা নীতির সরাসরি ফলাফল হলো বৈশ্বিক গণমাধ্যম ব্যবস্থা, যেটা অন্যান্য পণ্য এবং সেবার বৈশ্বিক বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বিজ্ঞাপন হলো দ্বিতীয় পথ যেটা বৈশ্বিক গণমাধ্যম ব্যবস্থাকে বৈশ্বিক বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এটা নতুন বাজার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও একটি মূল অস্ত্র।

২.৫ গণমাধ্যমেই গণযোগাযোগ

যোগাযোগের জন্য গণমাধ্যম। যোগাযোগের পরিণতি হলো গণমাধ্যমে অবগাহন। পৃথিবীর আদিমতম এককোষী প্রাণীর যেদিন জন্ম যোগাযোগের শুরুও সেদিন থেকে। কেননা, তখন তাকে পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকে সাড়া দিতে স্থানত্যাগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া করতে হয়েছে। সেটাও ছিলো একধরণের যোগাযোগ। পরবর্তীতে বহুকোষী প্রাণী থেকে শুরু করে মানুষের আগমন, মানুষের ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ জীবন-যাপন, সামাজিক জীবন ইত্যাদির পরতে পরতে কখনো আকার-ইঙ্গিত বা কখনো ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছে। তাই বলা হয় যে, ভাষার উৎপত্তি, লিখন বা লিপির আবিষ্কার, পরবর্তীতে মুদ্রাক্ষরের আবিষ্কারসহ হালের টেলিভিশন, বেতার, থিয়েটার, মোবাইল ইত্যাদি যোগাযোগ ও গণযোগাযোগ করেছে সার্থক, সফল, অর্থপূর্ণ, বিশাল ও বিশদ।

আসলে ধ্যানমগ্ন ঋষির ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে প্রচলিত অর্থে যে বিষয়টি যোগাযোগ হিসাবে স্বীকৃত- এই সবগুলোকেই যোগাযোগ বলা যায়। রাস্তায় গাড়ি চালানো অবস্থায় হঠাৎ লালবাতি জ্বলতে দেখে থেমে যাওয়া বা নিজে নিজে কথা বলা- এটা যেমন একধরণের যোগাযোগ। ক্লাসে শিক্ষক বা অফিসে বসকে কোন কথা বলার আগে নিজে তা রিহার্সেল বা চিন্তা করে নেয়ার নামও যোগাযোগ। আবার শিক্ষককে যে কথাটি বলতে চাই প্রিয় সহপাঠীর সাথে তা আলোচনা করে নেয়ার যেমন একটি প্রক্রিয়া আছে, তেমনি আরও চার/পাঁচজন সহপাঠি মিলে একসঙ্গে আলোচনা করে পরে বিষয়টি শিক্ষকের কাছে উপস্থাপনেরও একটি প্রক্রিয়া আছে। এভাবে নানাধরণের যোগাযোগ আছে। তবে অর্থপূর্ণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বার্তার প্রেরক এবং প্রাপকের একটি আবশ্যকীয় বিষয় রয়েছে। এই যে বিভিন্নধরণের যোগাযোগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো, এগুলোকে অন্তর্ব্যক্তিক (Intra-personal), আন্তঃব্যক্তিক (Inter personal) এবং দলগত বা গ্রুপ যোগাযোগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা। কেননা, যে বার্তা নিজের ভেতরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা নিছক অন্তর্ব্যক্তিক বৈ কিছু নয়। তেমনি বিষয়টি এক বা একাধিক বন্ধুর মাঝে সীমিত হলে সেটা হবে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ। দলবদ্ধ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা অবশ্য ১০জনের বেশি মানুষের মাঝে বিষয়ের অংশগ্রহণের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এভাবে দেখা যায়, এই

Dhaka University Institutional Repository

তিনধরণের যোগাযোগ প্রক্রিয়া তা যদি একইসঙ্গে কোনও মাধ্যমের সাহায্যে অনেকের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়, তখন তা হয়ে যায় গণমাধ্যম।

যোগাযোগ নিয়ে সেই খ্রিস্টপূর্ব কালেও প্রাজ্ঞজনরা আলোচনা করেছেন। প্লেটো মতে পাওয়ায় যে, 'যোগাযোগ হলো কথার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করা'। প্লেটোর শিষ্য এরিষ্টটলের মতে, 'প্রণোদনের সকল সহজলভ্য উপায়ের অনুসন্ধানই হলো যোগাযোগ।' যোগাযোগ নিয়ে পরবর্তীতে বহু আলোচনা হয়েছে। মূলত সংবাদপত্রের উদ্ভব আর বিকাশের সঙ্গে এই যোগাযোগ সম্পর্কীয় আলোচনা বিস্তৃত হয়েছে। এরপর আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগের ধারণা, সংজ্ঞা, ও পরিধি বেড়েছে। তবে বিশ্বায়নের প্রভাবসহ ভোগবাদী জীবনে মানুষের নানা চাহিদা, সমস্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদির ব্যাসার্ধ বৃদ্ধির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি স্ফীতি ঘটেছে গণযোগাযোগের বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রকৃতি নির্ণয়ে।

সুতরাং, প্রকৃতি বিবেচনায় যোগাযোগকে নানাভাবে দেখানো যায়। কিন্তু যোগাযোগ যখন গণযোগাযোগ পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তাঁর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটিই অগ্রভাগে আসে। বৃহত্তর সমাজ নিয়েই গণমাধ্যমের যত কাজ। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ উইলবার শ্রাম, চার্লস রাইট, ল্যাসওয়েল প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলিত রূপায়ন করলে আমরা গণমাধ্যমের চারটি কাজ পাই। এগুলো হচ্ছে, চৌকিদারের ভূমিকা, নীতি-নির্ধারনী ভূমিকা, শিক্ষাদানের ভূমিকা এবং বিনোদন দেয়া।

২. ৬ গণযোগাযোগের ইতিহাস

গণযোগাযোগের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন গুহাবাসী মানুষের সময়েও গণযোগাযোগ ছিলো। তখন ধুম্র উদগীরণ বা ড্রাম কিংবা অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে শব্দ করে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ করা হতো। সময়ের অগ্রযাত্রায় ওই সাংকেতিক গণযোগাযোগ প্রথমে লিপির মাধ্যমে পরবর্তীতে নানাভাবে সংঘটিত হয়ে আসছে। হালে গণযোগাযোগ বলতে প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াকে বোঝায়। এই লিখিতভাবে বার্তা পৌঁছানোর প্রক্রিয়া সেই খ্রিস্টপূর্ব ৫০ অব্দে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের সময়ে শুরু হয় বলে ধরে নেয়া হয়। তখন মেষের চামড়ায় লিখিত 'দি অ্যাকটা দিউরনা' (The Acta Diurna) নামে একধরণের সংবাদপত্র প্রচলন ছিলো। এটিকেই বিশ্বের প্রথম সংবাদপত্র বলা হয়ে থাকে।

ভারত বর্ষে আর্য রাজাদের সময়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সংগ্রহ ও তা জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা ছিলো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'প্রতিবেদক' নামে একশ্রেণীর লোকের কথা জানা যায়, যারা শাসককে খবরাখবর সংগ্রহ করে দিতো। কৌটিল্য অবশ্য এদেরকে গুপ্তচর বলে অভিহিত করেছেন। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে বাগদাদে 'সাহিব-উল-বারিদ' বা সংবাদ-সংগ্রহ অধিকর্তা নামে প্রতিষ্ঠান ছিলো। এই প্রতিষ্ঠান দেশের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে খলিফাদের অবহিত করতো। সম্রাট অশোকের সময়েও রাজ আদেশ, সমন, ধর্মীয় বানী ইত্যাদি জনগণের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা ছিলো। মোঘল আমলে 'ব্যুরো অব ইন্টালিজেন্স' নামে একধরণের প্রতিষ্ঠান ছিলো যারা সাম্রাজ্যের খবরাখবর সংগ্রহ করতো। আবুল ফজলের

Dhaka University Institutional Repository

'আইন-ই-আকবরী'তে 'ওয়াকিয়া নবীশ' বা 'সংবাদ লেখক' নামে একশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের পরিচয় পাওয়া যায়। এরাই ব্যুরো অব ইন্টালিজেন্স কর্তৃক সংগৃহিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করতো। তাদের লেখা সংবাদগুলোকে 'নিউজ লেটার' বলা হতো। ১২-১৩ শতকের দিকে মধ্যপ্রাচ্যে 'টাউন ক্রায়ার্স' (Town criers) নামে এক প্রতিষ্ঠানের কথা জানা যায়। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ আজকের গণমাধ্যম বিশেষ করে বিজ্ঞাপন কাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এরা রাস্তা দিয়ে ঘন্টা বাজিয়ে লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করতো এবং উল্লেখযোগ্য সংবাদ চিৎকার করে জানিয়ে দিতো। এভাবে প্রাচীন, মধ্য এবং প্রাক-আধুনিক যুগে সংবাদপত্র ও গণযোগাযোগের কাজ ছিলো। তবে আধুনিক গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে মুদ্রণ প্রযুক্তির উদ্ভব একটি মাইলফলক। জার্মানীর গুটেনবার্গকে মুদ্রণের পথিকৃৎ বলা হয়। তবে তারও আগে চীনের ডান-হাং প্রদেশে প্রথম ছাপার কাজ শুরু হয়েছিলো ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। তবে ১৪৫২ সালে গুটেনবার্গে চলমান হরফ আবিষ্কারের ৪৫বছরের মধ্যে তা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩৯ সালে ফটোগ্রাফির আবিষ্কারের পর সংবাদপত্র ও বইয়ে ব্যবহৃত হয়। ১৮৮৪ সালে মোর্সেও প্রথমবারের মতো টেলিগ্রাফ বার্তা প্রেরণের সফলতা যোগাযোগের ক্ষেত্রে নয়াদিগন্ত উম্মোচন করে। এরআগে ১৮৭৬ সালে বেল অবশ্য সীমান্ত পারকারী টেলিফোন বার্তা আবিষ্কার করেন। পরের বছর আবিস্কৃত হয় ফনোগ্রাফ। ১৮৯৪ সালে প্রথম জনসমক্ষে প্রদর্শিত হলো চলমান ছবি, যা থেকে পরবর্তীতে সিনেমার উদ্ভব ঘটে। এরইমধ্যে স্কটিশ বিজ্ঞানী জেমস ম্যাক্সওয়েল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক আবিষ্কার করেন। এরপরই ১৮৯৫ সালে ইতালির বিজ্ঞানী মার্কোনী বিনা তারে বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করে যোগাযোগের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করেন। একইসময়ে এই একই বিষয়ে রাশিয়ার আলেকজান্ডার পোজোভসহ আরও কয়েকটি দেশে গবেষণা হয়। ১৯১৯ সালে মার্কোনী নিজে কানাডার মন্ট্রিলে রেডিও স্টেশন স্থাপন করেন। পরের বছর আমেরিকায় সম্প্রচার ও রাশিয়ায় স্টেশন স্থাপিত হয়। বেতারের এই চমকের তম্ময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবিস্কৃত হয় টেলিভিশন। বিবিসি ১৯৩৬ সালে টেলিভিশন সম্প্রচারই শুরু করে। ১৯৬৫ সালে সম্প্রচারে যুক্ত হয় যোগাযোগ স্যাটেলাইট। মূলত স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ও ক্যাবল টেলিভিশনের সমন্বয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ঘটনাটি ঘটে। যোগাযোগ মাধ্যম ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ছোঁয়া সময়ের ব্যবধানে আমাদের দেশেও সময়ের স্রোতধারায় বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বেই মানুষের জীবনের সঙ্গে একেবারেই ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে গণমাধ্যম।

২. ৭ গণমাধ্যমের অন্তঃসারশূন্যতা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অধিকাংশ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বা টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মালিকানা পুঁজিপতিদের। কালো টাকা সাদা টাকাওয়ালার প্রশ্ন বাদ দিলেও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন বা গ্রুপ অব কোম্পানীজের মালিকানা রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে। তারাই এর অর্থ যোগানদাতা। গণমাধ্যমের মালিক যেহেতু প্রতিষ্ঠানের অর্থযোগানদাতা, তাই সুপারস্ট্রাকচার বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণমাধ্যমের পলিসি কি হবে তা মালিকই ঠিক করে দেন। এই পলিসির ভেতরেই

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত হয় কোনধরণের সংবাদ বা অনুষ্ঠান নির্মাণ হবে, কোনধরণের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতাদর্শকে গণমাধ্যম প্রতিফলিত করবে সেই বিষয়টি। এটাই গণমাধ্যমের নিজের একটি দুর্বল দিক। এ কারণে সে যে কারও সংবাদপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়। তার এই সীমাবদ্ধতার কারণ হলো রাষ্ট্র, সংশ্লিষ্ট (গণমাধ্যম) প্রতিষ্ঠানটির মালিক বা মালিকপক্ষ ও প্রভাবশালীরা। এরবাইরে প্রতিষ্ঠানের 'পলিসি'ও তাকে অনিরপেক্ষ করে তোলে। 'সাদাকে সাদা' কিংবা 'কালোকে কালো' বলতে না পারার কারণের পেছনে এই 'পলিসি' নামক বিষয়টিও বেশ প্রভাবশালী উপাদান হিসাবে কাজ করে। ভারতের গণমাধ্যমের বিকাশই হচ্ছে 'দেশপ্রেম'র চেতনা থেকে। দেশের স্বার্থের বাইরে যায়, এমন সংবাদ পরিবেশন থেকে তারা বিরত থাকে। এক্ষেত্রে সরকার থেকে আরোপিত নয়, 'সেল্ফ সেন্সরশীপ' প্রথা দেখা যায় সেখানে। বাংলাদেশের মিডিয়ার বিকাশের চরিত্র হচ্ছে, কেউ সরকার আর কেউ বিরোধীপন্থী। যে কারণে এদের কেউ সরকারকে কঠোর সমালোচনা করে তৃপ্তি পায় আবার একইসময়ে সরকারের তোষামোদী করে অন্যরা। যে কারণে মোটামুটি সচেতন পাঠকের মধ্যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যারা কোনও বিষয়ে সঠিক খবর জানতে চান তাদের অনেকেই একাধিক পত্রিকা বা টিভির দ্বারস্থ হন। তাই বলা যায়, মিডিয়ার নিরপেক্ষতা বিঘ্নকারী উপাদানগুলোর কারণে এর (মিডিয়ার) শক্তিশালী অবস্থান অনেক সময়েই নড়েবড়ে হয়ে যায়। আর এ কারণে গণমাধ্যমের ওপর মানুষের আস্থার সংকট দেখা দেয়। এই অবস্থায় এসে অনেক মানুষকে অবশ্য দ্বৈতাচার করতে দেখা যায়। তারা সংবাদমাধ্যমের উপস্থাপিত তথ্যে বিশ্বাস করে না এমনকি ঘৃণাও করতে পারে। কিন্তু তারপরও তারা খবর পড়ে বা দেখে। এরপেছনের কারণ হলো, তারা নিজেদের সম-সাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে চলমান রাখতে চায়।

গণমাধ্যম থেকে (গণমাধ্যম যা প্রকাশ বা প্রচার করবে তা থেকে) নিরপেক্ষ তথ্য না পাওয়ার ব্যাপারে আরও তিনটি বিষয় কাজ করে। একটি হচ্ছে : পত্রিকার সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার বা অন্য কোনও সিনিয়র সাংবাদিক বা সম্পাদক, বার্তা সম্পাদকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের প্রভাব, আরেকটি হচ্ছে : রাজনৈতিক আদর্শ আর তৃতীয়টি হচ্ছে : সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা। রিপোর্টার বা সিনিয়র সাংবাদিকের পছন্দের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সংবাদ প্রথমত উহ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংবাদের গুরুত্ব থাকলে পাঠকের কথা বিবেচনায় তা প্রকাশ পেলেও কখনো হাফ ট্রুথ বা কোয়ার্টার ট্রুথ আসে। আর যদি ঘটনার কারণে ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানোর লক্ষ্য থাকে বা অন্য কোনও লাভ থাকে, সেক্ষেত্রে কখনো উল্টো বিবরণীও স্থান পায়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক পর্যন্ত তথ্যকে শাসন করে। অমুক মন্ত্রীর সঙ্গে নির্দিষ্ট পত্রিকা বা চ্যানেল বা রেডিও স্টেশনের মোটামুটি হর্তাকর্তার সুসম্পর্ক রয়েছে, ব্যস, তার ব্যাপারে নেতিবাচক খবর প্রচার-প্রকাশ হবে না। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের চাকরির ওপর আঘাত আসতে পারে।

রাজনৈতিক আদর্শ এবং সরকার-নির্ভরতার কারণেও একই ঘটনা ঘটে থাকে। রাজনৈতিক আদর্শিক কারণে প্রয়োজন ভেদে অপছন্দের দলের সংবাদ গুম, বিপরীত বা মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন, ভালো কাভারেজ না দেয়ার ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। সরকার-নির্ভরতা মানে বিজ্ঞাপনসহ নানাভাবে আর্থিক বা ক্ষমতাগত কারণে নির্ভরতা দেখা যায়। তখন মিডিয়াকে সরকারের পলিসির বাইরে তথ্য উপস্থাপন করতে দেখা যায় না বললেই চলে।

Dhaka University Institutional Repository

এই তিনটি কারণে অনেক সময়ে পত্রিকাকে স্বেচ্ছাচারি আচরণ করতে দেখা যায়। তবে হলের গণমাধ্যমের একটি দিক লক্ষ্যণীয় যে, তারা তথ্য বা প্রতিবেদন উহ্য রাখা থেকে বিরত থাকারই চেষ্টা করে। তারা চায় জনগণ জানুক। সরকারও তাই চায়। আর এই ক্ষেত্রে বানোয়াট প্রতিবেদন রচনার প্রবণতা দেখা যায়।

এর বাইরে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেও পত্রিকায় খবর প্রকাশের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন পত্রিকা তার মালিকপক্ষের ব্যবসায়ের স্বার্থে প্রতিযোগিতাশীল বা নিজের প্রডাক্টের ভোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করায়। এক্ষেত্রে একেবারেই যে বানোয়াট তথ্যের আশ্রয় নেয়া হয়, তা নয়। সত্যের কাছাকাছি পৌছে অনেকে। তবে পন্থা যেটাই অবলম্বন করুক না কেন, মানুষ কিছু তথ্য পায় তখন।

এডওয়ার্ড এস হারমেন আর নোয়াম চমস্কি এই বিষয়গুলি আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন (ফেরদৌস, ২০০৯)। তাদের মতে, গণমাধ্যম এলিটদের ভূমিকা বাস্তবায়নে কাজ করে। তারা তাদের 'ম্যানুফ্যাচারিং কনসেপ্ট : দ্য পলিটিক্যাল ইকনোমি অব দ্য ম্যাস মিডিয়া' গ্রন্থে গণমাধ্যম কিভাবে কাজ করে তা বোঝাতে 'সিস্টেম্যাটিক প্রোপাগাণ্ডা' মডেল বের করেন। এই প্রোপাগাণ্ডা মডেল দ্বারাই তারা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কেন এবং কিভাবে গণমাধ্যম মিডিয়া এলিটদের স্বার্থে কাজ করে। এক্ষেত্রে বা প্রোপাগাণ্ডা মডেলে তারা ৫টি ফিল্টার (ছাঁকনি) চিহ্নিত করেছেন যেগুলি একদিকে নিজের পক্ষে সম্মতি আদায় করে অন্যদিকে সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ট সংবাদ প্রকাশে বাধা। ওইগুলি হচ্ছে, মিডিয়ার মালিকানা, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদসূত্র, কর্পোরেট ফ্লাক প্রডিউসার ও এন্টিকমিউনিজম। অর্থ্যাৎ, মিডিয়ার মালিক যত অন্যায়ই করুন না কেন তার বিরুদ্ধে সংবাদ হবে না। তার ব্যবসা-বাণিজ্যের ঢাল ও নানা স্বার্থ হাসিল ও নিশ্চিতে ব্যবহৃত হবে তা। বিজ্ঞাপনদাতার প্রডাক্ট যত খারাপ হোক বা তার যত অন্যায়ই থাক না কেন তার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হবে না। কেননা, সে যে আয়ের সবচেয়ে উৎস। সংবাদসূত্রকে যুগ যুগ ধরে সাংবাদিককে রক্ষা করতে দেখা যায়। কর্পোরেট ফ্লাক প্রডিউসাররা সাধারণত চাপে ফেলে ও হুমকি-ধামকি দিয়ে এজেন্ডা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকে। সংবাদের যথার্থতা ও বস্তুনিষ্টতার সমালোচনায় মুখর থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদিও পঞ্চমটির কার্যকারিতা নেই, তবে এর স্থলে 'এন্টিরিলিজিয়ন'কে প্রস্তাব করা যায়। কেননা, কোনও ধর্মের সমালোচনা করা কঠিন এদেশে। আর এই ৫টির সঙ্গে আরও একটি শক্তিকে যুক্ত করা যায়। আর সেটি হলো এলিটমহল। এই মহলে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজের ব্যক্তি প্রমুখ রয়েছেন।

তবে এরপরও বলা যায়, গণমাধ্যম জনগণের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই ইতিবাচক আর নেতিবাচক- যে উদ্দেশ্যেই হোক, গণমাধ্যম গণপূজনীয়।

২. ৮ এমবেডিং জার্নালিজম

জনমত গঠনে মিডিয়ার ভূমিকা রয়েছে। ভিন্নভাবে বলা যায়, মানুষ গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর এ কারণেই হয়তো আধিপত্যবাদী, সুযোগসন্ধানী এবং দুর্জনরা গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে জনগণকে তথ্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে। ফকল্যান্ড ও ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে শুরু করে সর্বশেষ ইরাক-আফগানিস্তান আগ্রাসনে মার্কিনীদের মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ কৌশল বিষয়টি প্রমাণ করেছে। তারা আবিষ্কার করেছে

Dhaka University Institutional Repository

'এমবেডিং জার্নালিজম' নামে পোষ্য সাংবাদিকতা। এদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বানোয়াট, অর্ধেক বা ১০ ভাগ বা ৫ভাগ সত্য মানুষকে জানানো হয়েছে। বিপরীত দিকে অনেক সত্য প্রকাশ করার কারণে অতি সম্প্রতি ইরাক থেকে আল-জাজিরা টেলিভিশনের সাংবাদিকদের বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন সাংবাদিককে লালন করার ঘটনা, আবার কাউকে বহিষ্কারের ঘটনাই বা কেন? যৌক্তিক, মানবতাবাদী, সৎ, নৈতিক মানুষ এর প্রতি আগ্রাসনের বিপক্ষে। মিথ্যার ওপর ভর করে চালানো হয়েছে আগ্রাসন। তারওপর যদি একটি দেশের আপামর জনতার ওপর হানাদারদের নির্যাতন-নিধনযজ্ঞ মিডিয়ার বদৌলতে বিশ্ব নাগরিকরা জানতে পারে, তাহলে গণমত ফুঁসে উঠতে পারে। আর কোনও আনবিক বোমাও ফুঁসে ওঠা জনতাকে স্তব্ধ করার শক্তি রাখে না। তাই এই মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এসেছে।

২.৯ যেভাবে কাজ করে গণমাধ্যম

'এজেন্ডা সেটিং' গণমাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়। এটা একটি সুগঠিত দালিলিক ক্ষমতা। অনেক সময়ে গণমাধ্যম জনগণের মাঝে সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে গণমত সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এ লক্ষ্যে কোনও সংবাদ প্রকাশ-প্রচার করা না করা কিংবা একেবারেই নিরূপায় হয়ে অপেক্ষাকৃত কমগুরুত্ব দিয়ে কাভারেজ দেয়ার ঘটনা ঘটে থাকে। আবার প্রচলিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা প্রচার ও প্রকাশের পর তাতে জনগণের আগ্রহের প্রেক্ষিতে জনগণ সেটিকে ফলোআপের মাধ্যমে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যেও ভূমিকা পালন করে থাকে। গণমাধ্যমের সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারে এই যে ইস্যুভিত্তিক গুরুত্ব প্রদানের বিষয় ও অবস্থান প্রকাশ পেয়ে থাকে, এটিকেই 'গণমাধ্যমের এজেন্ডা সেটিং' বলা হয়ে থাকে।

মানুষ বিশেষ করে যারা গণমাধ্যমসেবী তারা সাধারণত এর (গণমাধ্যম) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে জনগণের কার্যপ্রণালী ও এজেন্ডার উৎপাদনে সংবাদ মাধ্যমের বিশাল প্রভাব রয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত এজেন্ডা সেটিং বিষয়ক গবেষক অস্টিনের টেক্সাস ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক মাক্সওয়েল ম্যাককোমের এব্যাপারে প্রকাশিত 'ম্যাককোম এন্ড স' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রবন্ধ চারশ'টিরও বেশি গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর 'দ্য এজেন্ডা-সেটিং রোল অব দ্য মাস মিডিয়া ইন দ্য স্যাপিং অব পাবলিক ওপিনিয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, হংকং, জার্মানীসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নির্বাচনে গণমাধ্যম ভোটারদের মাঝে প্রার্থী সম্পর্কে কি পরিমাণ সিদ্ধান্তমূলক প্রভাব বিস্তার করে, তা তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে গণমাধ্যম জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে (প্রাগুক্ত, ৮১)।

এজেন্ট সেটিংয়ের গুরুত্ব একারণে যে গণমাধ্যম কী উপস্থাপন করছে, সেটা কীভাবে করছে এবং কোন সব বিষয়ের উপস্থাপনা এড়িয়ে যাচ্ছে- জনমত গঠনে এসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, গণমাধ্যমের এজেন্ডা নির্ধারিত হয় কিসের ওপর ভিত্তি করে? এক্ষেত্রে জনগণকে জানানোর সদিচ্ছা, মুনাফা অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা মতাদর্শ অর্জন- কোনটা কাজ করে?

Dhaka University Institutional Repository

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচন প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের প্রচারণার ইস্যু ছিলো জোট সরকারের দুর্নীতি-অনিয়ম, লুটপাট আর যুদ্ধাপরাধীদের লালনের বিষয়টি। তাদের প্রচারণায় চারদলীয় জোটের পাকিস্তানপন্থী অবস্থান রয়েছে বলেও মোটা দাগে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। বিপরীত দিকে চারদলীয় জোট 'দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও' স্লোগান ধারণ করে ভোটের প্রচারাভিযান চালায়। এরমাধ্যমে মূলত মহাজোটকে ভারতপন্থী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। যদিও ভোটের ফলাফলের ব্যাপারে আপত্তি করে চারদলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, বিদেশীরাই তাদের (মহাজোট) ক্ষমতায় এনেছে। আজ পর্যন্ত এনিয়ে প্রামাণ্য কিছু অবশ্য হাজিরও হয়নি। কিন্তু ভোটের ফলাফলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে মহাজোটের স্লোগানকে জনগণ ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচনে হেরে যাওয়ার একটি সময় পার হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে চারদলীয় জোটের বিপক্ষে হাওয়া ভবন কেন্দ্রিক দুর্নীতির বিষয়টি বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। সেইসাথে যুক্ত হয়েছিলো যুদ্ধাপরাধী বা রাজাকারদেও মন্ত্রিসভায় আসীনের বিষয়টি। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দলের কেন্দ্র থেকে তৃনমূল নেতা ও কর্মীরা পর্যন্ত বিষয়টি বার বার বলেছেন। বিষয়গুলো একসময়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় মিডিয়ায়। একসময়ে তা মিডিয়ার ইস্যুতে পরিণত হয়। বিশেষ কওে রাজাকারদেও মন্ত্রিসভায় আসীনের বিষয়টিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং যুদ্ধাপরাধী ওইসব রাজাকারদের বিচার হওয়া প্রয়োজন, তা মিডিয়ার এজেন্ডায় পরিণত হয়। ২০০৭ সালে ১/১১-এর পট-পরিবর্তনের পর বিষয়টি আরও জোরালো হয়। গণমাধ্যম এটি যেভাবে প্রকাশ ও প্রচার করেছে, তাতে মনে হয়েছে ওটি গণমাধ্যমের এজেন্ডায় পরিণত হয়েছিলো।

ঠিক বিপরীত দিকে ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনেও মিডিয়ার সামনে একটি এজেন্ডা ছিলো- বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের নেতাকর্মীদের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস। দেশকে তারা যেন নরকে পরিণত করেছেন- তৎকালীন মিডিয়ার প্রচারিত ও প্রকাশিত সংবাদে এটাই প্রতিয়মান হয়েছিলো। বিষয়টি তখনও মিডিয়ার এজেন্ডা সেটিংয়ের পর্যায়ে চলে যায়। যার কারণে চারদলীয় জোটের ২১৪ আসন প্রাপ্তির মাধ্যমে নিরঙ্কুশ জয়লাভের ঘটনা ঘটে। এমনিভাবে জোট সরকারের আমলে দেশের উত্তরাঞ্চলে বাংলা ভাই ও তাঁর বাহিনীর উত্থান, জঙ্গীবাদের বিস্তার এবং তার বিরুদ্ধে গণজাগরণ একপর্যায়ে শীর্ষ জঙ্গীদের ধওে ফাঁসি মুখোমুখি করা, বর্তমান সরকারের আমলে গবাদী পশুর 'অ্যানথ্রাক্স' রোগের বিস্তার এবং এর বিরুদ্ধে জনসচেনতার বিষয়টিও মিডিয়ার এজেন্ডা সেটিংয়ের ফল বলে মনে করা যায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে মিডিয়ার এই এজেন্ডা সেটিং কিরূপে, কিভাবে হয় এবং কারা করে থাকেন। আর গণমাধ্যম এজেন্ডা সেটিংয়ে কোনধরণের কৌশলের অবলম্বন করে থাকেন?

মানুষ কেবল মিডিয়া থেকে শিক্ষাগ্রহণই করে না, তাতে প্রকাশিত বিষয় সম্পর্কে তারা ভালোভাবে বোঝারও চেষ্টা করে থাকেন। জনগণ সংবাদপত্র পাঠ করে কিংবা টেলিভিশন দেখে ও শুনে থাকে। পাশাপাশি জনগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সম্পর্কে খোঁজ রাখে। তাই এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে কোন ইস্যু এজেন্ডায় পরিণত

Dhaka University Institutional Repository

করতে অবশ্যই জনগণের রুচি, পছন্দ, যে ভাষায় কথা বলে, যা ভাবে- সে সব বিষয় গুরুত্ব দিয়ে মিডিয়াকে এজেন্ডা সেটিংয়ের কাজ করতে দেখা যায়।

সাধারণত কোন নির্দিষ্ট ইস্যুকে গণমাধ্যমের এজেন্ডা করতে হলে তা আগে সংশ্লিষ্টদের নির্ধারণ করতে হয়। যেমন চারদলীয় জোট সরকারবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আগে ইস্যু নির্দিষ্ট করতে হয়েছে। এরপর তা মিডিয়ার এজেন্ডা হয়েছে। এমনিভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আগে পরিবেশবিদ বা কর্মীরা বসে নির্ধারণ করে থাকেন। পরে তা মিডিয়ার ইস্যু হয়। সংবাদকর্মীর বিষয়টি গুরুত্বদানের বিষয়টিও এক্ষেত্রে কমগুরুত্বের নয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মিডিয়াকেই সম-সাময়িক অবস্থার বিবেচনা (যেমন অ্যানথ্রাক্স। কোন ইস্যু যখন সমাজে ব্যাপকভাবে দৃশ্যপটে আসে, তখন সেটা মিডিয়ার নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এজেন্ডাভূক্ত করতে হয়। এক্ষেত্রে রাখঢাকের ঝুঁকি সাধারণত নিতে চান না সংশ্লিষ্টরা), প্রতিযোগিতার কারণে অপরের অনুকরণ, ... ইত্যাদি নানাভাবে এজেন্ডা সেটিং হয়।

তবে অনেক ক্ষেত্রে গণমাধ্যম সম্মিলিতভাবে কোন ইস্যুকে 'কিল'ও (হত্যা বা গুরুত্বহীন) করতে পারে। এক্ষেত্রে মিডিয়ার একটি বা একাধিক অংশও যদি অর্থ্যাৎ এক বা একাধিক পত্র-পত্রিকা বা টেলিভিশন-রেডিও গুরুত্ব দেয় কিন্তু দেশের অধিকাংশ পত্রিকা ও টেলিভিশন বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন থাকে, তবে আর এজেন্ডায় পরিণত হয় না। তখন ইস্যুটি হয়ে যায় 'ডেড'। যেমন বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী খুনের ঘটনা বেড়েছে। এই বিষয়টি অধিকার নামক একটি মানবাধিকার সংগঠন প্রকাশ করে যা এক বা একাধিক পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে দেশের ভেতর হৈচৈ হয় না তেমন। তাই এখানে মিডিয়ার এজেন্ডা সেটিংয়ে মিডিয়া কর্তৃপক্ষ বা কর্তাদের সিদ্ধান্ত বা গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যায়। এই অবস্থায় এজেন্ডাকে তখন 'বর্ণনাত্মক' হিসাবেই চিহ্নিত করা যায়। একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট এজেন্ডা থাকে, যাকে বলা হয় সংবাদপত্রের পলিসি। ওই অবস্থায় এমন উপলক্ষ খুবই কম মেলে যা কোন সংবাদপত্রকে তার পূর্বপরিকল্পিত উদ্দেশ্য থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে বিচ্যুত করতে পারে। যে কারণে মিডিয়া এজেন্ডা এই মুহূর্তেও সংবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের সাংবাদিক এবং তাদের তত্ত্বাবধায়কদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনগণকে ফলাফল উপস্থাপন করে। এই ফলাফলই হলো সংবাদ কাভারেজ যাকে অন্য অর্থে এজেন্ডাও বলা যায়। কিন্তু এই অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট ইস্যুতে জনগণের তথ্যপিপাসা কিংবা সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সমাধান প্রাপ্তির যে ইচ্ছা থাকে, তা আর পূরণ হয় না। এই অবস্থায় এসেই মিডিয়াকে 'বায়াস' হতে দেখা যায়। এটা হতে পারে আদর্শিক, কর্পোরেট, ভীতি বা অন্য কোন কারণে। কিন্তু কারণ যেটাই হোক, কর্পোরেট মিডিয়ার যুগে জনগণকে নিরূপায় হয়ে ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা বা বিকল্প তৈরির বিকল্প নেই। এই বিকল্প হতে পারে বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত দু'দৈনিক *প্রথমআলো* ও *কালেরকণ্ঠ*'র মতো। একটির পেছনে আরেক লেগে থাকবে। ফলে একজনের খবরের পক্ষপাতিত্বের চিত্র ফুটে উঠবে আরেকজনের দৈনিকে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পরিবেশ ও গণমাধ্যম : তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও সম্পর্ক অন্বেষা

নীতিবিদ্যার সনাতনী অংশে কেবল মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। অর্থ্যাৎ, কেবল মানবসম্প্রদায়ই সনাতনী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। এর মানে হলো, এটা মানুষকেই কেবল নৈতিক বিবেচনার আওতাভূক্ত করে থাকে। অপরদিকে 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা' নামে বিশ শতকে প্রায়োগিক দর্শনের নতুন যে ধারার সূত্রপাত ঘটে, তা সনাতনী নীতিবিদ্যার পরিধিকে আরও বিস্তৃত করার প্রস্তাব করে। মানুষের বাইরে ভূমিসহ পারিবেশিক (environmental) ও প্রতিবেশিক বা বাস্তুবিদ্যক (ecological) বিষয়ও এর আলোচ্যভূক্ত হয়। এর প্রস্তাবক হলেন আমেরিকান দার্শনিক আলডো লিওপল্ড (Aldo Leopold, ১৮৮৭-১৯৪৭)। একাডেমিকভাবে তিনি দর্শনের মানুষ ছিলেন না, ছিলেন বন বিভাগের একজন কর্মকর্তা (খানম, রাশিদা আখতার, ২০০৯)। বনবিভাগে কাজ করার সুবাদে বননিধনসহ বাস্তুতন্ত্রের দুর্দশার চিত্র দেখে তিনি নতুন এক মূল্যবোধের প্রস্তাব করেন। তাঁর সেই প্রস্তাবনাই পরবর্তীতে পরিবেশ নীতিবিদ্যা নামে পরিচিতি পায়। লিওপল্ডের সেই প্রস্তাবনা তাঁর মৃত্যুর পর প্রবন্ধ আকারে ১৯৪৯সালে 'Land Ethics' নামে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি ভূ-নীতিবিদ্যার প্রস্তাব করেন। এর মাধ্যমে তিনিই প্রথম মানুষের বাইরে সমগ্র ভূ-সম্প্রদায়কে নৈতিক বিবেচনার আওতাভূক্ত করেন (জসীমউদ্দিন ও কালিপ্রসন্ন দাস, ২০০৬)। তবে এর মানে এই নয় যে, লিওপল্ডই সর্বপ্রথম ভূমি বা পরিবেশ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করান। তার কৃতিত্ব বরং এখানে যে, তারআগে পরিবেশকে কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখা হতো। তিনিই প্রথম পরিবেশের অবক্ষয়, অপব্যবহার ও পরিবেশের প্রতি অনাচারকে দর্শনের পরিসরে নিয়ে নীতিবিদ্যক আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। এর মাধ্যমে পরিবেশের ব্যাপারে দৃষ্টিকে তিনি নৈতিক মূল্যায়নের দিকে আকৃষ্ট করেন।

৩. ১ পরিবেশ ও পরিবেশ নীতিবিদ্যার সম্পর্ক

মানব অস্তিত্বের জন্য পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। মানুষ প্রকৃতি থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে থাকে তার প্রয়োজনে। যদিও পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তা 'অসীম' (unlimited) নয়। এ কারণে পরিবেশের নির্বিচার অপব্যবহার, অপচয় বা ধ্বংস করা হলে তা ক্ষতি ও বিপদের কারণ হতে পারে। কিন্তু শিল্পায়ন, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, নগরায়ন ও প্রযুক্তির অবাধ ও যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে একের পর এক পরিবেশ ধ্বংসই হচ্ছে। শিল্প কারখানা ও তার থেকে উৎপাদিত পণ্যের কারণে গ্রীণহাউজ গ্যাস (GHG) নির্গমন হচ্ছে। যা ওজোন স্তরের ক্ষতি করছে। পানি, মাটি, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করছে।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সুপেয় পানি যেমন কমছে, তেমনি মিঠা পানির অপ্রতুলতা ইতিমধ্যে দেখা দেওয়ায় মিঠাপানির মাছের নানা প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। ফসলে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন মাটি নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে ফসলের মাঠকেন্দ্রিক যে বিভিন্ন প্রজাতির মাছসহ জীববৈচিত্র্য দেখা যেত, তার বিলুপ্তি ঘটেছে। মাটি নষ্টের কারণে ফসল হানি হচ্ছে। এই ফসলহানির পেছনে অবশ্য জলবায়ু বা আবহাওয়া এবং পানিও রয়েছে। বায়ুদুষণ এবং গ্রীণহাউজ গ্যাসের কারণে পৃথিবীর জলবায়ু শৃঙ্খলার পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিশ্ব উষ্ণায়িত হচ্ছে। উষ্ণায়নের কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দুর্বিষহ ও মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। মানুষ ইতিমধ্যে ২০১০সালকে পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হিসেবে দেখেছে (হোসেন, আলতাব ২০১২)। উষ্ণায়নের কারণে ফসলহানি, আমিষ উৎপাদনের ওপর করাল নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একদিকে বাড়তি ঘরবাড়ির জন্য জমি কমছে, নষ্ট হচ্ছে হচ্ছে নগরায়ন। আসলে এক কথায় বলতে গেলে পরিবেশের ওপর হুমকি ও এর যথেচ্ছা ব্যবহারের কারণে সার্বিক ইকোসিস্টেমেরই ক্ষতি হচ্ছে। এর ফলে যে শুধু অমানব প্রকৃতিই বিপদে পড়ছে বা তাদের জন্য মহাবিপদ ঘণিভূত হচ্ছে তা নয়, মানব প্রকৃতিও সমানভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছে। মানব-অমানব উভয় প্রকৃতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থা। এই সমস্যা এতই প্রকট যে, কোন কোন নীতিবিদ মনে করেন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, প্রশাসক, সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এজন্য একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে দার্শনিকদেরও নীতি-নির্ধারণে ভূমিকা রয়েছে। আর এ পর্যায়েই আসে পরিবেশ সম্পর্কে দার্শনিকদের অবস্থা, অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত আলোচনার প্রেক্ষাপট। দার্শনিকরা পরিবেশ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার নৈতিকতার (ethics) কথা বলেছেন।

মূলত শিল্প বিপ্লব ও শিল্প বিস্তারের সঙ্গে পরিবেশ সমস্যাটি জড়িয়ে আছে। মধ্যযুগের শুরুর দিকে ১২৭২সালে সর্বপ্রথম পরিবেশ সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় ইংল্যান্ডে। তৎকালীন রাজা এডওয়ার্ড (১২৩৯-১৩০৭) সরকারিভাবে কয়লা জ্বালানো বন্ধ করেছিলেন (উইকিপিয়া)। অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লব[১] এই পরিবেশ দুষণকে আরও ত্বরান্বিত করে। এসময় কয়লা, জীবাশ্ম ইত্যাদি পোড়ানোর ফলে

---

[১] The Industrial Revolution was a period from 1750 to 1850 where changes in agriculture, manufacturing, mining, transportation, and technology had a profound effect on the social, economic and cultural conditions of the times. It began in the United Kingdom, then subsequently spread throughout Western Europe, North America, Japan, and eventually the rest of the world. This Revolution marks a major turning point in history; almost every aspect of daily life was influenced in some way. Most notably, average income and population began to exhibit unprecedented sustained growth. In the two centuries following 1800, the world's average per capita income increased over tenfold, while the world's population increased over sixfold. In the words of Nobel Prize winner Robert E. Lucas, Jr. (born September 15, 1937, Yakima, Washington, received the Nobel Prize in Economics in 1995) "For the first time in history, the living standards of the masses of ordinary people have begun to undergo sustained growth ... Nothing remotely like this economic behavior has happened before".

Dhaka University Institutional Repository

বায়ু দুষণ বাড়তে থাকে। কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্যসহ মনুষ্য সৃষ্ট নানা বর্জ্যাদি পরিবেশকে দারুণভাবে দুষিত করা শুরু করে। এ অবস্থায় ১৮৬৩সালে ইংল্যান্ডে প্রথম 'ব্রিটিশ অ্যালকালি অ্যাক্টস' (British Alkali Acts) পাস হয়। এটা পরিবেশের ওপর প্রথম বড়ধরণের 'পরিবেশ আইন' হিসাবে পরিচিতি পায়। ভিক্টোরিয়ান ব্রিটেনে জন রাস্কিন (John Ruskin), উইলিয়াম মরিস (William Morris) ও এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের (Edward Carpenter) মতো বুদ্ধিজীবীরা 'প্রকৃতির কাছে ফিরে চলো' (Back-to-Nature) আন্দোলন গড়ে তোলেন। যার মাধ্যমে প্রকৃতির জন্য ক্ষতিকর ভোগবাদী (consumerism) ও দুষণবিরোধী (pollution) প্রচারণা চালানো হয়। তাদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে বিশেষ করে ইংল্যান্ডেই বিভিন্ন পরিবেশবাদী ও সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশ নিয়ে সর্বপ্রথম যে আন্দোলনটির কথা জানা যায়, সেটি ঘটেছিলো ১৭৩৯সালে। এটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফিলাডেলফিয়ার রাজনীবিদ ও বুদ্ধিজীবী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০)। যদিও সেটাকে পরিবেশ সম্পর্কিত আন্দোলন বলা হয় না, কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার বাণিজ্যিক এলাকা থেকে ময়লার ভাগাড় ও ট্যানারি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনটি গড়ে উঠেছিলো। আমেরিকান সংরক্ষণবাদের জনক জন মেয়ার (John Muir, 1838 –1914) ও হেনরী ডেভিড থোরু (Henry David Thoreau, 1817–1862) একপ্রকার ব্যক্তিগতভাবেই প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা নিয়ে একধরণের আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং এ ব্যাপারে দার্শনিক অবদানও রাখেন। এর মধ্যে থোরু মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক ও মানুষের প্রকৃতির কাছাকাছি বসবাস সাধারণ জীবনযাপনকে প্রাধান্য দিতেন। এসব চিন্তা তিনি তার গ্রন্থ *Walden* (*Walden; or, Life in the Woods, 1854*) প্রকাশ করেন। আর মেয়ার প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ (inherent) অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষায় তিনি 'সিয়েরা ক্লাব'[২] (Sierra Club) নামে একটি ক্লাবও প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক এবং উত্তর আধুনিককালে পরিবেশবাদী চিন্তা-চেতনায় ম্যুরের এই inherent অধিকারে বিশ্বাস এবং সংরক্ষণবাদী নীতিকে মৌলসূর হিসাবে বিবেচনা করতে দেখা যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ ধারণা জনপ্রিয় ও স্বীকৃত বিষয় হিসাবে গড়ে উঠছে। বিশেষ করে আমেরিকায় প্রাণীসম্পদ নিয়ে এ ধরণের আন্দোলন গুরুত্ব পায়। ১৯১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন[৩] ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস[৪] (এনপিএস) প্রতিষ্ঠা করেন। জার্মানীর হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫, জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত), হারম্যান গোরিং (জার্মান সেনা কর্মকর্তা ১৮৯৩-১৯৪৬) ,

---

সূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution

[২] সিয়েরা ক্লাব হলো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রাচীন, বৃহৎ ও প্রভাবশালী তৃণমূল পরিবেশবাদী সংগঠন যা ১৮৯২সালের ২৮মে জন মেয়াদ কর্তৃক ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[৩] টমাস উড্রো উইলসন (Thomas Woodrow Wilson, 1856–1924) ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

[৪] যুক্তরাজ্যের সবধরণের জাতীয় পার্ক, স্মৃতিস্তম্ভ ও ঐতিহাসিক স্থাপনাদিও সংরক্ষণের কাজ করে The National Park Service (NPS)। এটি কেন্দ্রীয় সংস্থা যা ২৫ আগস্ট ১৯১৬সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রুডল্ফ হেসসহ (হিটলারের ডেপুটি ছিলেন, ১৮৯৪-১৯৮৭) অন্যান্য নাজিরা প্রাণীর অধিকার ও সুরক্ষার ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন। এ কারণে জার্মানিতে ১৯৩৩ সালে সরকার প্রাণী-সুরক্ষার আর ১৯৩৫সালে বন সুরক্ষার আইন পাস করে।

পরিবেশ আন্দোলনে যুগান্তকারী অধ্যায় সূচিত হয় ১৯৪৯সালে। ওই বছর যুক্তরাজ্যের চিন্তাবিদ ও বনপ্রেমি অ্যালডো লিওপল্ডের *A Sand County Almanac* শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যদিও এতে তিনি সুনির্দিষ্ট কোন দার্শনিক তত্ত্ব হাজির করেন নি। কিন্তু জীবমণ্ডলের (biosphere) সঠিকতা, স্থায়িত্ব সুরক্ষা নিশ্চিতে তার মতামত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে লিওপল্ড বলার চেষ্টা করেন যে, পরিবেশের প্রতি মানুষের নৈতিক-শ্রদ্ধা থাকা উচিত ও তাদের ধ্বংস করা অনৈতিক। লিওপল্ড তাঁর এ মতামতের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পরিবেশের দার্শনিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন; যদিও তার আগে মেয়ার ও থোরু পরিবেশ সুরক্ষাকে একাডেমিক ভিত্তি দেয়ার চেষ্টা করেন। এরপর ১৯৫০থেকে ১৯৭০সালের গোটা তিনটি দশক এবং পরবর্তীতে ভূমি সুরক্ষা ও পরিবেশবাদী সংগঠনে জনগণের অন্তর্ভূক্তি বা সচেতনতা তৈরিতে স্থিরচিত্র অনেক ভূমিকা রাখে। মেয়ার প্রতিষ্ঠিত সিয়েরা ক্লাবের সঙ্গে অন্তর্ভূক্তরাও এসময়ে বিভিন্নধরণের প্রদর্শনী নিয়ে কাজ করেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেক পরিবেশবাদী সংগঠন তৈরি হয়। আমেরিকান পরিবেশবিদ ওয়ালেস আর্লি স্টিগনারের (Wallace Earle Stegner 1909-1993) সম্পাদনায় 'দিস ইজ ডাইনোসর' নামে একটি পত্রিকা বের হয়। ওইসব সংগঠন ও পত্রিকা পরবর্তীতে আমেরিকায় পশু, বন, পানি, প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এক্ষেত্রে তারা ক্যাপশনসহ স্থিরচিত্রকে (ফটোগ্রাফ) সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। এমনি একটি সংগঠনের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (১৮০৯-১৮৬৫)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমানবিক বোমার ব্যবহার বিশ্বকে পরিবেশের সুরক্ষা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। বিপরীত দিকে এই যুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে পারমানবিক সক্ষমতা অর্জনের প্রতিযোগিতা এবং ওইসব বোমার পরীক্ষা-নীরিক্ষা বায়ুদুষণ বাড়িয়ে দেয়। এমনকি দুধের মধ্যে পারমানবিক বোমা থেকে সংক্রমিত আলামত ধরা পড়তে থাকে। এসব কারণে অনেকেই শ্বাসতন্ত্র আর ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হতে থাকে। ১৯৫২সালে এক যুক্তরাজ্যেই ৪হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে এই দু'টি রোগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়। তার প্রভাব বহুদিন থাকে। ১৯৫৬সালে জাপান সাগরের পানিতে দুষণ এবং মাছের বিলুপ্তির ঘটনা ধরা পড়ে। ১৯৬৩সালে বাতাসে পারমানবিক বোমার পরীক্ষা নিষিদ্ধ এবং এ নিয়ে একটি চুক্তিতে পৌছার চেষ্টা দেখা যায়। ১৯৬৮সালে জাপানে খাবার তেল ও ধানে রাসায়নিক দুষণ ধরা পড়ে। একই বছর সুইডেনে এসিড বৃষ্টি হয়। এসব ঘটনা পরিবেশ সাংবাদিকতার তৈরি করে। অবশ্য ১৯৫০সালের দশকে বন্যপ্রাণী এবং পার্কের ওপর রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে পরিবেশ সাংবাদিকতার শুরু। কিন্তু ১৯৬২সালে আমেরিকান মেরিন বায়োলজিস্ট র‍্যাচেল কারসনের (১৯০৭-১৯৬৪)) *Silent Spring* প্রকাশিত হওয়ার পর এব্যাপারে সাংবাদিকতার বিষয়ে জোরেসোরে চিন্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভাবনা শুরু হয়। ওই গ্রন্থে DDT[৫] বা কীটনাশক রাসায়নিক ঔষধগুলো কিভাবে খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র, প্রাণিসম্পদ বিশেষ করে পাখি ও মানুষের ক্ষতি করছে ও বিষাক্ত করে তুলছে তা তুলে ধরেন। সতর্ক করা হয় যে, এ সব রাসায়নিক বিভিন্নধরণের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। আর এর ফলে একপর্যায়ে গিয়ে স্প্রিং বা বসন্ত আর থাকবে না। বিলীন হয়ে যাবে। তাঁর ওই বই প্রকাশের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৭০সালে United States Environmental Protection Agency নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ১৯৭২ সালে কৃষিতে DDT ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। এরমধ্যে বায়ুদুষণ, পেট্রোলিয়াম থেকে দুষণসহ অন্যান্য কারণে পরিবেশ দুষণের বিষয়টিও সামনে আসে। এ কারণে প্রেসার গ্রুপ হিসাবে Greenpeace (1971), Friends of the Earth, Wyoming Outdoor Council (1967) এর মতো সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কারসনের পর স্টানফোর্ডের পরিবেশ বিজ্ঞানী পল এরলিকের (Paul Ehrlich) ১৯৬৮সালে *The Population Bomb* প্রকাশিত হয়। এতে তিনি সতর্ক করেন যে, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধিষ্ণু অবস্থা পরিবেশের জৈবিক ব্যবস্থার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে (the growth of human population threatened the viability of planetary life-support systems)। এই কথা তিনি যখন বলেছিলেন, তখন বিশ্বে জনসংখ্যা ছিলো ৩শ' কোটির কিছু বেশি।[৬] ১৯৬৮সালের বড়দিনে মহাকাশ থেকে নাসার তোলা এক চিত্রে অতিরিক্ত ব্যবহার আর দুষণের ফলে পৃথিবী ঝুঁকিপূর্ণ দশা দেখা গেছে। ১৯৭২সালে ডেনিস মিডোসের (Dennis Meodows) নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটির একটি গবেষক দল *Limits to Growth* শীর্ষক একটি স্টাডি প্রকাশ করেন। এতে বিভিন্নভাবে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ এবং বিপদাপন্নতা (vulnerability) তুলে ধরা হয়েছে যা মহাকাশ থেকে চিহ্নিত করা হয়। বিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বেই পরিবেশবাদী আন্দোলন ব্যাপক গতি পায়। ভারতে মহাত্মাগান্ধীর পৃষ্ঠপোষকতায় বননিধনের বিরুদ্ধে 'চিপকো মুভমেন্ট' হয়। গান্ধীর চিরাচরিত আন্দোলনের স্টাইল অনুসরণে তারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করেন এবং তাদের স্লোগান ছিলো 'ecology is permanent economy'। পরিবেশবাদী আন্দোলন আরও বেগবান হয় যখন ১৯৭০সালে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে 'ধরিত্রী দিবস' (Earth Day) পালিত হয়। এই দিবসটি অবশ্য এরআগের বছর ১৯৬৯সালে যুক্তরাষ্ট্রেরই প্লাস্টিক কারখানার কর্মকর্তা জন ম্যাকোনেল (John McConnell, ১৯১৫-) ইউনেস্কোর এক সভায় মাধ্যমে প্রবর্তন করেন।

আর পরিবেশের ওপর প্রথম স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি হয় সুইডেনে ১৯৭২সালের জুন ৫-১৬তারিখে। জাতিসংঘের ডাকে United Nations Conference on the Human Environment শীর্ষক ওই সম্মেলনটি 'স্টকহোম কনফারেন্স' নামেও পরিচিত। এই সম্মেলনে জাতিসংঘের পরিবেশ কার্যক্রম

---

[৫] DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) is an organochlorine insecticide which is a white crystalline solid, tasteless and almost odourless.

[৬] ১৯৬০সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৩০০ আর ১৯৭৫সালে ৪০০ কোটিতে পৌছে (হোসেন, আলতাব ২০১২)।

Dhaka University Institutional Repository

(ইউএনইপি) গঠিত হয়। এরআগে অবশ্য ১৯৬৮সালে সুইডেনে এসিড বৃষ্টি হয়। যে কারণে জাতিসংঘের সম্মেলনটি ত্বরান্বিত হয়।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এসে 'মানুষ পরিবেশ ধ্বংসের কিনারায় পৌছে গেছে' মর্মে একধরণের ধারণা প্রচার হতে থাকে। তখনই Back-to-the-land আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় পরিবেশ নীতিবিদ্যার ধারণাটি ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধীসহ একধরণের সেন্টিমেন্ট অন্যান্য রাজনৈতিক ইস্যুর সঙ্গেও যুক্ত হয়। তখন বিভিন্ন দার্শনিক ও চিন্তাবিদ পরিবেশ নীতিবিদ্যার ওপর মৌলিক গবেষণা শুরু করেন। যেমন : নরওয়ের চিন্ত াবিত আর্নি নায়েসের (Arne Næss) Deep ecology[৭] (নিবিড় বাস্তুবিদ্যা) তত্ত্বটি। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে একে একে পরিবেশের স্বার্থে Endangered Species Act (1973), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-1975), Clean Air Act (১৯৬৩সালে প্রণয়ন কিন্তু পরে সংশোধিত) এবং Clean Water Act (1972) শীর্ষক বিভিন্ন আইন ও চুক্তি প্রণয়ন ও নবায়ন হয়। ১৯৭৯সালে নাসার বিজ্ঞানী জেমস ই লাভলক (James Ephraim Lovelock, জন্ম ২৬জুলাই ১৯১৯) তাঁর Gaia: A new look at life on Earth, শীর্ষক লেখায় প্রস্তাব করেন যে, living and non-living parts of the Earth form a complex interacting system that can be thought of as a single organism। এটি Gaia hypothesis নামেও পরিচিত। পরের বছর ১৯৮০সালে নাসার আরেক বিজ্ঞানী জেমস হ্যানসেন মার্কিন কংগ্রেসকে বলেছিলেন, It is the time to stop GHG, We should say that the evidence is pretty strong that green house effect is in USA.(ফেরদৌস, রোবায়েত ও ইসলাম, রাইসুল ১৪১৬) । বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংগঠন এই পরিবেশবাদী আন্দোলন করছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড়

---

[৭] Deep ecology was coined by the Norwegian philosopher Arne Næss in 1973. It is a contemporary ecological philosophy that recognizes an inherent worth of all living beings, regardless of their instrumental utility to human needs. The philosophy emphasizes the interdependence of organisms within ecosystems and that of ecosystems with each other within the biosphere. It provides a foundation for the environmental, ecology and green movements and has f ostered a new system of environmental ethics. Deep ecology's core principle is the belief that, like humanity, the living environment as a whole has the same right to live and flourish. Deep ecology describes itself as "deep" because it persists in asking deeper questions concerning "why" and "how" and thus is concerned with the fundamental philosophical questions about the impacts of human life as one part of the ecosphere, rather than with a narrow view of ecology as a branch of biological science, and aims to avoid merely anthropocentric environmentalism, which is concerned with conservation of the environment only for exploitation by and for humans purposes, which excludes the fundamental philosophy of deep ecology. Deep ecology seeks a more holistic view of the world humans live in and seeks to apply to life the understanding that separate parts of the ecosystem (including humans) function as a whole. (সূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Ecology)

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনটি করছে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি ও বিশ্ব আবহাওয়া সংগঠনের যৌথ পরিচালনায় গঠিত ইন্টার-গভর্ণমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি, ১৯৮৮)। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের নেতৃত্বাধীন এই সংগঠনটি ইতিমধ্যে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছে। আর ১৯৮৯সালে কেমিস্ট্রিতে ডিগ্রিধারী যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার জাতিসংঘে এক বক্তৃতায় সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি বায়ুমণ্ডল কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পরিণতি হলো ভবিষ্যতে মৌলিকতর ও বহুবিস্তৃত পরিবর্তন, যা এ যাবতকালে আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। এ সময়ে তিনি এব্যাপারে বিশ্ব ঐক্যমত্যের আহ্বান জানান (হোসেন, আলভাব ২০১২)। ওই বছরেরই এক হিসেবে দেখা যায়, জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে এবং শিল্প-কারখানা থেকে কার্বন নির্গমনের পরিমাণ বছরে ৬০০ কোটি টনে পৌঁছে। ২০০৫সালের জুলাই মাসে স্কটল্যান্ডের গ্লেনেগেলস শহরে অনুষ্ঠিত জি-৮ সামিটের প্রস্তুতি সভায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সব প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, অ্যাকাডেমিশিয়ানসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্যরা এবং ভারত, চীন, ব্রাজিলের বিজ্ঞানীরা ধনীদেশগুলোর নেতাদের পরিবেশগত বিপর্যয়ের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে জরুরি আহ্বান জানান (চমস্কি, নোয়াম ২০০৯)।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১২৭২সালে যুক্তরাজ্যে বায়ু দুষণের বিরুদ্ধে যে পরিবেশ[৮] সুরক্ষার সচেতনতা শুরু হয়, বর্তমানে তা বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ ও জলবায়ু উষ্ণায়নবিরোধী তুমুল আন্দোলনে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, মানুষসহ চেতন-অচেতন সব সত্তা এক কথায় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সবকিছু ধ্বংসের পেছনে একমাত্র প্রভাবক এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ। কেননা, বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এখন সবার নিকট দিবালোকের মতো পরিষ্কার এবং পরিবর্তনের জন্য নির্দেশিত পথ অনুসরণ করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এখনই প্রত্যেক জাতির উচিত হবে সবচেয়ে কমখরচে পরিকল্পিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা কার্যকর করে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের ভেতর দিয়ে কীভাবে দ্রুত বৈশ্বিক পর্যায়ে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গতকরণ প্রক্রিয়া প্রতিরোধ করা যায় (চমস্কি, নোমান ২০০৯)। পরিবেশ এবং সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান জলবায়ুর এই হালনাগাদ অবস্থার কারণেই জাতিসংঘের উদ্যোগে আইপিসিসি গঠন ছাড়াও পরবর্তীতে ২০০৭সাল পর্যন্ত তাদের (আইপিসিসি) চার চারটি রিপোর্ট প্রকাশ পায়। এর প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় প্রতিষ্ঠার ২বছরের মধ্যে ১৯৯০সালে। এতে বলা হয়, গ্রীন হাউজ গ্যাসের কারণে গত ১০০বছরে পৃথিবীর উষ্ণতা ০.৩ থেকে ০.৬ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[৮] পরিবেশ দু'ধরণের : সামাজিক ও প্রাকৃতিক। আর উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঘিরেই দূষণের বিষয়টি ঘটে থাকে। বায়ু, বায়ুপ্রবাহ, আলো, ছায়া, অন্ধকার, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুগুলের আর্দ্রতা, পানি, শব্দ, বন, ফসল, ভূমি, পশু-প্রাণীসম্পদ, মৎসসম্পদ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। তবে আলোচনার সুবিধার্থে পরিবেশ বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক পরিবেশকে মাটি বা ভূমি, পানি, আলো, তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডল ও জৈবিক প্রকরণ (Biotic Factor) এই ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। এরমধ্যে পানি ও তাপমাত্রা প্রকরণদ্বয় মাস্টার প্রকরণ (Master Factors) বলা হয়। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন মণ্ডলে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের প্রকার ও অভিযোজন এবং তাদের বসবাস, বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সুবিধা-অসুবিধার ক্ষেত্রে এই প্রকরণদ্বয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার আলো, তাপমাত্রা ও বায়ুগুলকে একসঙ্গে জলবায়ুঘটিত উপাদান/প্রকরণ (Climate Factor) নামেও অভিহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় রিপোর্টে (১৯৯৫) জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে মানুষকে দায়ী করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ রিপোর্ট যথাক্রমে ২০০১ ও ২০০৭সালে। পরবর্তী রিপোর্ট ২০১৫ প্রকাশের কথা রয়েছে। আর এরমধ্যে ১৯৯৭সালে উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্রীণ হাউজ গ্যাস হ্রাসের ব্যাপারে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যা কিয়োটো প্রটোকল। এরপর ২০০৭সালে বালি রোডম্যাপ, ২০০৯সালে কোপেনহেগেন বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন বা কপ-১৫, পরের বছর মেক্সিকোর কানকুনে কপ-১৬ আর ২০১১ দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে কপ-১৭ অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরই (২০১১) বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০কোটিতে পৌছে। পরিবেশ হুমকির আরেক উপাদান এই জনসংখ্যা। আর সর্বশেষ গত (২০১২সালের) ২৯ জানুয়ারি আল গোরের নেতৃত্বে আইপিসিসির 'আ ভয়েজ টু বটম অব আর্থ' শীর্ষক এক সফর এন্টার্কটিকায় পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের পরিবেশমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এবং ইউএনএফসিসিসির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ক্রিস্টিনা ফিগারেসসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী, রাষ্ট্র পরিচালনায় নীতি-নির্ধারক, দাতা, বুদ্ধিজীবীসহ ১০৭জন ছিলেন ওই সফরে। সফরটি আর্জেন্টিনা থেকে শুরু হয়।

শিল্পায়নের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের বায়ু, পানি, শব্দ, বন, ফসল, ভূমি, প্রাণীজসম্পদ, মৎসসম্পদ ইত্যাদি সুরক্ষার ব্যাপারে পৃথকভাবে আন্দোলন, চুক্তি, আইন, সম্মেলন ইত্যাদি সংঘটনের পর এখন তা জলবায়ু উষ্ণায়নবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের এই একটি বিষয়ের সাথে মানবজীবনের অন্তত ১২টি খাত গভীরভাবে সম্পৃক্ত (ইসলাম, মনোয়ার ২০১২)। ওইগুলি হচ্ছে, খাদ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অবকাঠামো, শিল্প, বাণিজ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাণিসম্পদ, বনসম্পদ, দারিদ্র্য ও উদ্বাস্তু সমস্যা।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রাকৃতিক পরিবেশের এই আন্দোলনের সাথে সাথেই পরিবেশের আরেকটি দিক সম্পৃক্ত। সেটি হচ্ছে, সামাজিক পরিবেশ। নগরায়ন, শিল্পায়ন, জনসংখ্যা সমস্যা ইত্যাদি। বাংলাদেশে আরেক নির্মম বাস্তবতা হলো খাদ্যে ভেজাল সমস্যা যা অন্যতম বড় অভিশাপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুর মতোই খাদ্যে ভেজাল তৎপরতা মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর এর (মৃত্যুর) আগে তা মানুষকে নানা ক্যান্সারসহ অসুখ-বিসুখ ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে নিপতিত করায় মানুষের চিকিৎসা ব্যয়ও বাড়ছে।

পরিবেশের এমনি অবস্থায় এবং পরিবেশ সুরক্ষার প্রচেষ্টায় গত সাড়ে ৭শ' বছরের বেশি সময় ধরে যেসব আইন, চুক্তি, সম্মেলন আর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, তার সবগুলির লক্ষ্যই মানবকল্যাণ। ইতিহাসের দিনক্ষণের বিচারে সেই মধ্যযুগেই পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং তা থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। যদি আইন, চুক্তি প্রণয়ন আর সংগঠন তৈরিকে দার্শনিক বা তাত্ত্বিক উন্নয়ন ও পদক্ষেপ ধরা না হয়, তাহলে বলা যায়, পরিবেশ নিয়ে দার্শনিক আলোচনার পথ সুগম হয় পরিবেশ সমস্যাটি আনুষ্ঠানিক চিহ্নিত হওয়ার প্রায় সাড়ে ৭শ' বছর পর অর্থ্যাৎ ১৯৪৯সালে আলডো লিওপল্ডের 'ভূমি নীতিবিদ্য' শীর্ষক তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে। আর এর একাডেমিক আলোচনা শুরু হয় ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে। ১৯৬২সালে কারসনের *সাইলেন্ট স্প্রিং* প্রকাশ এবং ১৯৭০সালে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর দার্শনিকদের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে নৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোন (Philosophical Aspect) থেকে পরিবেশ সমস্যাটি দেখার অনুরোধ আসতে থাকে। সে প্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালের মার্চ ও ১৯৬৮সালের ডিসেম্বরে লিন হোয়াইটের (Lynn White's) 'The Historical Roots of our Ecologic Crisis' এবং গ্যারেট হারডিন্সের (Garrett Hardin's) The Tragedy of the Commons শীর্ষক পর্যায়ক্রমে দু'টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ দু'টিতে বিজ্ঞানের কঠোর নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। গ্যারেট হারডিন্সের Exploring New Ethics for Survival শীর্ষক পরবর্তী প্রবন্ধেও একইভাবে বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংসের পেছনে দার্শনিক সংকট কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যা ১৯৪৯সালে প্রকাশিত লিওপল্ডের প্রবন্ধেও চিহ্নিত করা হয়। এরবাইরে পরিবেশের ওপর প্রথম একাডেমিক জার্নাল উত্তর আমেরিকায় ১৯৭০ দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকের শুরুতে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সেই জার্নালের নাম *Environmental Ethics*। আর ১৯৮৩সালের কানাডিয়ান জার্নালটির নাম *The Trumpeter : Journal of Ecosophy*। যুক্তরাজ্যের প্রথম জার্নালটির নাম *Environmental Values* প্রকাশিত হয় ১৯৯২সালে। ১৯৯০সালে কলোরাডোতে ইউনিভার্সিটি অব মনাটানা ও ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসে ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবেশের একাডেমীয় স্বীকৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

এভাবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে পরিবেশ ইস্যুটি দার্শনিক ইস্যুতে পরিণত হয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি তার নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রতিদিনই নিজের সফলতার নয়া এক একটি মাইলফলক স্থাপন করছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে নৈতিকতার ন্যূনতম যোগাযোগ না থাকলে তা মানুষের জন্য ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কেবল জলবায়ু উষ্ণায়ন যেভাবে মানুষের জীবনসহ গোটা ধরণীকে বিপন্ন করে তুলেছে, তাতে এই পর্যায়ে নতুন করে নৈতিকতার গুরুত্ব সামনে চলে এসেছে। যা লিওপল্ড ১৯৪৯সালে অনুধাবন করে বলেছিলেন যে, বাস্তুতন্ত্রের অটুট থাকার সঙ্গে মানবজাতির টিকে থাকা অনেকাংশে নির্ভরশীল (খানম, রাশিদা আখতার ২০০৯) । কেননা, তিনি তার ভূমি-নীতিবিদ্যায় 'ভূমি' বলতে সার্বিকভাবে প্রজাতি, কম্যুনিটি ও ইকোসিস্টেমের নৈতিক বাধ্যবাধকতাকে বুঝিয়েছেন, সত্তা বিশেষকে নয়। বর্তমানে পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচনা আরও একটি কারণে প্রভূত গুরুত্ব বহন করে। আর সেটি হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাপক অগ্রগতি।

উন্নয়ন সবসময়ই কমবেশি পরিবেশবিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। যেমনিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্প কারখানা এবং তার উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলে সার্বিকভাবে গোটা বিশ্ব পরিবেশ আজ হুমকির কারণে। এ কারণেই পরিবেশ সংরক্ষণে যেমন রাজনৈতিক পদক্ষেপ দরকার। তেমনি দরকার সামাজিক আর দার্শনিক আন্দোলনও। ইংল্যান্ডে ১২৭২সালে রাজার ডিক্রি জারির মাধ্যমে রাজনৈতিক পদক্ষেপ দেখা যায়। ১৯৪৯সালে আলডো লিওপল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যার যুগান্তকারী দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারের আগে (পরেও) যে সব পদক্ষেপ দেখা যায়, সেগুলিকেও দার্শনিক পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। সামাজিক আন্দোলনের দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জে সম্প্রতি নতুন একটি বিমান বন্দর স্থাপন প্রশ্নে জনগণের অরাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনকে চিহ্নিত করা যায়। সুশীল সমাজ এবং এনজিও এক্ষেত্রে যে ভূমিকা রাখছে, সেটাও সামাজিক আন্দোলনভূক্ত। পৃথকভাবে গণমাধ্যম পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাবলী নিয়ে কাজ করে গণসচেতনতা তৈরির মাধ্যমে ভূমিকা রাখছে। এসবই সামাজিক আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত। তবে মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে পরিবেশের প্রতি আরও বেশি স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক করতে দার্শনিক আন্দোলনের বিকল্প নাই। গণমাধ্যম যদি নৈতিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং নৈতিক দায়বদ্ধতা গণমানুষের কাছে তুলে ধরে, সে ক্ষেত্রে পরিবেশের সুরক্ষা আরও কার্যকর হবে। কেননা, রাজনৈতিক পদক্ষেপের পরও ৭শ' বছরে পরিবেশদুষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ নির্বিঘ্ন না করতে পারার কারণে দার্শনিক আন্দোলন শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচনায় বা পরিবেশ সুরক্ষায় দার্শনিক আন্দোলনে প্রথম প্রশ্নই হলো পরিবেশের প্রতি মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত- এই ঔচিত্যের প্রশ্নের জবাব পেতে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় আরও একটি প্রশ্ন চলে আসে। আর তাহলো, যেহেতু বৃহৎ ক্ষেত্রে মানুষ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সবচেয়ে বড় ভোক্তা ও ব্যবহারকারী, তাই তাদের ব্যবহারের মাত্রা বা জীবনযাত্রা ও ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত? আর এ প্রশ্নের সঙ্গে প্রতীয়মান হয় যে, পরিবেশের সমস্যার সমাধান বা পরিবেশের ইস্যু এখন আর কেবল প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানের সমস্যা নয়। এটি বিজ্ঞানের গণ্ডি ছাড়িয়ে নৈতিকতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে এটি নীতিবিদ্যা বা পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন দার্শনিক পরিবেশ সম্পর্কে যে সব মতামত দিয়েছেন তারমধ্যে রয়েছে, মানবকেন্দ্রিক (anthropocentric) ও অ-মানবকেন্দ্রিক (non-anthropocentric) মতবাদ। এছাড়া সামস্টিক (Holistic) মতবাদ নামেও আরেকটি মতবাদ পাওয়া যায়। এসব মতামতের সঙ্গে মূল্যভিত্তিক আলোচনা স্বতঃমূল্য ও যন্ত্রতুল্য মূল্য আর পরতঃমূল্যের আলোচনা পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রাণরূপেই নিহিত রয়েছে। মানবকেন্দ্রিক, অমানবকেন্দ্রিক এবং স্বতঃমূল্য ও যন্ত্রতুল্য মূল্যকেন্দ্রিক মতামতের বিতর্ককে কেন্দ্র করে পরিবেশ দর্শন বিকাশ লাভ করতে দেখা যায়। যন্ত্রতুল্য মূল্য ও স্বতঃমূল্যের পার্থক্যে গুণগত মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আবার স্বতঃমূল্য মানবকেন্দ্রিক মতবাদকে সমর্থন করে থাকে। এই মানবকেন্দ্রিক মতবাদটা মূলত সনাতনী দার্শনিকদের মতোই। যেমন : এরিস্টটল তার *পলিটিক্স* গ্রন্থে বলেন যে, প্রকৃতির কোন সৃষ্টিই উদ্দেশ্যহীন নয়। কারণশূন্য নয়। প্রকৃতি যা কিছু তৈরি করেছে তা সে নির্দিষ্টরূপে মানুষের জন্যই করেছে (করিম, সরদার ফজলুল ২০০৬)। মধ্যযুগের বিখ্যাত দার্শনিক টমাস একুইনাসের (Thomas Aquinas) মতে, অমানব প্রাণী কেবল মানুষের ব্যবহারের নিমিত্তেই তৈরি (একুইনাস, ১৯৭৫)। ইমানুয়েল কান্ট তার '*নীতিবিদ্যা*' বিষয়ক বক্তৃতায় সুপারিশ করেছেন, একটি কুকুরের প্রতি নির্দয়তা প্রকারান্তরে তা ব্যক্তিকে অভ্যস্থ করার মাধ্যমে মানুষের প্রতি নির্দয়তায় উৎসাহিত করতে পারে। এই বিবেচনায় স্বতঃমূল্যের কারণে না হলেও যন্ত্রতুল্য মূল্যে অমানবপ্রাণীর প্রতি নির্দয়তা মন্দ। তাই এসব কথার মাধ্যমে এরিস্টটলসহ সনাতনী নীতি দার্শনিকদের মানবকেন্দ্রিক মতবাদের সমর্থক হিসেবে পাওয়া যায়। মূলত এই সনাতনী নীতিবিদ্যা পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিকাশের ক্ষেত্রে গোড়ার দিকে একটা চ্যালেঞ্জের মতো ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

আগেই বলা হয়েছে, মানবকেন্দ্রিক মতবাদকে গ্রহণ করলে দুনিয়াভরা যে অসংখ্য অমানবসত্তা বা জগৎ রয়েছে, তার সংরক্ষণ, অস্তিত্ব আর বেঁচে থাকার অধিকারকে মানুষের ওপর ন্যস্ত করা হয়। যা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিতর্ককে ঘিরেই পরিবেশ নীতিবিদ্যায় অমানবকেন্দ্রিক মতবাদ শীর্ষক যে মতবাদ গড়ে উঠেছে তা অনেকটা জনপ্রিয়তা লাভ করে। কেননা এটা মানুষের অধিকারকে খর্ব বা তুচ্ছ করে দেখে না। বরং এটা মানুষের পাশাপাশি প্রকৃতির রাজ্যের সব মানব ও অমানব সত্তার অধিকারকে সমভাবে স্বীকার করে। এই তিনটির ফাঁকে অবশ্য 'সামগ্রিক মতবাদ' (Holistic) নামে আরেকটি মতবাদ গড়ে ওঠে।

মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা কেবল মানবসম্প্রদায়কে নিয়েই আলোচনা করে থাকে। অর্থ্যাৎ, এটা সনাতনী নীতিবিদ্যার বিষয়। আর কেবল মানুষ নয়, এর বাইরে অন্য বিষয়কেও আলোচ্যভূক্ত করেছে অ-মানবকেন্দ্রিক মতবাদ। মানবকেন্দ্রিক আর অ-মানবকেন্দ্রিক মতবাদের এই চরিত্রগত দিক বিচারে এও বলা হয় যে, মানবকেন্দ্রিক মতবাদ পরিবেশকে ব্যবহার আর অ-মানবকেন্দ্রিক মতবাদ পরিবেশের নীতিবিদ্যা আলোচনা করে। এটা এজন্য যে, যেহেতু মানবকেন্দ্রিকতা মনে করে মানুষই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। এই ধরিত্রীতে কেবল মানুষের অবস্থানই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জন্যই সবকিছু। মানুষের প্রয়োজন আর স্বার্থের উচ্চতম গুরুত্ব ও মূল্য রয়েছে। সব জাগতিক বিষয়ের মধ্যে কেবল মানুষের স্বতঃমূল্য রয়েছে। পিটার সিঙ্গার বলেন যে, মানবকেন্দ্রিকতা অনুযায়ী কেবল মানুষেরই নৈতিক মূল্য রয়েছে। কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই নৈতিক মানদণ্ড আরোপযোগ্য। এই ব্যাখ্যার কারণে অ-মানবসত্তার যন্ত্রতুল্য মূল্য রয়েছে বলে ধরা হয়। কেননা, মানুষ পরিবেশ ব্যবহার করে থাকে। সে (পরিবেশ) কেবল ব্যবহৃত হবে। স্বতঃমূল্য তার নেই।

অন্যভাবে যদি বলা হয়, মানুষের বাইরে বনজ ও প্রাণীসম্পদসহ প্রকৃতির অন্যান্য বস্তুর আদি উপস্থিতি বা ভারসাম্য যেহেতু মানব অস্তিত্বের সঙ্গেই সম্পৃক্ত (খানম, রাশিদা আখতার ২০০৯); তাই এক অর্থে যাকে (মানুষ) সৃষ্টিজগতের মধ্যে সেরা উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেই সেরার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যই পরিবেশের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এখানে সংরক্ষণবাদীতা না নির্বিচারবাদীতা বা ভোগবাদীতা অনুসৃত হবে, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। লিওপল্ডসহ অন্যান্য দার্শনিকরা এক্ষেত্রে সংরক্ষণবাদীতার পক্ষে। তাদের আশংকা, নইলে এমন বিপর্যয় ঘটবে, যার হাত থেকে মুক্তি একেবারেই অসম্ভব। লিওপল্ডের ওই কথার সমর্থন মেলে আরব ও সাহারা মরুভূমিসহ উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির ইতিহাসের দিকে তাকালে। কৃষি যুগে বন-আবাদ, জলাভূমি নিষ্কাশন ও পশুচারণের ফলে সৃষ্টি ওইসব মরুভূমির সৃষ্টি বলে চিন্তাবিদরা মনে করেন। অথচ তা তখন ছিলো সুজলা, সবুজ-শ্যামল, ছিলো সেখানে মানব বসতি। কিন্তু আজ তা ধু ধু মরুভূমি। সাহারা মরুভূমির উৎপত্তির সবগুলি কারণ অজানা থাকলেও তাতে মানুষের ভূমিকা থাকা সম্ভব। অনেকগুলি সভ্যতার বিলুপ্তিও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কারণে ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করা হয় (শর্মা, দ্বিজেন ২০১২)। এই একই অবস্থা কিন্তু বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলেরও ঘটতে শুরু করেছে। যেখানে একসময় সবুজের সমারোহ ছিলো, এখন সেখানে ধু ধু বালুরাশি। সবুজের চিহ্ন নেই। ফারাক্কার প্রভাবে জীববৈচিত্র্য হারিয়ে মরুকরণ শুরু হয়েছে। পানির তীব্র সমস্যা দেখা দিয়েছে বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

বরেন্দ্র অঞ্চলে। সুপেয় পানি বা কৃষির সেচের পানির জন্য রীতিমতো হাহাকার চলছে সেখানে (আহমদ, মুসতাক ২০০৯)।

এখন প্রশ্ন হলো, মানুষ সৃষ্টির সেরা বলে বিবেচিত হয় বলে তার বাঁচার জন্য যা ইচ্ছা তাই করার নাম নৈতিকতা বা দায়িত্বশীলতা হতে পারে কি না। যে কোন ভোগের উদ্দেশ্য থাকে সুখ। মানুষ নিজের ইচ্ছামতো প্রকৃতিকে ভোগ করে সুখার্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু এমনিভাবে সবকিছু নির্বিচারে ভোগের মধ্যে সুখ নেই। বার্ট্রান্ড রাসেল তার সুখ নামক গ্রন্থে দু'ধরণের সুখের কথা বলেছেন : শারীরিক সুখ ও মানসিক সুখ। শারিরীক সুখকে তিনি আবার সহজ আর মানসিক সুখকে মস্তিষ্কজাত বলেছেন। কোন একজন ব্যক্তি গায়ের জোরে 'বাধার পাহাড়' সরালো। এরপর সেখান থেকে জলধারা বেরিয়ে এলো। একে সে নিজের সৃষ্টি বলে সুখানুভব করতে পারে। কিন্তু এটাকে রাসেল বলেছেন সহজ সুখ। তার মতে, কোমর বেঁধে জীবনের ভোজে অবতীর্ণ হলে সুখ পাওয়া যায় না। খেয়াল বা শখ থেকে যে সুখ পাওয়া যায় তা প্রাণবান সুখ নয়, তা দিয়ে জীবনের ভিত্তি তৈরি হতে পারে না। তিনি সুখলাভের জন্য প্রেমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। 'সেক্স' আর 'প্রেমের' মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি 'সুখ' আর 'ভোগের' মধ্যেও। এই উভয়ের মধ্যকার সুক্ষ্ম পার্থক্যটা বের করার নাম মানসিক সুখ (রাসেল, বার্ট্রান্ড, ১৯৮১)। উদাহরণস্বরূপ পানিকে জীবন বলা হয়। প্রকৃতিকে ফুসফুসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই অর্থে যদি গোটা পরিবেশকেই জীবন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে উপসংহার দাঁড়ায় জীবনের দ্বারাই মানুষ তার জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে, তুলছে। সেই অর্থে যা জীবনদায়ী তাই সুখদায়ী। কিন্তু সুখলাভের ইচ্ছাটা যদি অশ্লীল হয়, কুকুরের লালার মতো সেই সুখার্জনের প্রেষণাটা অনবরত নির্বিচার হয় (ঝরতে থাকে)। আর তার কুৎসিত প্রভাব পড়ে সার্বিক পরিবেশের ওপর, তা যেমন সুখ হতে পারে না। তেমনি তা কাম্য বা ঔচিত্যের প্রশ্নের বিচারে গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ডেও পড়ে না। এই অর্থে পরিবেশের ওপর অধিকার থাকলেই তার ব্যবহার আর ভোগের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নের অবতারণা ঘটে। একইঅর্থে সার্বজনীন মানবাধিকার যেমন ব্যক্তির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে, তেমনি তা একজনের কাছে আরেকজনের অধিকারকেও প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত করে। দেশের নাগরিক আর ট্যাক্সদাতা হিসাবে রাষ্ট্রীয় ও জনসম্পত্তি বা রাস্তায় ইচ্ছামতো চলাচলের অধিকার ও স্বাধীনতা বা তা ভোগ করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু আরেক ব্যক্তি বা মানুষের অধিকার নষ্ট না হয়, সেই পর্যন্ত তার ভোগের সীমা নির্ধারিত। এই অর্থেই পরিবেশের নির্বিচার ধ্বংসের পরিবর্তে বাছ-বিচারের মাধ্যমে সংরক্ষণবাদী মনোভাবের প্রয়োজনের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে। সংরক্ষণের প্রয়োজনটা এজন্য যে এই পরিবেশ আর ধরণী বর্তমান প্রজন্ম তার উত্তর প্রজন্মো কাছ থেকে ধারস্বরূপ পেয়েছে (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৭)। সেই উত্তর প্রজন্মের বাসযোগ্য করে রাখা তো দূরের কথা, ধরণীটাকে নিজের জীবদ্দশার জন্যও নির্ঝঞ্ঝাট করে রাখা জরুরি। ফিনবার্গ মনে করেন, বর্তমান প্রজন্ম ভবিষ্যত প্রজম্মের প্রতিনিধি, মুখপাত্র, তত্ত্বাবধায়ক বা বাহক। ভবিষ্যত অ-জাত (Unborn) প্রজন্ম এবং বর্তমানের পশু-প্রাণী স্বার্থরক্ষাকারী প্রকৃত মুখপাত্র হিসাবে মানুষ ধরিত্রীকে রক্ষা করবে। কেননা, বর্তমান প্রজম্মও তার পূর্বপূরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ধরণীকে পেয়েছে। তাই তাদের প্রতি কর্তব্য রয়েছে (খানম, রাশিদা আখতার ২০০৯)। জারডিন্স মনে করেন অসচেতনতা এমনকি

Dhaka University Institutional Repository

অসতর্কতার কারণেও যদি ভবিষ্যত প্রজন্মের মানবজাতি আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও ধরিত্রীকে তাদের বসবাসের জন্য দূষণমুক্ত রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে- পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু ও পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা, সহনীয় পর্যায়ের জলবায়ু, রোগ-বালাই থেকে সুরক্ষিত থাকা ইত্যাদি (খানম, রাশিদা আখতার ২০০৯)। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এসব বিষয় অক্ষুন্ন রেখেই বর্তমান প্রজন্মকে বাঁচতে হবে। কেননা, মানুষ যেহেতু এই প্রকৃতির সন্তান। জৈবিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও মানুষ প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন সত্তা। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভর না করে বাঁচতে পারে না। এমনকি এক পা'ও আগাতে পারে না (আলম, খুরশিদ ২০০১)। প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত অবলম্বন করেই তো মানুষের মানবিক জীবনপ্রবাহমানতা। তাই সেই প্রকৃতিই যদি মানুষের বাসযোগ্য না থাকে, সাময়িক আর নগদ ভোগ আর লাভের আশায় তা হুমকিগ্রস্ত হয়, প্রকারান্তরে তা মানব অস্তিত্বের জন্যই হুমকি স্বরূপ। এর নাম সুখ নয়। এজন্যই লিওপল্ড মনে করেন যে, মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে রয়েছে বন্ধন। যান্ত্রিকতার ধারণা দিয়ে তাদের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করলে এই বন্ধনকে প্রকারান্তরে উপেক্ষা করা হবে। এই প্রেক্ষাপটে এসেই লিওপল্ড 'বাস্তুবিদ্যক উপলব্ধি'র (ecological conscience) কথা বলেছেন। বাস্তুবিদ্যক উপলব্ধিকে অন্য অর্থে বাস্তুবিদ্যক নীতিবোধও (ecological moralsense) বলা হয়ে থাকে। লিওপল্ডের পথ ধরে আমেরিকান দার্শনিক হোমস রলস্টন (Holmes Rolston) যুক্তি দেন যে, প্রজাতি সুরক্ষা নৈতিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রজাপতি পর্যন্ত বিনাশ করা যাবে না। তিনি মনে করেন, প্রকৃতির ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার মূল্যে প্রজাপতিরও স্বতঃমূল্য রয়েছে। আর সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার স্টোন (Christopher Stone) তো বৃক্ষ, বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সত্তার আইনী অধিকার দেয়ার পক্ষে যাতে প্রকৃতিবাদীরা আদালতে তাদের (প্রাকৃতিক সম্পদ) অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এখানেই শেষ নয় আমেরিকার উচ্চ আদালতে বিচারপতি ডগলাস (Douglas), ব্ল্যাকমান (Blackmun) এবং ব্রেনান (Brennan) প্রাকৃতিক বস্তুর সংরক্ষণ স্বার্থ, কম্যুনিটি প্রয়োজন ও ব্যবসায়িক স্বার্থে স্টোনের প্রস্তাব গ্রহণও করেছেন (ব্রেনান ও লো ২০১১)।

আবার বিপরীত দিকে, একটি মানব শিশু যৌক্তিক স্বায়ত্বশাসিতসম্পন্ন সত্তা নয়, তাই তাকে কি নৈতিকজগত থেকে বাদ দেয়া যাবে? কিংবা মানসিকভাবে স্থায়ী বুঝ-ব্যবস্থার বাইরে চলে যাওয়া কোন মানুষ যে স্বাভাবিক মানবিক যোগাযোগে অক্ষম এবং সে কারণে যৌক্তিক স্বায়ত্বশাসিত সত্তা নয়, তাকে কি নৈতিক জগতের বাইরে রাখা যাবে? আবার যদি পশু হত্যা করা হয় বা বননিধন করা হয় সচেতন সত্তা হিসেবে মানুষের জন্যই, তা কি গ্রহণযোগ্য হবে বা যারা এখনও জন্ম নেয়নি, তাদের ভবিষ্যত নিয়ে আমাদের ভাবা অত্যাবশ্যক কিনা। এ বিষয়ে নীতি হলো অনাগত মানবসত্তা আর ভূমিষ্ট শিশু উভয়ে 'সম্ভাবনা'র (potential) গুণে গুণান্বিত। উপযোগিতা আর মানবসত্তার অস্তিত্বের প্রয়োজনের বিচারে পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদির প্রয়োজন। যদি মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখা হয়, তাহলে মানুষের স্বার্থেই এদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন। সুতরাং যুক্তি দাঁড়ায় যে, মানবসত্তা এবং অমানবসত্তা উভয়েরই স্বতঃমূল্য রয়েছে। জন ও'নীল (John O'Neill) এই মতের একজন সমর্থক।

এখন প্রশ্ন হলো, এই 'স্বতঃমূল্য'[৯] ও 'যন্ত্রতুল্য' মূল্য কি। স্বতঃমূল্যে মূল্যবান হওয়া মানে যার নিজের মূল্য রয়েছে। এই মূল্য নিজ যোগ্যতায়। অন্যের আরোপিত নয়। বিষয়ী-নিরপেক্ষ। অর্থ্যাৎ, স্বতঃমূল্য 'অন্তর্নিহিত মূল্য' আর 'বিষয়বাদ'কে ধারণ করে। জি ই ম্যুরের ভাষায় এই অন্তর্নিহিত মূল্য হলো 'অন্তর্নিহিত প্রকৃতি' (ও'নীল, ১৯৯২)। আর বিষয়বাদ হলো, যে মতবাদ অনুযায়ী মূল্য বিষয়ী বা ব্যক্তি বা মূল্যায়নকারী ছাড়াই মূল্যবান। বিপরীত দিকে বিষয়ীবাদ হলো, মূল্য মূল্যায়নকারীর ওপর নির্ভরশীল। অপরদিকে, 'যন্ত্রতূল্য মূল্য' 'অ-যন্ত্রতূল্য মূল্য'র বিপরীত। অ-যন্ত্রতূল্য মূল্য শব্দটি deep ecology (গভীর বাস্তুবিদ্যা) আন্দোলনের জনক আর্নি নায়েস (Arne Naess) স্বতঃমূল্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ মতানুযায়ী কোন একটি বস্তু স্বতঃমূল্যসম্পন্ন হবে যদি তা 'স্বগত' লক্ষ্য সম্পন্ন হয়। প্রশ্ন হলো, 'স্বগত' বা 'স্বগত লক্ষ্যসম্পন্ন' কি? নায়েসের মতে, 'স্বগত' বা end in itself হলো যা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। কোন বস্তু 'স্বগত লক্ষ্যসম্পন্ন' হবে যদি তা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য হয়। এক্ষেত্রে স্বগত গুণসম্পন্নটির মূল্যকে বলা হয় অ-যন্ত্রতূল্য মূল্য। আর যদি এর বিপরীত হয় বা যদি তা নিজের পরিবর্তে অপরের বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে মূল্যবান হয়, তাহলে তা যন্ত্রতূল্য মূল্যে মূল্যবান। তা স্বতঃমূল্যসম্পন্ন নয়। তা স্বগত লক্ষ্য সম্পন্ন নয়। এই মানদণ্ডের বিচারে অবশ্য মানুষের বাইরের বিষয়াবলীকে বা অমানবকেন্দ্রিক বিষয়ের মূল্যকে স্বীকার করা হয় না। বলা হয় যে, এগুলোর স্বতঃমূল্য নেই, তাই এগুলোর নৈতিক মূল্যও নেই।

এ অবস্থায় প্রশ্ন হলো, আসলেই কি তাই? এর জবাবের সারাংশ হলো, এটা হলে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গোটা পরিবেশ ও প্রতিবেশ ধ্বংসের যে লীলাখেলা চলছে, তা আর বন্ধ হবে না। এটা চলতেই থাকবে। সুন্দর এই ধরণী মানুষের বসবাসের অনুপযোগী করে তোলা হবে। আর বাস্তবতা হলো, দর্শন ও নীতিবিদ্যার তত্ত্বের বিতর্কে আর যা-ই দাঁড়াক না কেন, আসলে সব অ-মানব প্রাণী ও বস্তু আর না হলেও 'শুভ' ও 'মঙ্গল'র অর্থে হলেও স্বকীয় মূল্যে মূল্যবান। এই মূল্য অবশ্যই মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে উপযোগিতাসম্পন্ন। অথবা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা অথবা এক একটি পৃথক অস্তিত্বশীল সত্ত্বা হিসাবে মূল্যবান। এজন্যই বাস্ত ববাদী দার্শনিকরা তো যন্ত্রতুল্য মূল্যকে মানবকেন্দ্রিকতা আর অ-যন্ত্রতুল্য মূল্যকে অ-মানবকেন্দ্রিকতার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন (হারগ্রভ, ১৯৯৮)। জন বেয়ার্ড কালিকটও এ মতের সমর্থক। আবার এটাও ঠিক যে, প্রকৃতিতে অসংখ্য যন্ত্রতুল্য দৃষ্টান্ত রয়েছে, যারা মানুষের নয় বরং প্রকৃতির রাজ্যে পরস্পরের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অর্থ্যাৎ, যন্ত্রতুল্য মূল্য আমরা যাকে বলি তা কেবল মানবকেন্দ্রিক নয়, অমানবকেন্দ্রিকও হয়ে থাকে। যেমন সাপ অন্য প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে। এক্ষেত্রে স্বতঃমূল্য মানুষের বাইরে অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। বিষয়টি প্রকৃতির সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও আরোপ করা যায়। কক্সবাজার বা কুয়াকাটা কিংবা পার্বত্য এলাকার নয়নাভিরাম প্রকৃতির লীলাভূমি বা বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ের ওপর

[৯] দর্শনে স্বতঃমূল্য শব্দটি প্রধানত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ১. কোনও বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর মূল্যে মূল্যবান মূল্য অর্থে, ২. অযন্ত্রতূল্য মূল্য অর্থে এবং ৩. বিষয়গত মূল্য অর্থে।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সাঙ্গু নদীর যে সৌন্দর্য তা কোনও মানুষ স্বীকৃতি না দিলেও বহাল থাকবে। মানুষ বলার আগেও তা ছিলো। অর্থ্যাৎ প্রকৃতির নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য মানবকেন্দ্রিক নয়, অ-মানবকেন্দ্রিক হওয়ার পাশাপাশি তার স্বতঃমূল্য রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বতঃমূল্য ও যন্ত্রমূল্য উভয়ই মানবকেন্দ্রিক এবং অ-মানবকেন্দ্রিক হতে পারে। অর্থ্যাৎ, স্বতঃমূল্য মানবকেন্দ্রিক ও অ-মানবকেন্দ্রিক এবং যন্ত্রতুল্য মূল্যও একইভাবে মানবকেন্দ্রিক ও অ-মানবকেন্দ্রিক হতে পারে (জসীমউদ্দি ও দাস ২০০৬)। তাহলে এক্ষেত্রে চারধরণের মূল্যতত্ত্ব দাঁড়ায়।

ক. অমানবকেন্দ্রিক যন্ত্রতুল্য মূল্য।

খ. মানবকেন্দ্রিক যন্ত্রতুল্য মূল্য।

গ. অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য।

ঘ. মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য।

৩.১.১ অমানবকেন্দ্রিক যন্ত্রতুল্য মূল্যঃ

অর্থ্যাৎ অমানব প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যন্ত্রতুল্য সম্পর্কের মূল্য। হাতি ও উদ্ভিদের সঙ্গে তার খাবারের সম্পর্ক। এক্ষেত্রে হাতির খাবারটি হাতির সঙ্গে যন্ত্রতুল্য মূল্যে সম্পর্কিত। এই মূল্য নিরূপণে মানুষ দরকার নেই। এটা মানুষ-নিরপেক্ষ বা প্রকৃতিতে বিদ্যমান। এরজন্য মানুষের মূল্যায়ন বা জ্ঞানীয় সম্পর্ক নেই। কেননা মানুষ জানুক বা না জানুক হাতি ও গবাদী পশু তার খাবারের জন্য উদ্ভিদের সঙ্গে যন্ত্রতুল্য সম্পর্কে সম্পর্কিত হবেই।

৩.১.২ মানবকেন্দ্রিক যন্ত্রতুল্য মূল্যঃ

অর্থ্যাৎ মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীর যন্ত্রতুল্য মূল্যের সম্পর্ক। মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যা, তাকেই মানবকেন্দ্রিক যন্ত্রতুল্য বলে। এই মূল্য মানুষ নির্ধারণ করে। মানুষ তা আবিষ্কার করে বলেই মানবকেন্দ্রিক। তবে এই প্রশ্নে এসে ভিন্নমত পোষণ করেন হারগ্রভ। তিনি মনে করেন, এই মূল্য মানুষ নির্ধারণ বা আবিষ্কার করলেও তা আসলে প্রকৃতিতে থাকে। না থাকলে তা তো মূল্যবান হতে পারে না। ফ্লোরাইড বা আর্সেনিক মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা উপকারী উভয় হতে পারে। কিন্তু মানুষই তা বিচার-বিবেচনা করে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তার গুণাগুণ প্রকৃতিতে থাকতে হয়েছে। সুতরাং অমানবকেন্দ্রিক যন্ত্রতুল্য মূল্যের মতো মানবকেন্দ্রিক যন্ত্রতুল্যও সম্ভব এবং তা প্রকৃতিতে থাকে।

৩.১.৩ অ-মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্যঃ

অর্থ্যাৎ, মানুষসহ অমানব প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বতঃমূল্য। এই মূল্য অ-যন্ত্রতুল্য অর্থে মূল্যবান। এই মূল্যে মূল্যবান বস্তু নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। অন্য কোন সত্তার উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে নয়। তা যেমন মানুষ হতে পারে, তেমনি অমানব সত্তাও হতে পারে। অর্থ্যাৎ, এসব সত্তার নিজের উদ্দেশ্য থাকে। সেই অন্ত র্নিহিত উদ্দেশ্য পুরণে সে প্রকৃতির অন্যান্য অংশ ব্যবহার করে। বড় কথা হলো, তার নিজের স্বতঃমূল্য

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। এরজন্য তাকে কেবল মানুষের ওপরই নির্ভর করতে হয় না। মানুষের মতো প্রাণী ও উদ্ভিদ নিজেরাই নিজেদের উদ্দেশ্য হিসেবে অস্তিত্বশীল হয়। যেমন টিকটিকি। নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সে কীটপতঙ্গের ওপর নির্ভরশীল। আবার গাছপালার সালোক সংশ্লেষন পদ্ধতি বেঁচে থাকার জন্য মাটি ও সূর্যের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং মানুষ ভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর অস্তিত্ব স্বকীয় মূল্যেই মূল্যবান বা অমানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য রয়েছে এর।

৩.১.৪ মানবকেন্দ্রিক স্বতঃমূল্য ঃ

মানুষসহ অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতির অ-যন্ত্রতুল্য মূল্য যখন মানুষের দ্বারা মূল্যায়িত হয়। এই মূল্যে মূল্যবান বস্তু নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। এটাও মানুষের মূল্যায়ননির্ভর। পল ডব্লিউ টেইলর (Paul W. Taylor) অবশ্য স্বতঃমূল্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোন সত্তার স্বতঃমূল্য থাকার অর্থ হলো সেই সত্তা কোন নির্দিষ্ট উপায়ে কোনও মূল্যায়নকারীর দ্বারা মূল্যায়িত। এই সত্তা, একজন ব্যক্তি, প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়বস্তু, একটি স্থান, এমনকি সামাজিক রীতি ও অনুষ্ঠানও হতে পারে। এরকম বিষয় বা বস্তু যখন স্বতঃমূল্যে মূল্যবান হয়, তখন তা কিছু মানুষ লালন করবে, এর সৌন্দর্য ও আনন্দকে ধারণ করবে, ভালবাসবে, একে মূল্য দেবে, অথবা সেই সত্তাটির নিজের মধ্যে যা আছে, তারজন্যই একে প্রশংসা করবে বা এর অস্তিত্বের ওপর স্বতঃমূল্য আরোপ করবে। স্বতঃমূল্যে মূল্যবান জিনিসকে বিনষ্ট বা ধ্বংস করা যাবে না। বরং সংরক্ষণ ও লালন করতে হবে। অমানব প্রকৃতির ওপরও এই মূল্য প্রযোজ্য।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, মানবকেন্দ্রিকতা প্রত্যয়টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে স্বতঃমূল্য কথাটিও। মানবকেন্দ্রিকতা যেমনি কেবলমাত্র যান্ত্রিক মূল্যের তেমনি অমানবকেন্দ্রিকতা কেবলমাত্র স্বতঃমূল্যের সমার্থক নয়। কেউ যদি কেবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদী অবস্থান নেন, তাহলে তিনি পরিবেশের স্বতঃমূল্য স্বীকার করা থেকে বঞ্চিত হবেন। আবার পরিবেশের স্বতঃমূল্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কেবল অমানবকেন্দ্রিক মতবাদের- এরকম সনদ দেয়াও ঠিক নয়। অন্যদিকে আলোচনাকে 'স্বতঃমূল্য'র মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা হলেও বলা যায়, মানবকেন্দ্রিক মতবাদের অনুসারী হয়েও অমানবসত্তাগুলোকে স্বতঃমূল্যের অধিকারী, তা স্বীকারে বাধা নাই। প্রকৃতি যে মূল্য ধারণ করে তা যথার্থ ও সত্য। প্রকৃতির এ মূল্যই মানুষের কল্যাণ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ কারণেই রলস্টন প্রকৃতির চৌদ্দটি মূল্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এগুলো হলো : জীবন সহায়ক মূল্য, অর্থনৈতিক মূল্য, বিনোদনমূলক মূল্য, নান্দনিক মূল্য, বহুমাতৃক প্রজনন সম্পর্কিত মূল্য, ঐতিহাসিক মূল্য, চরিত্র গঠনকারী মূল্য, বৈজ্ঞানিক মূল্য, সাংস্কৃতিক প্রতীকী মূল্য, জীবনের মূল্য, ধর্মীয় মূল্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে মূল্য, স্থায়িত্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত মূল্য, দ্বান্দ্বিক মূল্য (খালেক, আবদুল ২০০৩)।

মানবকেন্দ্রিক ও অমানবকেন্দ্রিক মতবাদের বিতর্কের রেশ ধরেই দর্শনের ইতিহাসে Prudential Anthropocentrism ও Cynical Anthropocentrism শীর্ষক দু'টি মতবাদও দেখা যায়। এসব মতবাদ বলে যে, অমানবকেন্দ্রিক হওয়ার জন্য আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক উচ্চতর

Dhaka University Institutional Repository

মানবকেন্দ্রিক যুক্তি খুঁজে পাই। অমানব পরিবেশের স্বতঃমূল্য রয়েছে ধরে নিয়েই এ কথা বলা হয়। কিন্তু এখানেও দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কেননা, Prudential Anthropocentrism পরিবেশের প্রতি যে কর্তবের কথা বলে তা আবার মানবসত্তার কর্তব্যবোধ থেকে উদ্ভূত। আর Cynical Anthropocentrism দৈনন্দিন জীবনে অমানবকেন্দ্রিক হওয়ার পেছনে 'উচ্চধরণের মানবকেন্দ্রিক কারণ'কে চিহ্নিত করেছে।

আবার পরিবেশ নীতিবিদ্যার সামগ্রিক (Holistic) মতবাদটি অনেকটা অমানবকেন্দ্রিক মতবাদের সঙ্গেই সাজুয্যপূর্ণ। এই উভয় মতবাদই মানুষসহ গোটা প্রকৃতির সমানমূল্যকে স্বীকার করে। এ মতবাদ মনে করে, মানুষের মতো প্রকৃতির বা পরিবেশের সব সত্তার সমান মর্যাদা রয়েছে। এই মতবাদের মূলকথা হলো, বাস্তুতন্ত্র হলো একটি যৌক্তিক বা পদ্ধতিগত এককে। মানুষ সেই এককের একটি অংশ মাত্র (The ecosystem is a systemic whole, of which human beings are a part)। এ কথার সমর্থন মেলে নাসার বিজ্ঞানী জেমস ই লাভলকের বিখ্যাত গায়া হাইপথেসিসে (Gaia hypothesis)। তাঁর Gaia: A new look at life on Earth (১৯৭৯) শীর্ষক লেখায় বলা হয়, একটি জটিল পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতির দৃষ্টিকোন থেকে ধরণীর সজীব ও নির্জীব অংশকে একটি স্বতন্ত্র একক হিসাবে চিন্তা করা যায় (living and non-living parts of the Earth form a complex interacting system that can be thought of as a single organism)। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেক নেতা মিখাইল গর্ভাচেভের এব্যাপারে একটি বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, মানবতা জীবমণ্ডলের একটি অংশ এবং ... জীবমণ্ডল হলো একটি সমন্বিত সমষ্টি (Humanity is part of the biosphere, and ... the biosphere is an integrated whole.)।[১০] ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, রিভারসাইডের ড. আর্নেস্ট পার্টরিজ (Ernest Partridge) লিওপল্ডকে উদ্বৃত করে এই একই কথা বলেছেন (The whole informs the parts: 'the ecosystem, and mankind's place and responsibility within, is best understood' contextually, from the perspective of the whole.)।[১১] উল্লেখিত চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যেও সমগ্রবাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই সামগ্রিক মতবাদের প্রধান উদ্যোক্তা লিওপল্ডই।

অমানবকেন্দ্রিক আর সমগ্রবাদের মধ্যে মূল পার্থক্যটা হলো উপলব্ধিগত। মানবকেন্দ্রিক মতবাদ মানুষকে প্রাধান্য দেয়। অমানবকেন্দ্রিকতা মানবসহ গোটা সৃষ্টিজগতকে প্রাধান্য দিলেও এটা মূলত মানবকেন্দ্রিকতার প্রতিবাদস্বরূপই গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু সমগ্রবাদ কারও প্রতিবাদে নয়, বাস্তবতার নিরিখে চিন্তাবিদরা এর অবতারণা করেছেন। তাই এই মতবাদ অনেকটা গণতান্ত্রিক এবং গ্রহণযোগ্য ধরা যায়। এই মতবাদের

---

[১০] At the January, 1990, Moscow Forum on the Global Environment. (In transliteration: "Chelovesevo yavlyayetsya chast'yoo biosphyeri, a ..biosphyera eta yedinoye tseloye.")

[11] http://gadflv.igc.org/papers/leopold.htm

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম সমর্থক জেমস পি স্টারবা (James P Sterba)। তিনি পরিবেশকে মানবকেন্দ্রিক বা অমানবকেন্দ্রিক- এই দু'টির কোনও দৃষ্টিতে না দেখে সমগ্র বা সম্পূর্ণ অর্থে দেখার প্রস্তাব করেন। এ মতানুযায়ী একটি সমগ্রের সবকিছু যেমন মূল্যবান, আবার আলাদাভাবেও তার প্রত্যেক অংশ মূল্যবান। প্রত্যেকে মূলবান মানে এই নয় যে, একটি অন্যটির বা অন্যগুলির চেয়ে বেশি মূল্যবান। আলাদাভাবে কোনও একটি (a single unit of whole) কম বা বেশি মূল্য ধারণ করে না। আবার মূল্যহীনও হয় না। এই মতবাদের আকর্ষণীয় দিক হলো, এটা (তার সমগ্রের অঙ্গীভূত) প্রত্যেক উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বীকার করে। এই প্রশ্নে এসে বলা হয় যে, মানুষ যেমন আলাদাভাবে বেশি মূল্যবান নয়, তেমনি মানুষ পরিবেশের বাকি উপাদানকে যান্ত্রিকতুল্য (instrument) করতে পারবে না। মানুষের আর সমগ্রের (বাস্তুতন্ত্র) অন্যদের পার্থক্য হলো, মানুষের নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি, নীতিবোধ, চিন্তাশক্তি, ভালো-মন্দ নির্ণয় ইত্যাদি গুণাবলী রয়েছে। আর এজন্যই তার দায়িত্ব বেশি। তাকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হওয়ার দায় রয়েছে। তাই বলে এই নয় যে, প্রকৃতিরাজ্যকে মূল্যবান হিসাবে মর্যাদা দিয়ে বা নিজে (মানুষ) ছাড়া অন্য উপাদানকে স্বতঃমূল্যের মর্যাদা দিয়ে না খেয়ে মরবে মানুষ। এ ক্ষেত্রে চরমপন্থা অবলম্বন করা যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান 'চরমপন্থা'র দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন, কোনও একজন লোক অফিসে যাওয়ার পথে দেখতে পেলো সাঁতার না জানা একটি শিশু পুকুরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এখন যদি সে কাপড় ভিজে যাওয়া বা অফিসে যেতে বিলম্বের কারণ দেখিয়ে শিশুটির জীবন রক্ষা না করে চলে যায়, সেটা চরমপন্থা। একইভাবে দায়িত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিটি সাঁতার না জানা সত্ত্বেও যদি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেও বিপন্ন হয়, সেটাও চরমপন্থা। এই দু'টির মাঝামাঝি অবস্থানের নামকে প্লেটো বলেছেন 'মধ্যপন্থা' (Golden Mean)। এখানে পরিপ্রেক্ষিত (Contextually) অনুযায়ী কাজ করতে হবে।[১২] সামগ্রিকবাদও পরিপ্রেক্ষিতবাদকে সমর্থন করে। অর্থাৎ, পরিবেশকে মূল্য দিতে গিয়ে মানুষ না খেয়ে মরবে না, আবার ধ্বংসও করবে না। এ ক্ষেত্রে মানুষের নীতি হবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান অন্য বস্তু যেমন নিজের প্রয়োজন মেটায় তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণী বা উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে। মানুষও তাই করবে। সীমারেখাটি হলো, অপচয় করা যাবে না। নির্বিচারবাদী হওয়া যাবে না। মানুষ শুধু তার মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারবে পরিবেশ থেকে। কিন্তু ভোগবাদীতার নিদর্শন নারীদের কসমেটিক্সের জন্য খরগোশের রক্ত ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয়। এটা যে কেবল মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষেত্রে ঘটে, তা নয়। মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটে। মধ্যপ্রাচ্যে মানুষের বিনোদনের জন্য মানুষকেই বা শিশুদের উটের পীঠে বসিয়ে জকি বানানো হয়। এক্ষেত্রে পাষণ্ডতা ও নির্মমতা হলো, ততক্ষণ পর্যন্ত উট দৌড়াবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার জকি ভয়ে চিৎকার করবে বা বেহুশ না হওয়া পর্যন্ত উটের দৌড় চলে। এই যে নির্মমতা এটা কেবল মানুষ নয়, পরিবেশের অন্য কোনও উপাদানের প্রতি না করার কথাই বলে সমগ্রবাদ।

---

[১২] বর্তমান গবেষণার জন্য নেয়া বিশেষজ্ঞ সাক্ষাতকারে তিনি এ কথা বলেন। বিশেষজ্ঞ সাক্ষাতকার ও এব্যাপারে অন্যান্য বক্তব্য প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বিশেষজ্ঞ সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত, এখানেই স্টারবার মতামতটা অনেকটা ডারউইনের প্রজাতিবাদকে সমর্থন করে। প্রজাতিবাদে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী থাকে। তবে প্রজাতিবাদ শেষ অর্থে মানবকেন্দ্রিকার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু স্টারবার প্রজাতিবাদটা হলো মানুষ ও প্রজাতিসমুহের মধ্যে সমন্বয়। প্রজাতিসমুহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা আছে। এটা বিশেষ করে খাদ্য পিরামিডের কারণে। মানুষ প্রজাতির সঙ্গে অভিযোজন করবে। মানুষও একই খাদ্য পিরামিডের অন্তর্ভূক্ত। খাদ্য পিরামিডের আধার হলো বাস্তুতন্ত্র। আর খাদ্য পিরামিডের মূলে রয়েছে মাটি। এরপর আসে পানি, বায়ু, তাপমাত্রা বা জলবায়ু, জীববৈচিত্র্যসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান। খাদ্য পিরামিড ও বাস্তুতন্ত্রের কোনও একটি উপাদান নষ্ট হয়ে গেলে গোটা পিরামিড ও বাস্তুতন্ত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে। এর প্রভাব পড়বে মানবসহ সমগ্র প্রকৃতিজগতে। তখনই প্রশ্ন আসে প্রজাতিলুপ্তির। এই অবস্থায় ডারউইন বলবেন, প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection), যোগ্যতমের টিকে থাকা (Survival of the Fitest) এবং অভিযোজন (Adaptability)- এই তিনটি প্রক্রিয়ায় টিকে থাকতে হয় প্রজাতিকে। বৃহত্তর সমাজ আর বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের প্রজাতিসত্তা হিসাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে যদি মানুষের ওপর কোনও দুর্যোগ আসে, সে ক্ষেত্রেও কি ডারউইনের ওই তিনটি প্রক্রিয়া মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। বর্তমানে পরিবেশ আগ্রাসন আর ভবিষ্যতের অনির্দিষ্টক্ষণের দিকে তাকিয়ে যদি বলি, যদি প্রকৃতি জগতের প্রজাতিসমুহের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত যে সংগ্রাম করতে হয়, আর পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে সেই লড়াইয়ে মানুষকেও আবির্ভূত হয়- তাহলে এটা মনে করার কোনও সুযোগ নেই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর ঝড়ের গতি থামিয়ে দেয়ার শক্তিসম্পন্ন উন্নত জাতি টিকে থাকবে আর আমাদের মতো প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা জাতিগুলো সমুদ্রের পানিতে হাবুডুবু খাবে। কেননা, ইতিহাসে প্রকাণ্ড প্রাণী ডাইনোসরেরই অবলুপ্তি ঘটেছে। অতিশয় 'হস্তি' বিলুপ্ত হয় কিন্তু তেলাপোকা টিকে থাকে।

আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন প্রশ্ন হলো, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সুরক্ষা বলতে তাহলে কি বোঝায়? আর সুরক্ষার কারণে তার ব্যবহার যদি করা না হয়, তাহলে মানব সমাজ কিভাবে চলবে আর পরিবেশের উপাদানগুলির বৃদ্ধি ও সংখ্যা কোথায় গিয়ে ঠেকবে? আসলে এক্ষেত্রে নীতিটি কি হবে? এর উত্তরে বলা যায়, মানব অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনে এবং যদি তা মানুষকে আক্রান্ত না করে ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট না করে তাহলে বন ধ্বংস বা প্রাণী হত্যা অনৈতিক হবে না (মিত্র, মাধবেন্দ্র নাথ ১৯৯৮) (there is nothing morally wrong in killing any animal or destroying a forest unless it affects the ecological balance which is necessary for human survival.)। পরিবেশের উপাদান বলে বিবেচিত জগতের অন্যান্য বস্তু ও বিষয়ের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

৩.২ পরিবেশ ও গণমাধ্যমের পারস্পরিক সম্পর্ক

দার্শনিক জারডিন্স মনে করেন যে, বিজ্ঞান যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে দর্শনের সফল হবার খুব একটা যুক্তি নেই। আর বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানম মনে করেন, পরিবেশ দূষণ বর্তমান সময়কার বিশ্বব্যাপী আলোচিত বিষয় হলেও এটি কেবল নৈতিক সমস্যা নয় (খানম, রাশিদা

Dhaka University Institutional Repository

আখতার, ২০০৯)। এসব মতামতের যৌক্তিক পরিণতি আর যা-ই হোক, পরিবেশ যে স্বীয় স্বাভাবিক বা বাস্তুতন্ত্রের জন্য সহনীয়- এমন পর্যায়ে নেই, এ কথারই প্রমাণ দেয়। পাশাপাশি এটাও প্রমাণ করে যে, যদি ইস্যুটি কেবল নৈতিক সমস্যা না হয়, তাহলে এটি মানব সমাজের অন্যান্য উপাদান যেমন, রাজনীতি, গণমাধ্যম, সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদির সমস্যা বলেও বিবেচিত হতে পারে। মানুষের অস্তিত্বের জন্য হলেও যে 'পরিবেশ সুরক্ষা' অত্যাবশ্যক তা উপরের আলোচনাতে প্রতিষ্ঠিত। কেননা, পরিবেশের অবক্ষয় আর অপচয় ও অপব্যবহার বলে যে কিছু ঘটছে, তাতে আর কারও দ্বিমত নাই। বিজ্ঞানের জ্ঞান যেখানে নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধের মিশ্রণ ছাড়া নিঃশঙ্ক নয়, সেখানে নির্দিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ বা নৈতিক জ্ঞানটিও সংশ্লিষ্ট মহল আর ভূখণ্ডে ব্যাপকভাবে প্রচার আর প্রকাশের অভাবে তা নৈতিক নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব নয়। পরিবেশের ব্যাপারে অনুসরণীয় নৈতিক নীতি বা মূল্যবোধটি গণমাধ্যমের দ্বারা বৃহত্তর গণসমাজে প্রচার-প্রকাশ পাওয়া জরুরি। অর্থ্যাৎ পরিবেশ সমস্যাটির ব্যাপারে গণসচেতনতা তৈরির মাধ্যমে পরিবেশের প্রতি মানুষের আগ্রহ আর ভালোবাসা তৈরি করে এব্যাপারে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া সম্ভব। এই প্রত্যাশা থেকেই অবশ্য চলে আসে পরিবেশ সমস্যা, পরিবেশের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে মানবসমাজের দিকে ধেয়ে আসা সম্ভাব্য বিপর্যয় আর ধ্বংসের চিত্র প্রচার ও প্রকাশের প্রসঙ্গ। কেননা এর দ্বারা পরিবেশের প্রতি মানুষকে অনুরক্ত করার মাধ্যমে সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব। যা হাসিল করতে হবে গণমাধ্যমের ভিতর দিয়ে। এভাবেই পরিবেশ আর গণমাধ্যমের প্রসঙ্গ ও সম্পর্ক চলে আসে। কেননা, গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, গণমাধ্যমে প্রচার আর প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ইস্যু সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি সম্ভব। মানুষ গণমাধ্যম দ্বারা প্রভাবিত হয়। গণমাধ্যম যেভাবে কোন ইস্যুকে দেখে, দর্শক-শ্রোতা-পাঠক সেভাবেই তা দেখে থাকে (সেভারিন ও টাঙ্কার্ড, ১৯৮৮)। গণমাধ্যম সমাজ পরিবর্তনের শক্তিশালী এজেন্ট বা প্রভাবক (শ্রাম, ১৯৬৪)। যুগে যুগে একারণেই মানুষ গণমাধ্যমের স্মরণাপন্ন হয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গণাধ্যমকে দেশ গঠনেরই দায়িত্বই দিয়ে দেন। তিনি জাতীয় পরিকল্পনাগুলির ব্যাপারে সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ সৃষ্টির কাজটি দেন। এছাড়াও তিনি বলেন, 'জাতীয় জীবনে সম্প্রসারণশীল অশ্লীলতা পরিহারে সাহায্য করে সংবাদপত্রকে শুধু একটা উন্নত ও উজ্জ্বলতর সমাজ সচেতনতায় গড়ে তুললেই চলবে না, তাকে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকনা, বিন্দু বিন্দু জল সম নিছক ছোটখাটো বিষয়েও একটা সামাজিক আচরণের আদর্শ গড়ে তুলতে হবে (উলসলে, ১৯৮৯)।' সমাজ ও জাতীয় জীবনে অবদানের কারণে গণমাধ্যম সম্পর্কে এ অবধারণ স্থির করা হয় যে, গণমাধ্যম বিহীন আজকের সমাজ জীবন তো কল্পনা করা যায় না (ফ্লার ও বল-রোকেশ, ১৯৯৩)। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে আছে এই গণমাধ্যম। সামাজিক বাস্তবতার পুনর্নির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। গামসি মনে করেন, গণমাধ্যম আমাদের শিক্ষাদানের ভূমিকা পালন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সংঘটিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকালে অন্তত তাই প্রমাণিত হয় (চন্দ্র ও অন্যান্য, ১৯৯৪)। আর ম্যাকম্ব মনে করেন, গণমাধ্যম আমাদের আলোচ্যসূচী বা এজেন্ডা নির্ধারণ করে দিচ্ছে। গণমাধ্যম থেকেই আমরা তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত ভয়াবহতার কথা জানতে

Dhaka University Institutional Repository

পাই। গণমাধ্যমই তন্নাবহতা যাচাই করে (ম্যাকম্ব ও শাউ ১৯৯৩)। বিবৃতি দেয়া, লবি করা, প্রভাবিত করা, গ্রুপ তৈরি করা সবই করছে গণমাধ্যম। নেতিবাচক অর্থে বললেও প্রকারান্তরে গণমাধ্যমের জনসম্পৃক্ততার শক্তি তুলে ধরেছেন বয়কফ (Boycoff)। তাঁর মতে, গণমাধ্যমের দায়িত্বই হলো কোন কিছু সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা এবং প্রয়োজনীয় বিতর্ক সৃষ্টি করা। আর লুহম্যান সমাজের কয়েকটি উপাদান যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, গণমাধ্যম, আইন, কৃষ্টি-কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রত্যেক উপাদানের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় রাখে গণমাধ্যম ও যোগাযোগ। বিজ্ঞান যেমন সত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায়, তেমনি মিডিয়া তথ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায়। গণমাধ্যম প্রদত্ত তথ্য আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, অনিশ্চয়তা দূর করে। একারণেই হয়তো উইলবার এল শ্র্যাম ও ল্যাসওয়েল মনে করেন, গণমাধ্যমের কাজ হলো পরিবেশ পাহারাদান ও সমাজের বিভিন্ন অংশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং মূল্যবোধ তথা ঐতিহ্যের প্রবাহ ধরে রাখা। তাঁরা আরও বলেন, সামাজিকীকরণমূলক কাজে গণমাধ্যম হাতিয়ার হিসেবে সমাজের বিদ্যমান পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধওে (ডোমিনিক, ১৯৯০)।

গণমাধ্যমের সচেতনতা তৈরির লক্ষ্য থাকে বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণ আর সর্বোচ্চ ভালোত্ব আদায়। আর নৈতিকতা বা নীতিবিদ্যা বা নৈতিক মূল্যবোধের লক্ষ্যও তাই। নৈতিকতা যেমন এর কাজের উপাদান হিসেবে সত্য, বস্তুনিষ্ঠতা আর ভালোত্বকে হাতিয়ার করে, গণমাধ্যমের উপাদানও তাই। নৈতিকতা যেমন কর্তব্যবোধকে তীক্ষ্ণ করে, তেমনি গণমাধ্যমও। গণমাধ্যমের কাজ এবং দায়িত্ব হলো জনগণকে সত্য-সঠিক তথ্যটি অবহিত করানো যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় কর্তব্যবোধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়।

প্রশ্ন হতে পারে, কর্তব্যবোধের সেই প্রশ্নটি কি? সেই প্রশ্নটি হলো- মানবজাতিকে সুস্থ আর স্বাভাবিকভাবে এই ধরণীতে বসবাসের ক্ষেত্র তৈরীর প্রশ্ন। কিন্তু এটার জন্য অত্যাবশ্যক হলো পরিবেশ বা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান বা বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা, যা বাস্তুতন্ত্রের প্রতি প্রধান ভোক্তা হিসাবে মানুষের সদয় ও যত্নশীল হওয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু ভোগবাদী মানুষ বা বিশ্বায়নের প্রভাবে বিচ্ছিন্নতাচ্ছন্ন অথবা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অর্থের নেশায় মোহান্ধ মানুষের বিবেককে জাগ্রত করা না গেলে তা কতটা সম্ভব? এই পর্যায়ে এসেই পরিবেশের ব্যাপারে নীতিবিদ্যা আর গণমাধ্যমের একই কক্ষপথে অবস্থান করে সমন্বিতভাবে কাজ করার সুযোগ অনুভূত হচ্ছে। গণমাধ্যম তার বলিষ্ঠ, অগ্নিঝরা, প্রামাণ্য, তাত্ত্বিক, হিসাবী (Calculative), মোহনীয়, আকর্ষণীয় আর প্রেমের ভাষায় সাধারণ মানুষকে উচিত-অনুচিত এবং দায়িত্বশীলতা আর কর্তব্যের বাণী জানাবে-শোনাবে। তথ্য জানিয়ে প্রকারান্তরে তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণমানুষ প্রেমিকের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধাশীল কিংবা বিনয়ী হবে প্রেমিকারূপি পরিবেশের প্রতি।

মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি জীবন রয়েছে। একারণে বিভিন্ন সমস্যা আর ইস্যুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রবণতা রয়েছে মানুষের মাঝে। এসবের মধ্যে পরিবেশকে মানুষ সাধারণত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে। এরবাইরে খণ্ডিতভাবে বিনোদন হিসেবেও নেয়া হয়। লিওপল্ড পরিবেশকে বিজ্ঞানের বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে না দেখে নৈতিক দৃষ্টিতে দেখার

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। আর আমি মনে করি, ভৌগোলিক বিবেচনায় এটা যদিও আন্তর্জাতিক ইস্যু, কিন্তু গণমাধ্যম একে 'জাতীয়' গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে নিতে পারে। কেননা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তা থেকেই সামস্টিক আন্তর্জাতিকতার উদয়। নৈতিকতা ও নীতিবিদ্যা মানুষের জন্য। যা প্রকৃতি, নৈতিকতা আর সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়, তাকে সেভাবে সাধারণ প্রত্যয় দিয়েই মোকাবেলা করতে হবে। যদি পরিবেশ ইস্যুটি 'জাতীয়' হিসেবে বিবেচনায় গুরুত্ব পায়, তাহলে তা মানুষের ইস্যু হিসেবেই গুরুত্ব পেলো। যার সঙ্গে মানুষেয় অস্তিত্ব ও বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত, তাকে কেবল নৈতিক দিকই নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নান্দনিক, বিজ্ঞান ইত্যাদি সব দিক থেকেই একীভূত করতে হবে। আর এভাবেই পরিবেশ ইস্যুটি পুরো জাতীয় ইস্যু হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়পর্যায়ে যেমন : সর্বোচ্চ আদালত থেকে সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) লবিং, ক্যাম্পেইন, রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও জাতিসংঘের অধিবেশনে স্থান পাবে। এক্ষেত্রে তখন বিষয়টি সার্বিকভাবে গণমাধ্যমের প্রচার আর প্রচারণার এজেন্ডায় স্থান করে নেবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো রাজনৈতিকভাবে অস্থির ও মতদ্বৈততার ক্ষেত্রে তা অত্যাবশ্যক। কেননা, যা 'জাতীয়' ইস্যু, তা দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে একটি 'বিতর্কহীন-সাধারণ স্বার্থ' (Common interest without controversy) হিসেবে পরিগণিত হবে। আর তখনই তা (পরিবেশ সমস্যা) নৈতিকতা আর গণমাধ্যমের বিষয় হিসেবে জাতীয় ও রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে আবির্ভূত হবে। এতে রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের সৃষ্টি হতে পারে। কেননা আমাদের বাংলাদেশের প্রধান দু'রাজনৈতিক জোটের যে হারে দ্বিমুখি প্রবাহমানতা রয়েছে, তার কারণেই এটা জরুরি। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরস্পরের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতে। যদিও নৈতিকতা আর কর্তব্যের প্রশ্নে এমনটি হওয়ার কথা নয়, যেমনিভাবে জাতীয় জীবনে মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও কর্মসূচি নিয়ে অন্তত বিরোধিতা দেখা যায় না (যেমনি মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা নিয়ে দেখা যায়), ক্রিকেটে বাংলাদেশ দল কোনও ক্রিকেট-পরাশক্তিকে হারালে একইসঙ্গে সেলিব্রেট করা হয়; তেমনি এই (পরিবেশ পরিবর্তন ও দূষণ) ইস্যুতেও রাজনৈতিক মতৈক্য জরুরী। আর তখনই সেটা হবে নৈতিক। এই মতৈক্য তৈরিতে অন্যান্য রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনে গণমাধ্যম যেমন মধ্যস্থতা ও প্রেসার গ্রুপের ভূমিকায় থাকে, এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে তেমনি ভূমিকা পালন করতে পারে।

যেহেতু পরিবেশ দুষণ আর জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সর্বগ্রাসী অভিশাপটি আজ আর ইউনিয়ন, থানা, জেলা, বিভাগ বা জাতীয় সমস্যা নয়, আন্তর্জাতিক। সংবাদপত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী তার কাভারেজের স্ট্যাটাসও তাই হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক টাইমস, যুক্তরাজ্যের দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কিংবা ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের সংবাদ নির্বাচন ও কাভারেজ পদ্ধতি হয়ে থাকে আন্তর্জাতিকমানের। এগুলো আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক সমস্যা ও ইস্যুকে প্রাধান্য দেয়। গণমাধ্যম যখন জাতীয় পরিচয়ধারী হয়, 'আন্তর্জাতিক সংবাদ' শিরোনামে খবর পরিবেশনের ব্যতিক্রম ছাড়া তখন তার ভূমিকা হয়ে থাকে জাতীয় (ইস্যুভিত্তিক)। সংবাদ বা প্রতিবেদন ট্রিটমেন্ট প্রদান পদ্ধতি ও নির্বাচনে জাতীয় সমস্যা হিসাবে পরিবেশ সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগভাবে প্রাধান্য

Dhaka University Institutional Repository

পাবে। কিন্তু (তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে) বাংলাদেশে তা অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সংবাদপত্রের যে সমস্যা থাকে- খবর পরিবেশনের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে শুধু রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া, সেই সমস্যা বাংলাদেশের সংবাদপত্রেরও রয়েছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, উন্নয়নমূলক কাজ, বিরোধী কন্ঠের প্রতিবাদ ও সরকারি দলের হুঙ্কার সবটাই রাজনীতিকে ঘিরে আবর্তিত, যা সংবাদপত্রেরও আকর্ষণীয় বিষয়। (কিন্তু পরিবেশের মতো) জাতীয় জীবনের সমস্যাগুলো আসে (তারপরে) অনুষঙ্গ হিসেবে (গুপ্ত, ২০০০)। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পরিবেশকে যথার্থ অর্থেই 'জাতীয় সমস্যা' হিসেবে দেখা জরুরী।

গণমাধ্যমের সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগ ভূমিকা রাখার সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত। এরমধ্যে রয়েছে, গণতন্ত্র, সার্বিক রাষ্ট্রীয় সুশাসন, সামাজিক স্থিরতা, রাষ্ট্রের সকল বিভাগের ওপর রাষ্ট্র বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ, শাসক শ্রেণীর ন্যায় ও সত্যানুরাগ, জনগণের রুচি ও প্রত্যাশা এবং অধিকার নিশ্চিতকরণ অন্যতম। যদি কোনও দেশের জনগণেরই বাক স্বাধীনতা, সংগঠিত ও সমাবেশ করার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকে, তাহলে সে দেশের সংবাদপত্রের দশাও জনগণের দশার চেয়ে তেমন বেশি কিছু হয় না। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে হয়তো পুঁজিপতি মালিক (সরকারের সঙ্গে আঁতাত না করে) গোয়ার্তুমি করে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমকে গতিশীল রাখতে পারেন, কিন্তু সার্বিক রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে আসলে সে লড়াইটা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। আত্মসমর্পণ অবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে তখন গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা নানা কৌশল আর তত্ত্বের (দুর্বলতার) সুযোগ নিতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশে সংবাদপত্রের আইনটা এখনও মোটামুটিভাবে এমন শক্ত যে গণমাধ্যমের পক্ষে হলেও টিভি বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আইনটি নিপীড়নমূলকই রয়ে গেছে। যে কারণে ওই মিডিয়ার ওপর বিটিআরসি (বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন) নামক 'যম' যখন-তখনই নাজিল হতে পারে। এই মুহূর্তে ইটিভির সঙ্গে এমনই একটি জটিলতা চলছে তাদের। গত ১২মার্চ ২০১২সালে বিরোধী দলের সমাবেশ সরাসরি সম্প্রচার নিয়ে বাংলাভিশনও একইভাবে রোষানলে পড়েছিলো। এই অবস্থায়ই গণতন্ত্রবিহীন বা গণতন্ত্ররূপী কোনও সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের আংশিক গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক দেশে যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে প্রকারান্তরে একদলীয় তন্ত্র চলে, সেখানে সংবাদপত্রের কার্যপরিধি স্বআরোপিত সেন্সরশীপের মধ্যে পরিগ্রহ করতে বাধ্য। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যখন একধরণের অস্থিরতা কাজ করে। জনসেবার পরিবর্তে রাজনীতি যখন ক্ষমতার মসনদমুখি হয়, তখন আর রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গেলে দেশের বা মানুষের সার্বিক কল্যাণ হয় না। আর এমনি সমাজে গণমাধ্যম কখনো স্বেচ্ছাচারী, কখনো অনুগত আবার কখনো মতলববাজী ভূমিকার আশ্রয় নেয়। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম মালিক-কর্ণধারদের প্রধান লক্ষ্য দেখা যায় বৈষয়িক স্বার্থকেন্দ্রিক। আর তা অর্জনে কেউ শাসকগোষ্ঠীর পদলেহন করে। কেউবা শাসকগোষ্ঠীর বিরোধী অবস্থান নিয়ে অন্য কোন পক্ষ থেকে বা অন্যকোন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত হয়। মতলববাজী ভূমিকাও পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রে দেশপ্রেম মিথ্যা ফানুসে ভোগাস প্রত্যয়ে পরিণত হয়। দেশপ্রেম তখন হয়ে যায় ব্যবসার বা ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের হাতিয়ারে। জাতীয় স্বার্থ হয় ভূলুণ্ঠিত। এ অবস্থায় সার্বিক পরিবেশদূষণ ও পরিবেশবিপর্যয়ের রেশ ধরে সার্বিক জাতীয় হুমকি ও বিপদাপন্নতা তেমন গুরুত্ব পায় না গণাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক পরিবেশে সেখানে আংশিক গণতন্ত্র এবং ক্ষমতাশালীর স্বেচ্ছাতন্ত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা হয় বিভ্রান্ত। মৌলিক আর জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক সংবাদ তখন আর তেমন গুরুত্ব পায় না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা কি ইউরোপ আমেরিকার মতো দেশে নেই? অবশ্যই ঘটে। কিন্তু গুণগত পার্থক্য রয়েছে। সেখানে সাংবাদিকতার পক্ষে নানানধরণের বাধাবিঘ্ন আছে। কিন্তু সংবিধানগত গণতন্ত্রের উপস্থিতির জন্য সাংবাদিকরা তথা সংবাদপত্র তার সমালোচনা করতে পারে। সেখানে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকলেও আমাদের মতো রাজনৈতিক মতাদর্শিক কারণে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত নয়। সমাজের বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সব শাখা রাজনৈতিক পক্ষপাত দোষে দুষ্ট নয়। সুশাসন নিশ্চিত হওয়ায় সংবাদপত্র বিভিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের খড়গ সেখানে ঝুলে না গণমাধ্যমের ওপর। বরং সর্বোচ্চ আদালতের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে পেন্টাগন পের্পাস সংক্রান্ত এক মামলায় নিউইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে বিচারপতির পত্রিকার পক্ষে এমনি এক রায় দিতে দেখা যায়। ওই ব্যাপারে আদালত মন্তব্য করেছিলেন, সরকারের অনৈতিকতা (deception) সম্পর্কে জনগণকে সচেতন রাখা গণমাধ্যমের কর্তব্য responsibility)(গুপ্ত, ২০০০)।

৩. ৩ গণমাধ্যম ও জনসমাজ : সম্পর্ক অন্বেষা

পরিবেশের যে নির্মম বাস্তবতা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিশ্ববাসী বহন করছে, তা থেকে আশুমুক্তি সম্ভব নয়। আর চাইলেও কি তা পাওয়া যাবে? পরিবেশদুষণ থেকে (তা) সুরক্ষা পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ায় অনেকগুলি পক্ষ জড়িত। ইস্যুটি আন্তর্জাতিক হওয়ায় জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিভিন্ন দেশ. জাতীয় পর্যায়ে সরকার, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান এর বিপরীত দিকে ভূক্তভোগী জনগণ রয়েছে। আর সবার সঙ্গে আছে গণমাধ্যম। মানুষ যখন নৈতিক হয়ে যায় এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করে, তখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব ঠিক করে নেয়। নিজের ও অন্যের অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকে। ঝড় উঠলে যেমন তা নির্বিচারে আক্রান্ত করে, পরিবেশ দুষণের ফলে যে নেতিবাচক পরিণতির আশংকা করা হচ্ছে, তাও হবে নির্বিচার। এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশের প্রতি আচরণে নৈতিকতাবোধ জরুরী। কিন্তু যখন ভোগান্ধ মানুষ আর তার সরকারের মাঝে এই নৈতিকতা কাজ করে না, তখনই প্রশ্ন আসে চাপ সৃষ্টির। গণমাধ্যম তত্ত্ব আর গণমাধ্যমের প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা গেছে, উল্লেখিত সবপক্ষের ওপর প্রভাব রাখে গণমাধ্যম। আর এটা এজন্য যে, গণমাধ্যমে কোনও ইস্যু উত্থাপিত হওয়ার পর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলো একধরণের চাপবোধ করে। গণমাধ্যম ইস্যু উত্থাপনের মাধ্যমে করণীয় ঠিক করে দেয়। এজেন্ডা সেট করার মাধ্যমে গণমাধ্যম কোনও ইস্যু এমনভাবে আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করে, যার ফলে টার্গেট পূরণ করে। অবস্থা এমন যে, যদি শক্তিশালী কোনও পক্ষের বিরুদ্ধে বিশেষ করে সরকার বা সমাজপতি বা পরিবেশ দুষণকারী (যেমন : আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশ, আর জাতীয় পর্যায়ে শিল্পপতি)-এর বিরুদ্ধে হয় ইস্যুটা, তখন গণমাধ্যম পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, গণরোষ আর গণআন্দোলনের ভয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষ উদ্যোগী ও তৎপর হয় সমস্যা সমাধানে। বিষয়টির সমর্থনে মেলভিন ফ্লার ও স্যান্ড্রা বল-

Dhaka University Institutional Repository

রোকেশের বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য। ফেডারেল সরকার ব্যবস্থায় কর্পোরেশনগুলোর গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন আর জনগণকে অবহিত করে নিজেদের দায়মুক্ত করার দ্বিমুখী লক্ষ্যে গণমাধ্যমকে ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁরা। বলেছেন, 'ফেডারেল/কেন্দ্রীয় সরকারে নানা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশরক্ষা আন্দোলন সংগঠন ও কর কর্তৃপক্ষ ইত্যকার প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত লড়াইয়ে কর্পোরেশনের ভূমিকার বৈধতার বিষয়টি যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে জনগণের কাছে পৌছে দিয়ে, তাঁদেরকে বুঝিয়ে, সমর্থন সংগ্রহ করে একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্তের পক্ষে সহযোগিতা গড়ে তোলা সম্ভব (ফ্লার, বল-রোকেশ, ১৯৯৩)।'

এ অবস্থায় প্রশ্ন হচ্ছে, গণমাধ্যম তাহলে কীভাবে গণসচেতনতা তৈরি করে বা তার সেই (গণরোষ তৈরির) কাজটি করে? গণমাধ্যম তথ্য জানানোর কাজটিই বা কীভাবে করে? কীভাবে জনগণ তথ্য জানে, যে কারণে পাথরে ফুল ফোটে। এক্ষেত্রে গবেষণায় বিভিন্ন তত্ত্ব বেরিয়ে এসেছে। নিম্নে কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

৩.৩.১ ম্যাজিক বুলেট থিওরি (Magic Bullet Theory)

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে একটি হলো 'ম্যাজিক বুলেট' থিওরি (Magic Bullet Theory)। এর মূল কথা হলো গণমাধ্যম দ্বারা মানুষ সরাসরি প্রভাবিত হয়। এটা মানুষের মধ্যে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। গণমাধ্যমের প্রভাব তাৎক্ষণিক, শাশ্বত, সরাসরি এবং শক্তিশালী।

তবে এই মতবাদটি যোগাযোগ শাস্ত্রের শুরুর দিকে গবেষণা। এ তত্ত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা হয়, মানুষ যখন গণমাধ্যম দেখে, তখন সে গণমাধ্যমের আচরণেই বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের চেষ্টা করে। জার্মানির নাৎসি বাহিনীর স্রষ্টা হিটলারের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়, তিনি অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র বেশি দেখতেন। যেটা তার বাস্তবজীবনে প্রভাব ফেলে।

৩.৩.২ দ্বিধাপ প্রবাহ (The Two step flow of communication)

পরে এ তত্ত্ব প্রশ্নের সম্মুখিন হয়। আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমেও মানুষ প্রভাবিত হয় বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়। এনিয়ে যে গবেষণা হয় তার নাম যোগাযোগের 'দ্বিধাপ প্রবাহ' (The Two step flow of communication)। এ তত্ত্বে বলা হয়, গণমাধ্যম এবং জনগণের মাঝে মত-মোড়লের (Opinion Leader) অস্তিত্ব রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে কেবল গণযোগাযোগ নয়, আন্ত র্ব্যক্তিক যোগাযোগেরও ভূমিকা রয়েছে।

এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট কে মার্টিন ১৯৪৩সালে নিউজার্সির রোভারে (Rovere) নামক শহরে গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণার প্রতিপাদ্য ছিল 'আন্তর্ব্যক্তিক প্রভাব এবং যোগাযোগ আচরণ'। যারা নতুন তথ্য পরামর্শের কারণে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে মত পরিবর্তন করেছে এমন ৮৬জনকে গবেষণার নমুনা হিসেবে নেয়া হয়েছে। এরা পরামর্শদাতা হিসেবে অসংখ্য লোকের নাম উল্লেখ করে। যাদের নাম চারবার বা তার বেশি উল্লেখিত হয়েছে। তাদেরকে মত-মোড়ল হিসেবে গণনা করা হয়েছে। পরে এসব

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবকদের খুঁজে বের করে তাদেরও সাক্ষাতকার নেয়া হয়। এছাড়া ডিকেটর (Decatur), দ্য ড্রাগ স্টাডি (The Drug study) এবং এলমিরা (Elmira) শীর্ষক গবেষণা পরিচালিত হয়।

ডিকেটরও (Decatur) যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যের একটি এলাকা। গবেষক কেটজ্ (katz) ও লেজার্সফিল্ড (Lazarsfeld) যৌথভাবে ১৯৪৫-৪৬সালের মধ্যে ৮০০জন মহিলার মধ্যে গবেষণাটি করেন। ১৯৫৫সালে তারা *পারসোনাল ইনফ্লুয়েন্স* (*Personal Influence*) নামে একটি গ্রন্থপ্রকাশ করেন। যেখানে এই গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। নির্বাচিত ঘটনার মতোই এতেও সুনির্দিষ্ট ঘটনার অনুসন্ধান করে পণ্য ক্রয়, সিনেমায় গমন, ফ্যাশন ইত্যাদি বিষয়গুলোতে মত মোড়লদের প্রভাব প্রমাণিত হয়। দ্য ড্রাগ স্টাডি (The Drug study) গবেষণায় ডাক্তাররা নতুন কোনও ঔষধ প্রচলনের ক্ষেত্রে কিভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন তা জানার জন্য এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। গবেষক কেটজ, কোলম্যান (coleman) ও ম্যানজেল (menzel) যুক্তরাষ্ট্রের চারটি মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরের ডাক্তারদের সাক্ষাতকার নেন। তাদেরকে অতীত প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভঙ্গি, ঔষধ ব্যবহার, তথ্যের বিভিন্ন উৎসের সঙ্গে সংস্পর্শ এবং এদের প্রভাব সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ডাক্তার যখন নতুন কোন ঔষধের প্রচলন করেন, তখন কয়েকজন ডাক্তার মিলে এব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এছাড়া গ্রামের কোন ডাক্তার যদি পত্রিকার মাধ্যমে কোন ঔষধ সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন ওই ডাক্তার সেই ঔষধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিয়ে অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে আলাপ করেন। অর্থ্যাৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের আশ্রয় নেন। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যদিও ঔষধ সংক্রান্ত তথ্য গণমাধ্যম থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ তথা মত-মোড়লের। ১৯৪৮সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ভোটারদের আচরণ জানার জন্য ব্যারেলসন (Berelson), লেজার্স ফিল্ড এবং ম্যাকফি (McPhee) গবেষণা করেন। এটি এলমিরা (Elmira) গবেষণা নামে পরিচিত। এ গবেষণায়ও মত-মোড়লদের ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এগুলো হচ্ছে- প্রত্যেক সামাজিক, অর্থনৈতিক, পেশাগত স্তরে মত-মোড়লদের অস্তিত্ব রয়েছে। মত-মোড়লরা পক্ষপাত দুষ্ট। গণমাধ্যমের সংবাদ বা তথ্য তারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অন্যদের কাছে উপস্থাপন করেন। আবার মত-মোড়লদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি। যারাই কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ তারাই মত-মোড়ল হিসেবে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ টেলিভিশনগুলোর টক শো'কে এর দৃষ্টান্ত হিসেবে নেয়া যায়।

৩.৩.৩ বহুধাপ তত্ত্ব (The Multiple-step flow model)

দ্বি-ধাপ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে বহুধাপ (The Multiple step flow model) তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এ গবেষণায় দেখা যায়, মত-মোড়লরাও অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থ্যাৎ এক বিষয়ের মত-মোড়লরা অন্য বিষয়ের তথ্য জানার জন্য অন্যান্য মত-মোড়লদের কাছে যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যোগাযোগ দ্বিধাপের নয়, বহুধাপেও প্রভাবিত হতে পারে। এলমো রোপার (Elmo Roper) এই মডেলটি উপস্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি এই গবেষণার নাম দিয়েছেন 'সমকেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত তত্ত্ব' (Concentric circle theory)। প্রায় ৩০বছর যাবত জনমত গবেষণা করে তিনি এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মনে করেন, কোনও ধারণা পুরো জনগোষ্ঠীর কাছে খুব ধীর গতিতে পৌছায়। দেয়াল যদি পানির সংস্পর্শে আসে, তাহলে প্রথমেই এর উপরিপৃষ্ঠ সিক্ত হয়। ধীরে ধীরে পানি দেয়ালের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে। সবশেষে পুরো দেয়ালকে স্যাঁতস্যাতে করে। জনগণের মধ্যে কোন ধারণার বিস্তারেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ঘটে বলে রোপার মনে করেন। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম ধারণাটি উদ্ভব ঘটে যার মধ্যে তিনি হচ্ছেন 'মহান চিন্তাবিদ'। অর্থ্যাৎ কোন একজন মহান চিন্তাবিদের মধ্যে কোন একটি ধারণা আসে। এরপর তা পর্যায়ক্রমে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে জনগণের কাছে পৌছে। এটি বোঝাতে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা একটি মডেল প্রস্তাব করেছেন (আসাদুজ্জামান ও মুহিউদ্দীন, ২০০২)। মডেলটি হলো-

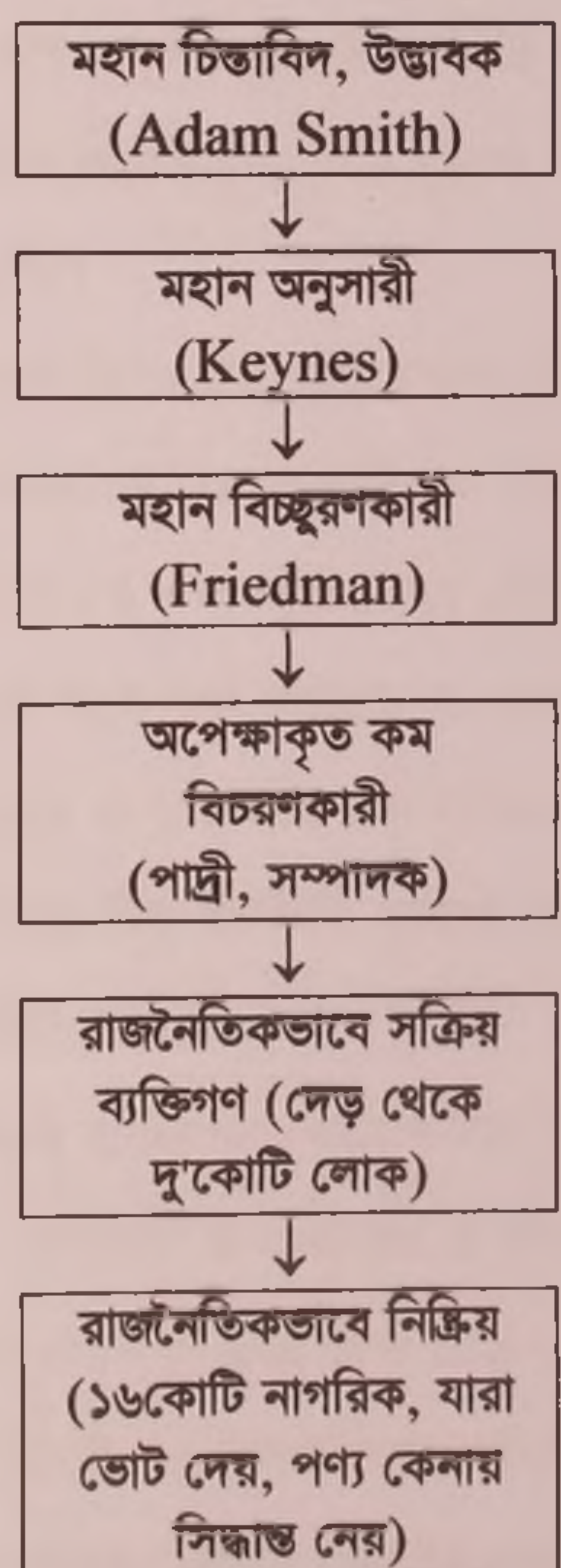

চিত্র : রোপারের (Ropoer) বহুধাপ প্রবাহ মডেল

৩.৩.৪ ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্ব (Uses and gratification theory)

এলিহুকেথজ (Elihukatz) সর্বপ্রথম তাঁর একটি নিবন্ধে এই তত্ত্বের ব্যবহার করেন। ওই নিবন্ধে তিনি বার্নার্ড ব্যারেলসনের একটি দাবির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এতে তিনি জনগণ গণমাধ্যমকে নিয়ে কি কওে সে প্রশ্ন খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪৯সালে নিউইয়র্কে সংবাদপত্রে ধর্মঘট চলাকালে তিনি এ জরিপধর্মী গবেষণা চালান। যেখানে তিনি জনগণের কাছে জানতে চেয়েছেন তারা ধর্মঘটের কারণে পত্রিকার পাতায় কি

Dhaka University Institutional Repository

পাচ্ছেন না। দু'সপ্তাহব্যাপী সংবাদপত্র বিলিকারীদের ডাকা ধর্মঘটের কারণে তারা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে জানান। কেউ বলেছে সংবাদপত্র সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি কাজ তাই পড়ি। আবার কারও কাছে মনে হয়েছে, বিশ্বের খবরাখবর জানার জন্য সংবাদপত্রের বিকল্প নাই। অনেকে অবশ্য চিত্ত বিনোদনের জন্য পত্রিকা পড়ার কথা জানিয়েছেন। অনেকে দৈনন্দিন কিছু প্রয়োজন মেটানোর জন্য পত্রিকার গুরুত্বের কথা বলেছেন। যেমন ঃ ফ্যাশন, রান্নার নিয়ম, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও অন্যান্য তথ্যের জন্য। ব্লামলার (Blumler) ও ম্যাককোয়েল (Mcquail) ১৯৬৪সালে যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনের সময়ে ব্যবহার ও তুষ্টি দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। তাদের গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি বিষয় জানা। জনগণ কেন রাজনৈতিক দল বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখে বা উপেক্ষা করে। যারা দেখে তারা অনুষ্ঠানগুলো কি কাজে ব্যবহার করে এবং রাজনীতিবিদদের টিভিতে উপস্থাপনের নানা উপায়ের মধ্যে জনগণের পছন্দ কোনটি। প্রশ্নগুলোর প্রাপ্ত উত্তরের উপর ভিত্তি করে গবেষকদ্বয় জনগণের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান দেখার পেছনে ৮টি কারণ নির্দেশ করেছিলেন। পরে বৃহত্তর নমুনা জরিপে সাক্ষাতকার নেয়ার ভিত্তি হিসাবে এ কারণগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

গণমাধ্যম ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্বে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা অডিয়েন্সকে সক্রিয় হিসেবে দেখিয়েছেন। এই তত্ত্বের আলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীরা সতর্ক এবং সক্রিয়ভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সবার সাথে কথা বলছেন না। মোবাইলে কথা বলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পছন্দ অত্যন্ত সক্রিয়।[১৩] গণমাধ্যম ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্বে বলা হয়েছে, কিভাবে দর্শক শ্রোতারা ব্যক্তি পর্যায়ে গণমাধ্যম ব্যবহার করে। দর্শক শ্রোতার কিছু সুনির্দিষ্ট চাহিদা রয়েছে যেগুলো তারা গণমাধ্যম এবং গণমাধ্যম-বহির্ভূত উৎস ব্যবহার করে মিটিয়ে থাকেন।

গণমাধ্যম ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্বে গণমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চাহিদার চারটি শ্রেণীবিন্যাস করে দেখা যায়। তুষ্টি তত্ত্বের *অবধারণ, বিনোদন, সামাজিক উপযোগিতা ও প্রত্যাহার* এই চাহিদাগুলো মোবাইল ফোন ব্যবহার কারীদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় সঙ্গতিপূর্ণ বলে দেখা গেছে। এ গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় হলের শিক্ষার্থীরা এখন শুধু কথা বলার জন্যই নয়, অবধারণগত চাহিদা মেটাতে, ইন্টারনেট ব্যবহার ও খবর জানার জন্যও মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন। এছাড়া মোবাইল ফোন শিক্ষার্থীদের বিনোদন চাহিদাও পূরণ করছে। শিক্ষার্থীরা বিনোদন চাহিদা মেটাতে রেডিও শোনা, গান শোনা, কাজ নিয়মিত করছেন। সামাজিক উপযোগিতা মেটাতে শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোনে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করছেন। আত্মীয়-

---

[১৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষের (২০০৯সালের জুলাই মাসে দাখিলকৃত) এমএ ছাত্র আবুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীদের মোবাইল ব্যবহার সম্পর্কে 'বিশ্ববিদ্যালয় হলের শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রায় মোবাইল ফোন ব্যবহার ও সংস্কৃতি' শীর্ষক গবেষণা করেন। এতে ওই চিত্র বেরিয়ে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী প্রত্যেকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ শিক্ষার্থীদের সামাজিক উপযোগিতার চাহিদা মেটাচ্ছে।

গণমাধ্যমের ব্যবহারের মতো মোবাইল ব্যবহার করেও মানুষ সমাজ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় মোবাইল ফোন কল দিয়ে কারও সামনে থেকে সটকে পড়তে বা কাউকে অগ্রাহ্য করতে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন। এ গবেষণায় দেখা গেছে, প্রত্যাহার চাহিদা বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোনে অসত্য তথ্য দিয়ে থাকেন।

৩.৩.৫ গণমাধ্যম ব্যবস্থা নির্ভরতা তত্ত্ব (Media System Dependency Theory)

পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা নির্ণয়ের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে এর কাজ করার প্রক্রিয়াটি জড়িত। গণমাধ্যমের কাজের সঙ্গে এর পাঠক এবং দর্শক-শ্রোতার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে হবে। কেননা, প্রভাবিত করতে পারলেই এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাঠক বা শ্রোতা-দর্শকের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সমীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে। মূলত ওইসব সমীক্ষা সামাজিকবিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারার সাথে সম্পর্কিত করেই করতে দেখা যায়। প্রত্যেকটি ফলাফলই গণমাধ্যমের প্রভাব সম্পর্কে নিজ নিজ যৌক্তিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু একটির পর আরেকটির আবির্ভাবে স্বভাবতই আগেরটি অনুপযুক্ততা প্রতীয়মান হতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে নির্ভুলতা, সম্পূর্ণতা আর শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। তবে বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, এককভাবে কোনটাই যেমন সম্পূর্ণ নয়, আবার প্রত্যেকটির আলাদা যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে। তাই আমরা এখানে প্রত্যেকটিকে গ্রহণ করে সার্বিকভাবে সমন্বিত প্রভাব বিবেচনায় নেয়ার চেষ্টা করবো। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রক্রিয়া হবে সমন্বয়ী। উপসংহার হলো, তথ্য প্রবাহ, জনগণের অবগতি আর গণমাধ্যমের প্রভাব তৈরি- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সব ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমের সবক'টি তত্ত্ব প্রয়োগযোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা, গণমাধ্যমের অভিগম্যতার সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক প্রভাব ও দ্বিধা-বিভক্তি, মিডিয়ার আংশিক ও অসম্পূর্ণ ও বিকৃত উপস্থাপনা- এ সব কারণে সব তথ্যগুলিই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, হচ্ছে। তাই কোনটি বাদ দেয়া বা রাখার প্রয়োজন তেমন অনুভূত হয় না।

গবেষকদের ধারণা মতে, প্রথমদিকে মানুষের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাবটা প্রত্যক্ষ ছিলো। বলা হতো যে, গণমাধ্যম দ্বারাই মানুষ বেশি প্রভাবিত হয়। গণমাধ্যমের প্রভাব তাৎক্ষণিক, শাশ্বত, সরাসরি এবং শক্তিশালী। গণমাধ্যমকে বলা হতো এজেন্ডা-সেটার (মানুষ কি করবে, তা গণমাধ্যম ঠিক করে দেবে)। কিন্তু পরে বিষয়গুলো প্রশ্নের সম্মুখিন হয়, চ্যালেঞ্জ আসে। গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ ভূমিকাটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রভাব আসলে দীর্ঘমেয়াদী, পরোক্ষ, নৈর্বাচনিক এবং সীমিত বলে মনে করা হয়। তবে এটাও সত্য যে, একেবারেই প্রভাবটা বিলীন হয়ে যায়নি। গণমাধ্যমের ক্রিয়াফল জনগণ ও সমাজের ওপর অত্যন্ত সরাসরি। আর সেটা নির্ভর করে মূলত পাঠক-দর্শক-শ্রোতা, গণমাধ্যম এবং সমাজ- এই তিন পক্ষের সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর (যেমন ঃ তথ্যের অভিগম্যতা কতটা সরাসরি, প্রবাহ কতটা অবাধ ও সহজ)। এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয় যে, সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাবটা আসলে সার্বজনীন। মেলভিন ফ্লার ও স্যান্ড্রা বল-রোকেশ (১৯৯৩) এজন্যই পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের চাহিদাকে তিনভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। বলেছেন, ওই তিন চাহিদার কারণে মানুষ গণমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়। কেননা, তা সরাসরি কেবল গণমাধ্যম থেকেই পূরণযোগ্য। চাহিদা তিনটি হচ্ছে, সামাজিক দুনিয়াকে জানার চাহিদা, বিশ্বে কার্যকর ও অর্থপূর্ণভাবে কাজ করার চাহিদা এবং খেলাধুলা, একান্তভাবে বহিঃপ্রকাশমূলক তৃপ্তি বা দৈনন্দিন সমস্যা বা উত্তেজনা থেকে নিস্কৃতি পাবার চাহিদা। এ ক্ষেত্রে বলা হয়, সমাজ যখন আরও জটিল হয়ে ওঠে, গণমাধ্যমগুলির সাথে সমাজের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাত্রা আরও তীব্র হয়ে ওঠে, গণমাধ্যম প্রযুক্তির উৎকর্ষ ঘটে। তখন সেই গণমাধ্যমগুলিও শ্রোতা-দর্শকের কাছে ক্রমেই বেশি অনন্য ও চমৎকার উপায়ে তথ্য যোগান বৃদ্ধি করে চলে। গণমাধ্যমগুলোর ওপর পাঠক-দর্শক-শ্রোতার নির্ভরশীলতা তুঙ্গে ওঠার আরও একটি কারণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সমাজে পরিবর্তনশীলতা ও সংঘাতের পরিস্থিতির উপস্থিতি। সমাজের স্থিতিবিধায়ক শক্তিগুলোর পাশাপাশি পরিবর্তনশীলতা ও সংঘাত পরিস্থিতির শক্তিগুলিও কার্যকর থাকবে। যেমন : কোন সমাজে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া। এটা যখন চলতে থাকে, তখন ওই সমাজের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস, আচার-আচরণ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। ওই অবস্থায় গণমাধ্যমের তথ্য উৎসের প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতা তীব্রতর হয়ে ওঠে। ক্ষেত্রে পাঠক-শ্রোতার তথ্য পিপাসা এমন হয় যে, গণমাধ্যম যদি তখন অসম্পূর্ণ খবর প্রদান করে, তাহলে তাতে দ্বৈধতার (Ambiguity) সৃষ্টি হয়। পাঠক-শ্রোতা-দর্শক ওই পরিস্থিতিতে ঘটনা একটা ঘটে গেছে- বুঝতে পারে। তখনই আরও বিস্তারিত তথ্যের পিপাসা থেকে সে বিকল্পের অনুসন্ধান করে। এই অবস্থায় গণমাধ্যম নির্ভরতা বরং আরও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যদি দ্বৈধতাটি সামাজিক সংঘাত আর অপ্রত্যাশিত কোনও কিছুর ব্যাপারে ঘটে।

মানুষ ও সমাজের ওপর প্রভাব সম্পর্কিত সমন্বয়ী এই মতবাদে আর নতুন যেটা এসেছে তা হলো আন্ত ঃসম্পর্ক ও গোষ্ঠী সম্পর্কের সংযোগ। কোন নির্দিষ্ট ইস্যুর গুরুত্বের ওপর তা জানার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ, চাহিদা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, অনুসন্ধিৎসা, স্বার্থ, সম্পৃক্ততা, ভবিষ্যত শংকা ইত্যাদি বিষয় প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। এসব বিষয় যদি ইস্যুটি জানার পেছনে প্রভাব বিস্তার করে, তখন তার তথ্যের সঠিকতার (কনফার্মেশন) ব্যাপারে গণমাধ্যম ছাড়াও আন্তঃসম্পর্ক ও গোষ্ঠী সম্পর্কের দ্বারস্থ হয় তথ্যপিপাসী। অনেক সময়ে একাধিক পত্রিকা বা টেলিভিশন বা রেডিও'র দ্বারস্থ হতে দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সামাজিক ও মনস্তাত্তিক ও প্রযুক্তির প্রভাব মানুষের ওপর তথ্য-পিপাসা মেটানোর ক্ষেত্রে কাজ করে। আর এই কাজ করার পদ্ধতি হিসেবে যে বিষয়টি সামনে থাকে তাহলো মূল্যবোধের তীব্র সংঘাত। গণমাধ্যম এ ক্ষেত্রে মূল্যবোধের সরল ব্যাখ্যার সুবিধা করে দেয়। এই সুবিধা করে দেবার অন্য পথ হচ্ছে গণমাধ্যমে এমন সব তথ্যের উপস্থাপনা যেগুলি পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মূল্যবোধের সংঘাতকে তীব্র করে তোলে। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে সাম্প্রতিক সময়ের নাগরিক ও পরিবেশ-প্রতিবেশ সংক্রান্ত যেসব আন্দোলন হয়, সেগুলি তথ্যমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা-ই পায়নি বরং তাতে মৌলিক মূল্যবোধগুলির সংঘাতও দেখা দিয়েছে। প্রতিবেশ আন্দোলন অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে নন্দনতাত্তিক ও অস্তিত্ব রক্ষামূলক মূল্যবোধের সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ের তথ্যপ্রযুক্তি আর অ্যাপার্টমেন্ট-কালচার এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজে মানুষ ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বিশ্বায়ন নিজের ভোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে মূলত মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে করতে সর্বশেষ অকৃতদার করার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। কেননা, মানুষ যত বিচ্ছিন্ন হবে, আর্থিকভাবে ক্ষমতা তার তত বাড়বে। একদিকে আর্থিক সক্ষমতা থাকলে সে বিভিন্ন পণ্যের ভোক্তা হবে। অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে চরম একাকীত্ব ও নির্জনতা দূর করার লক্ষ্যে সে প্রযুক্তি যেমন টেলিভিশন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম, ফ্রিজ ইত্যাদির সংস্পর্শে যাবে। ফলে বিক্রি বাড়বে। এভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী অ্যাপার্টমেন্ট-কালচারের যে সমাজে পাশের ফ্ল্যাটে দু'জন লোক খুন হলেও টের পায় না, সে সমাজে এরিস্টটলের সামাজিক জীব-মানুষ নিঃসন্দেহে ঘুমের আগে-পরের সময়টি কাটাতে গণমাধ্যমেরই দ্বারস্থ হয়। বিষয়টি অনেকটা সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম (Durkheim) এই অবস্থাকেই 'Anomie'বলেছেন। যেখানে ডুর্খেইম মানুষের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্কের হ্রাস বা আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের গুরুত্বহীনতার বিপরীতে প্রভাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিকল্প উৎসের দ্বারস্থ হওয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

তবে এটা ঠিক যে, শহুরে গুটিকতক অ্যাপার্টমেন্ট-বাসীর মনস্তত্ত্ব আর সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে আবার কেবল গোটা দেশের মানুষের বাস্তবতা বলে উপসংহার টানা যাবে না। হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির অন্যতম দিক হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ, সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো। এখনও বিকাল হলে গাঁয়ের মানুষ গঞ্জে বা হাটে বা থানা সদরে ছুটে যান। অবসর সময়টা চায়ের দোকানে কাটানোর অভ্যাস অনেকের। আবার ঈদ, পুজোর মতো জাতীয় উৎসবে পারিবারিক ও সামাজিক আবহ যেমন দেখা যায়, তেমনি বইমেলা, স্বাধীনতা উৎসব ও ভাষা আন্দোলনের মতো কেন্দ্রীভূত আয়োজিত অনুষ্ঠানে মানুষের ঢলও দেখা যায়। সুতরাং মানুষ যেমন শুধু গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল নয়, আবার গণমাধ্যমবিমুখও নয়। এ ক্ষেত্রে আমরা ডুর্খেইমকে যেমন একচ্ছত্রভাবে গ্রহণ করতে পারবো না, তেমনি মানুষের চরিত্রের অন্তর্মুখি (Introvert) দিককেও কেবল গ্রহণ করা যাবে না। আবার মানুষকে শুধু প্রযুক্তির পুজারিও বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির আন্তর্ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীবন্ধন তাকে দেয় স্থিতিশীল প্রথা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ। এটা কিন্তু ডুর্খেইমের 'Anomie' অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। আর এ ক্ষেত্রেই চলে আসে একটি সমন্বিত তত্ত্বের। যাকে বলা যায় *মিক্সআপ থিওরি*। অর্থ্যাৎ, মানুষ কেবল আর্ন্তব্যক্তিক, মত-মোড়ল বা ব্যবহার ও তুষ্টির ভিত্তিতে তথ্যগ্রহণ করে না। কিংবা কেবলই গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করে থাকে না। ফ্লার ও বল-রোকেশের মতে, গণমাধ্যম প্রভাববিস্তারের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী যেমন নয়, তেমনি ওইসব মাধ্যমে যারা কাজ করেন সেই কর্মীরাও যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। মাধ্যমসমুহ (গণমাধ্যম) ও এগুলির শ্রোতা/দর্শক উভয়পক্ষই তাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মাধ্যমগুলির বার্তাসমুহের প্রকৃতির ওপরেই নয়, শ্রোতা-দর্শকদের ও ওই বার্তাগুলির প্রকৃতির ওপরেও পারিপার্শ্বিক সমাজসংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ ও সংযম আরোপ কওে (ফ্লার ও বল-রাকেশ, ১৯৯৩)।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.গণমাধ্যম ও জনমানুষ : সম্পর্ক নির্ণয়

উইলবার ল্যাং শ্র্যামের মতে, গণমাধ্যমের কাজ হচ্ছে শিক্ষা দেয়া, তথ্য দেয়া, আনন্দ দেয়া ও সতর্ক করা (শ্র্যাম, ১৯৬৪)। তবে আবহমানকাল থেকে সংবাদপত্র অন্যায় ঘটনাগুলো তুলে ধরা এবং মানুষের অধিকার কীভাবে রক্ষা করতে হয় সে সম্পর্কে লোককে সচেতন করে আসছে। জাতিসংঘ আয়োজিত এক বিশ্ব সম্মেলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'গণমাধ্যম বিশ্বজুড়ে মানুষকে দুর্যোগ, ভোগান্তির সম্পর্কে সতর্কীকরণ, আক্রান্ত এলাকার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার-প্রকাশ, সরকারি লোকজন, রিলিফ সংগঠন ও জনগণকে প্রকৃত চাহিদা সম্পর্কে সজাগ এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনার আয়োজন করে থাকে' (বিশ্বাস, দুলাল চন্দ্র ২০১২ : ১৩)। ভারতীয় উপমহাদেশে ১৮৭০ থেকে ১৯১৮সালের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন যখন ভালোভাবে মাঠে গড়ায়নি, সেই সময়টিতে মানুষকে আন্দোলন ও কর্মসূচি এবং অধিকার সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন করা হয়েছিলো সংবাদপত্রের মাধ্যমে। মানুষকে রাজনীতি সচেতন করে তোলা, রাজনৈতিক প্রচারণা চালিয়ে তাদের শিক্ষিত করে তোলা, জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ গড়ে তোলা ও তা প্রচার করা, জাতীয়তাবাদী জনমত জাগ্রত করা, জনগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া, তাদের সমবেত ও সংহত করার কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রধান হাতিয়ার ছিলো সংবাদপত্র (চন্দ্র, বিপান ১৯৯৪)। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের ভূমিকা যখন মানুষকে বিপদে-আপদে ও সুখ-দুঃখে এভাবে সচেতন করে এসেছে, তখন চলমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু 'পরিবেশ' এবং পরিবেশের ওপর সাঁড়াশি আক্রমন পরিচালনাকারী ও পরিবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জলবায়ুর উষ্ণায়ন, এর প্রভাব সম্পর্কে মানুষের কাছে কতটুকু তথ্য রয়েছে- সেটা নির্ধারণ জরুরী। অর্থ্যাৎ এর মাধ্যমে গণমাধ্যম তার দায়িত্ব কতটুকু পালন করলো বা আর কি করণীয় তা বের করা সম্ভব হবে। এই বিষয়টি জানার লক্ষ্যে সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণে অনুসন্ধান চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সাক্ষাতকার পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে যে তথ্য পাওয়া গেছে এখন আমরা তা উপস্থাপন করবো।

৩.৪.১ তথ্য উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা

পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা নিরূপনের সঙ্গে সাধারণ মানুষ, গণমাধ্যম, ক্যাম্পেইনকারী এনজিও সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, সরকারি নীতি-নির্ধারক ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় জড়িত। এদের সঙ্গে অন্যান্য সম্পৃক্ততা ছাড়াও গণমাধ্যমের সেবাগ্রহণ বিশেষ করে পত্রিকা পাঠ, টিভির খবর দেখা ও বেতারের খবর শোনার বিষয়টি রয়েছে। পরিবেশের মতো বৈশ্বিক, সর্বব্যাপী ও জটিল বিষয়ের ব্যাপারে বিশেষত এর নেতিবাচক প্রভাব ও ভবিষ্যত বিপদাপন্নতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের বর্তমানে সচেতনতার পর্যায় জানা দরকার। কেননা, পরিবেশের প্রতি জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে এটা নির্ণয় হওয়া প্রয়োজন। এসব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য জরিপ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য যে প্রশ্নপত্র করা হয়েছিল সেগুলো পর্যালোচনা করে সেখান থেকে মোট ২৬টি সারণী তৈরি করে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই

Dhaka University Institutional Repository

২৬টি সারণীর তথ্য বিভিন্নভাবে বোধগম্য করার জন্য আবার ১৮টি গ্রাফ, চার্ট ব্যবহার করে পুরো তথ্য-উপাত্ত বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সেগুলো বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন করা হলো।

সারণী এক : সংবাদপত্র পাঠ ও টেলিভিশনের খবর শোনা-দেখা

মাধ্যম	মোট ও শতকরা	উভয়টি হ্যাঁ	কোনটিই না	যে কোন একটি দেখে	যে কোন একটি বাদ দেয়	সময় পেলে
পত্রিকা	১০০%	৪৯.২৫%	৪.৬১%	১৮.৪৬%	১৩.৮৪%	১৩.৮৪%
টিভি	১০০%	৪৯.২৫%	৪.৬১%	১৫.৩৮%	১৮.৪৬%	১২.৩০%

জরিপে অংশগ্রহণকারী মানুষের মধ্যে অধিকাংশই দেশ-বিদেশের খবর জানতে চায়। দেখা যাচ্ছে, ৪৯.২৫% ব্যক্তি পত্রিকা এবং টিভি উভয় মাধ্যমের সংবাদ পড়ে ও শুনে-দেখে থাকে। ৪.৬১% কখনোই পত্রিকা পড়ে না, টিভিও দেখে না। এদের মধ্যে আবার ১৮.৪৬% পত্রিকার খবর পড়লেও তারা টিভির খবর দেখে না। কিন্তু ১৩.৮৪ভাগ আবার পত্রিকা না পড়লেও তথ্য পিপাসা মেটাতে তারা টিভির খবর দেখে। বাকি ১৩.৮৪% আছে যারা কেবল সময় পেলে পত্রিকা পড়ে কিন্তু টিভির খবরও তারা দেখে না। অন্যদিকে ১৫.৩৮% টিভির খবর দেখলেও তারা পত্রিকার খবর পড়ে না। কিন্তু ১৮.৪৬ ভাগ আবার তথ্য পিপাসা মেটাতে টিভির খবর দেখলেও তারা পত্রিকা পড়ে না, কেবল টিভির ওপরই নির্ভরশীল। বাকি ১২.৩০% আছে যারা কেবল সময় পেলে বা মাঝে-মধ্যে টিভির খবর দেখলেও পত্রিকা পড়ে না।

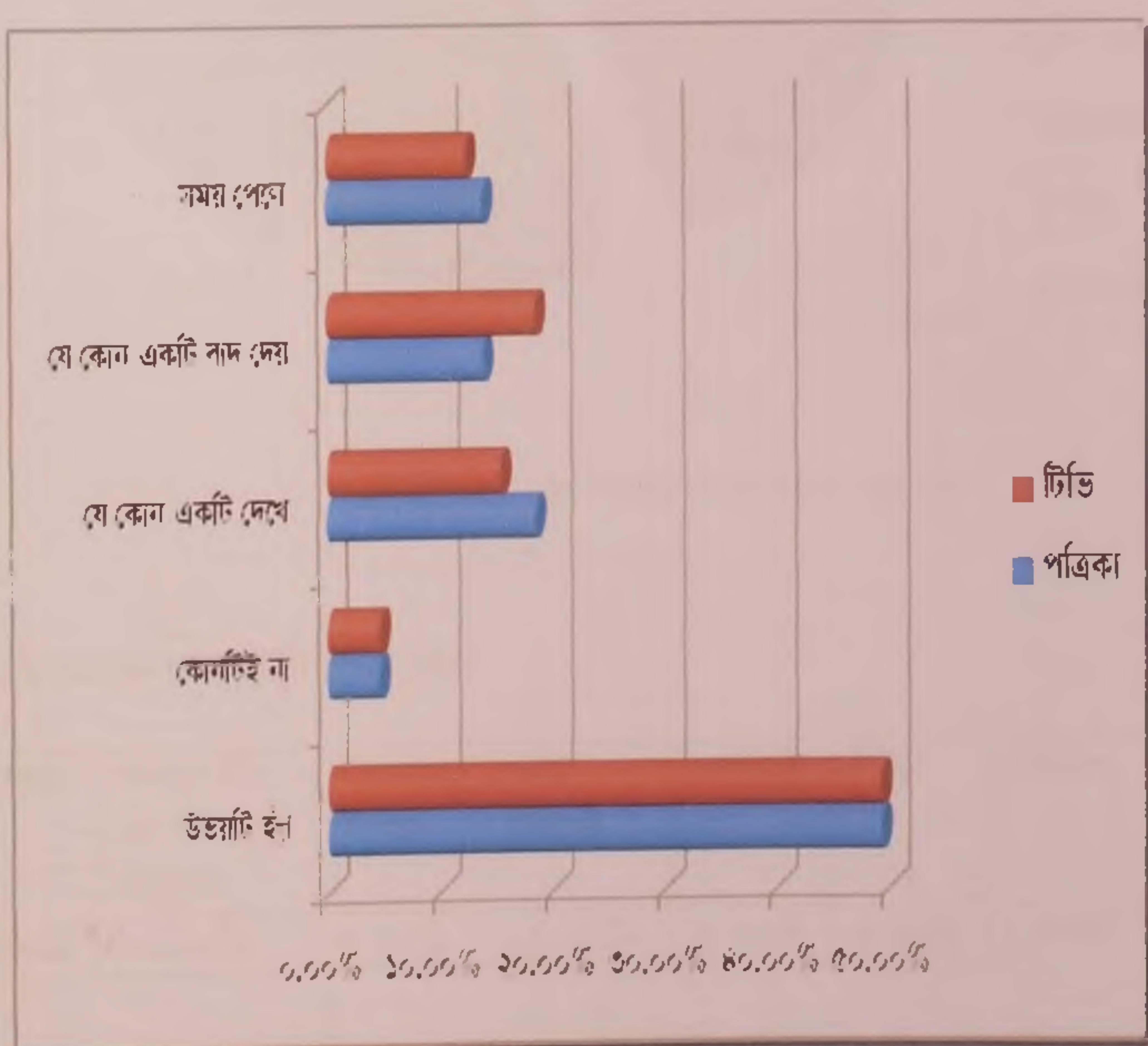

রেখা চিত্র-১ : সংবাদপত্র পাঠ ও টেলিভিশনের খবর শোনা-দেখা

Dhaka University Institutional Repository

সারণী দুই : যে পাতার খবর বেশি পড়া হয়

প্রথম/শেষ	খেলা	সম্পাদকীয়/ উপসম্পাদকীয়	বিনোদন/ ফিচার	আন্তর্জাতিক	অর্থনীতি	শিক্ষা	সবধরণের
৩৮.৪৬%	৪০%	১৮.৪৬%	৬.১৫%	১৮.৪৬%	৯.২৩%	৪.৬১%	৩৬.৯২%

পত্রিকার পাঠকদের মধ্যে খেলার খবরের পাঠক বেশি, ৪০%। এরপরে রয়েছে প্রথম ও শেষপাতা পড়ার প্রবণতা ৩৮.৪৬%। সবধরণের খবর পড়েন ৩৬.৯২%। এছাড়া সম্পাদকীয় পড়ে ১৮.৪৬%, বিনোদন ও ফিচারধর্মী লেখা পড়ে ৬.১৫%, আন্তর্জাতিক খবর পড়ে ১৮.৪৬%, অর্থনীতির খবর পড়ে ৯.২৩%। সবচেয়ে কম পাঠক শিক্ষা সংক্রান্ত খবরের মাত্র ৪.৬১%।

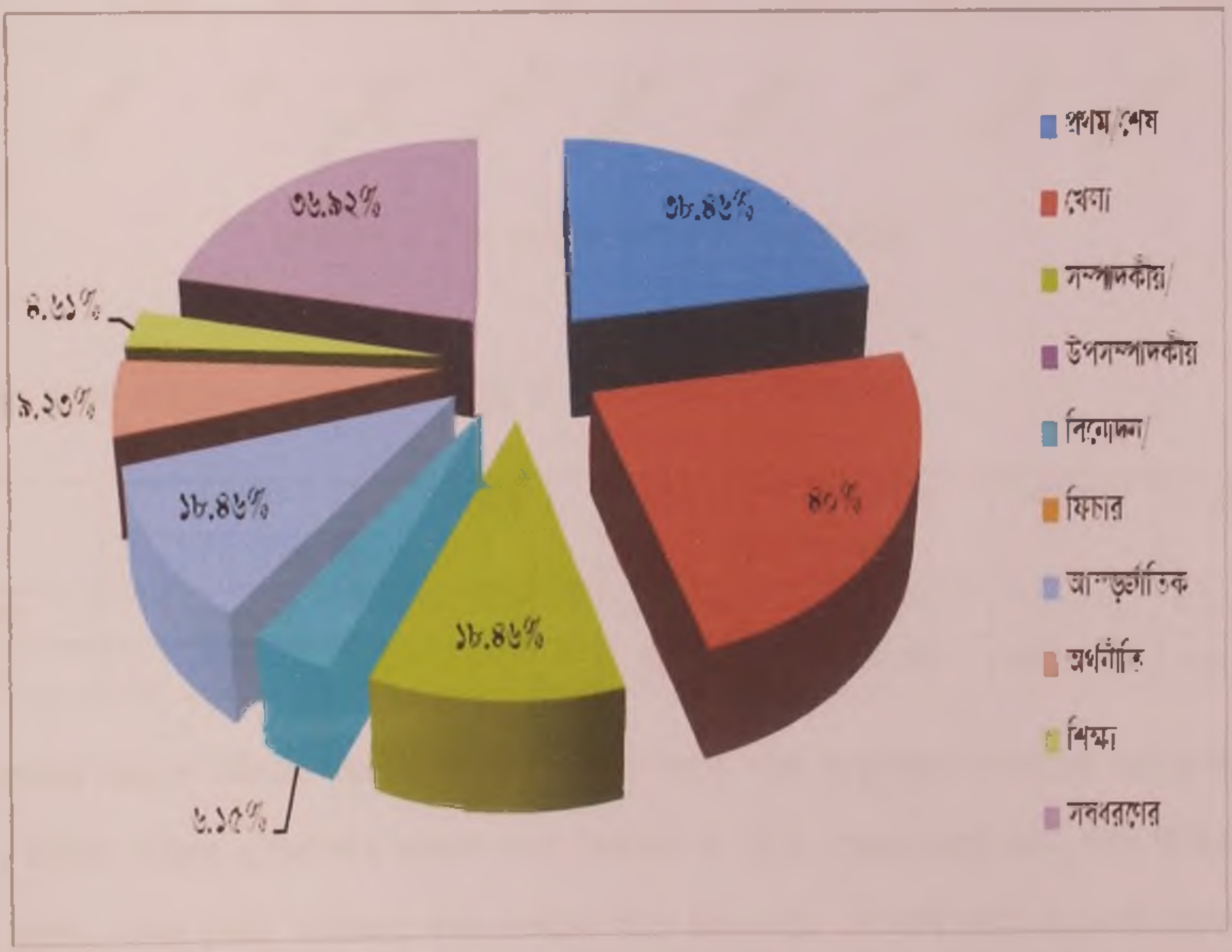

রেখা চিত্র-২ : যে পাতার খবর বেশি পড়া হয়

সারণী তিন : যে ধরণের খবর বেশি দেখে থাকে

রাজনীতি	খেলা	সম্পাদকীয় সহ সিরিয়াস ধরণের	বিনোদন/ ফিচার	আন্ত র্জাতিক	অর্থনীতি	শিক্ষা	পরিবেশ	সবধরণের
৩৬.৯২%	৪০%	১৬.৯২%	৬.১৫%	১৬.৯২%	৯.২৩%	৪.৬১%	১.৫৩%	৩৮.৪৬%

টেলিভিশনের দর্শকদের মধ্যেও একইভাবে খেলার খবরের দর্শক বেশি, ৪০%। এরপরে রয়েছে সবধরণের খবর দেখার দর্শক সংখ্যা ৩৮.৪৬%। রাজনৈতিক খবরের প্রতি আগ্রহী ৩৬.৯২%। এছাড়া সিরিয়াস ধরণের

Dhaka University Institutional Repository

খবর দেখে ১৬.৯২%, বিনোদনধর্মী খবর দেখে ৬.১৫%, আন্তর্জাতিক ১৬.৯২%, অর্থনীতি ৯.২৩%, শিক্ষা সংক্রান্ত ৪.৬১%। সবচেয়ে কম দর্শক পরিবেশ সংক্রান্ত নিউজের দর্শক, ১.৫৩%।

রেখাচিত্র-৩ : যে ধরণের খবর বেশি দেখে থাকে

সারণী চার : মানুষ সাধারণত কখন পত্রিকা পড়ে বা টেভিলিশন দেখে থাকে?

	সকাল	বিকাল	রাতে	যখন সময় পাই	সারাক্ষণ	মোট
পত্রিকা	৬৩.০৭%	৩.০৭%	৩.০৭%	১০.৭৬%	১.৫৩%	৮১.৫৩%
টিভি			৪০%	১২.৩০%	২৪.৬১%	৭৬.৯২%

মানুষ সাধারণত সকালে পত্রিকা পড়তে চায়। বিকালে বা রাতে যারা পড়ে তারা সাধারণত ঢাকার বাইরের অধিবাসী। বিলম্বে পত্রিকা পৌছানোর কারণে তারা বিকালে বা রাতে পড়তে বাধ্য হয়। আর টিভির খবর দেখা হয় রাতে। দেখা গেছে, পত্রিকার খবর সকালে পড়ে ৬৩.০৭%, বিকালে পড়ে ৩.০৭% রাতে পড়ে ৩.০৭%। সময় পেলে পড়ে ১০.৭৬% আর সারাক্ষণ পড়ে ১.৫৩%। তথ্যদাতাদের মধ্যে সকাল ও বিকালে টিভির খবরের দর্শক পাওয়া যায়নি। তবে রাতে ৪০% মানুষ টিভির খবর দেখে। সময় পেলে টিভির খবর দেখে ১২.৩০%। অর্থ্যাৎ, এরা নিয়মিত দর্শক নয়। আর সারাক্ষণই টিভির খবর থেকে নিজেকে আপডেট রাখেন ২৪.৬১% লোক। মোটের ওপর পত্রিকা পাঠক ৮১.৫৩% আর টিভির খবরের দর্শক ৭৬.৬১%।

Dhaka University Institutional Repository

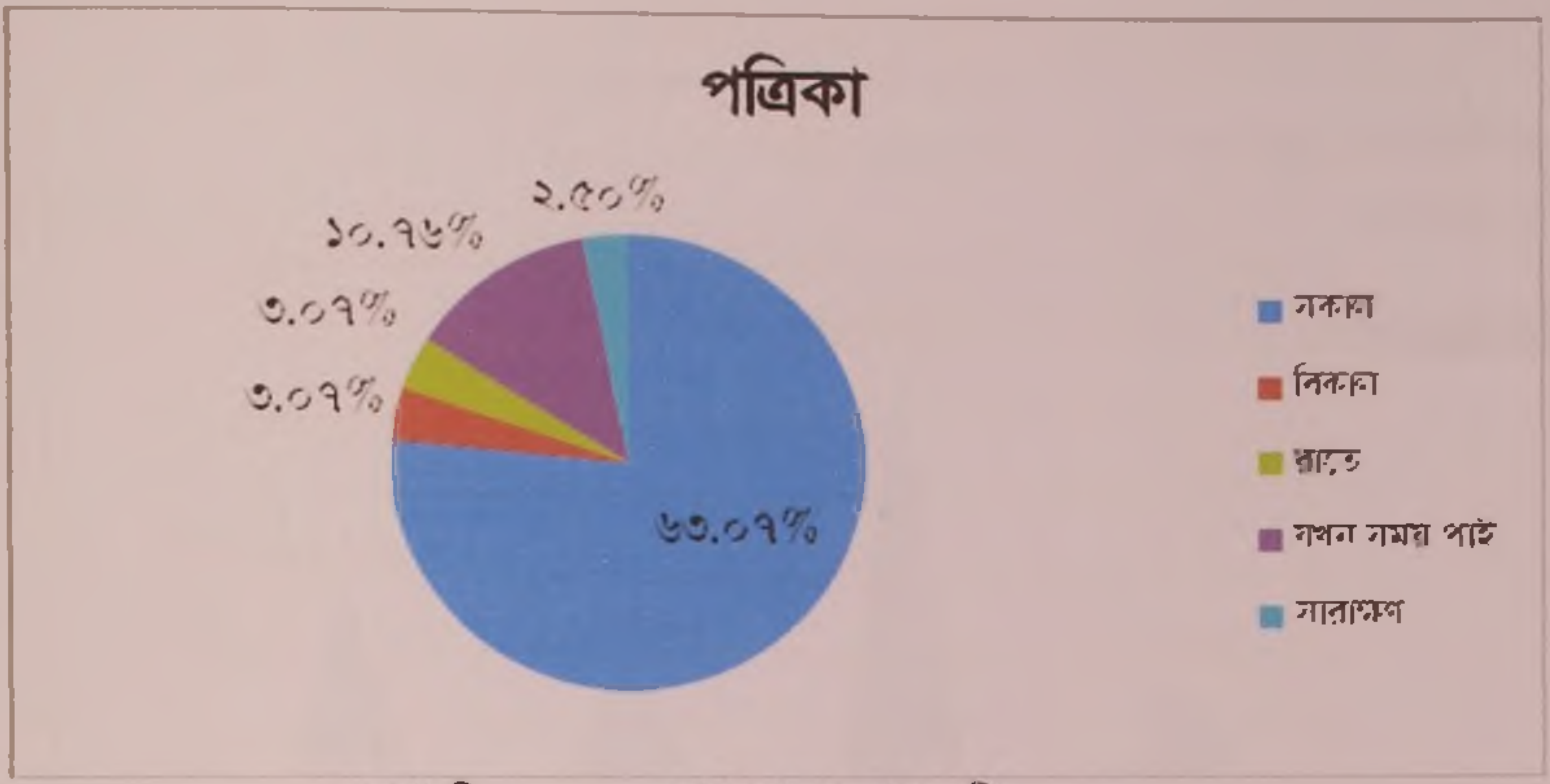

রেখা চিত্র-৪ মানুষ সাধারণত কখন পত্রিকা পড়ে

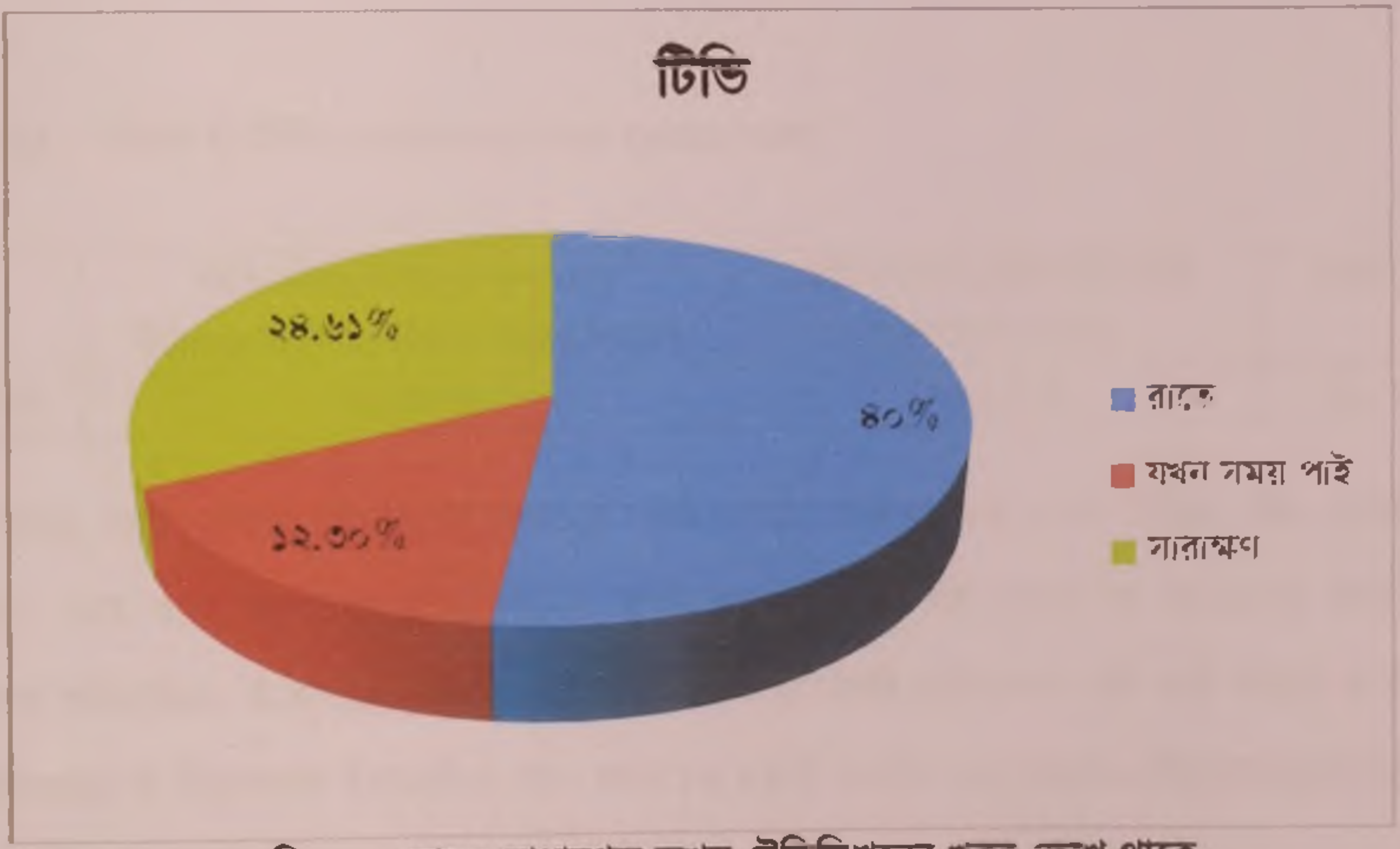

রেখা চিত্র-৫ : মানুষ সাধারণত কখন টেভিভিশনের খবর দেখে থাকে

সারণী পাঁচ : পত্রিকা ও টিভির খবর কখনো অসত্য মনে হয় কি না

হ্যাঁ	না	মাঝে-মধ্যে	মন্তব্য নাই
২৩.০৭%	১৩.৮৪%	৫২.৩০%	১০.৭৬%

টিভি ও পত্রিকায় প্রচারিত ও প্রকাশিত খবর কখনো কারো কাছে অসত্য মনে হয় কি না- এমনি প্রশ্নের জবাব দেন নি ১০.৭৬%। ৫২.৩০ভাগই মনে করেন মাঝে-মধ্যে খবর অসত্য মনে হয়। আর ২৩.০৭% সরাসরি বলেছেন হ্যাঁ, অসত্য খবর তারা প্রকাশ বা প্রচার করে। আর ১৩.৮৪%-এর কাছে টিভি-পত্রিকার খবর অসত্য মনে হয় না। অর্থ্যাৎ ৬৬ভাগেরও বেশি মানুষের টিভি-পত্রিকার খবরের সত্যাসত্য নিয়ে কমবেশি প্রশ্ন আছে।

Dhaka University Institutional Repository

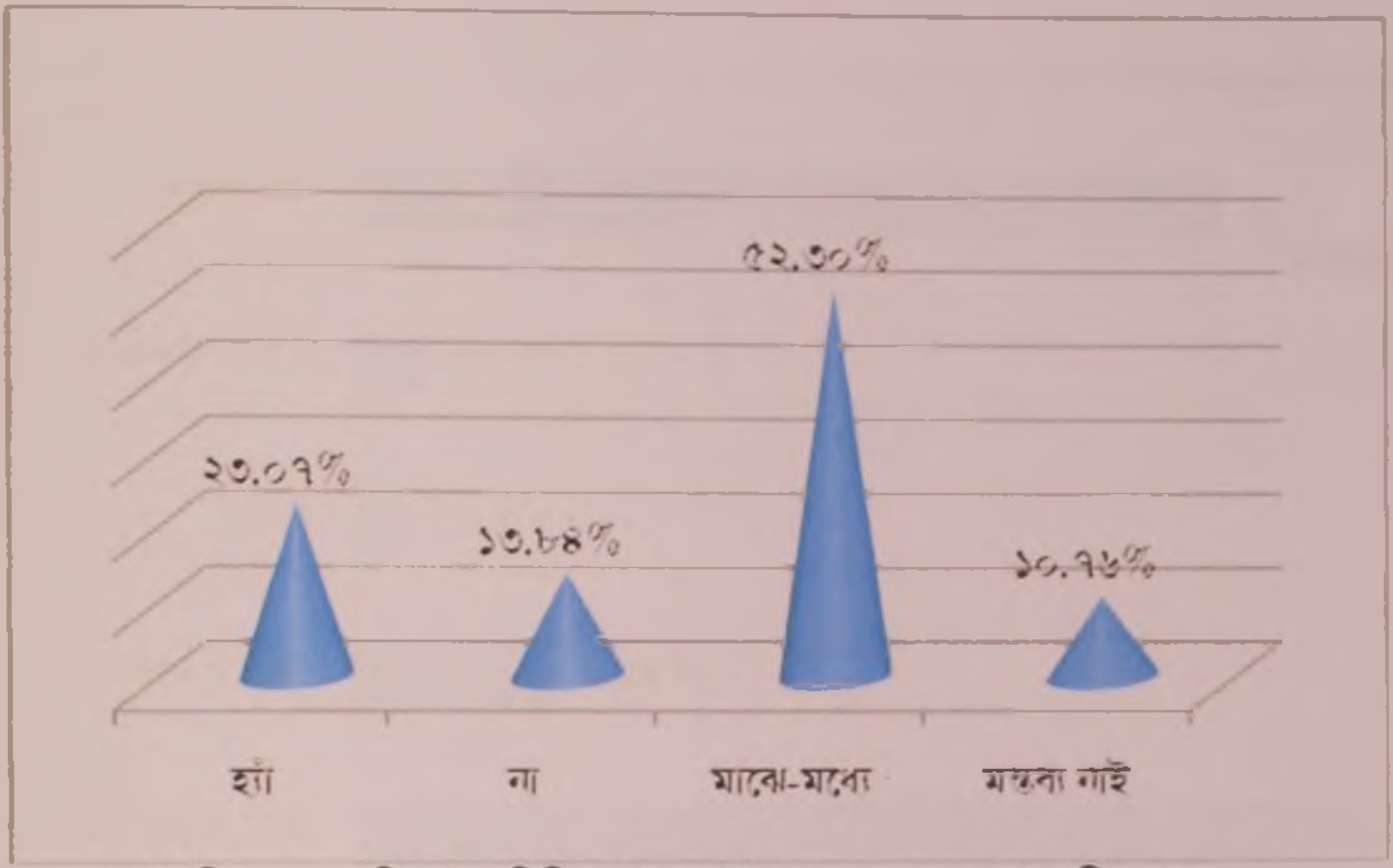

রেখা চিত্র-৬ : পত্রিকা ও টিভির খবর কখনো অসত্য মনে হয় কি না

সারণী ছয় : পত্রিকা বা টিভির খবর অসত্য মনে হওয়ার কারণ

	অতিরঞ্জিত/সত্যের অপলাপ/ উদ্দেশ্যপ্রণাদিত/মিডিয়া ভেদে ভিন্নতা	ত্রুটিপূর্ণ/তথ্যঘাটতি/বিভ্রান্তি কর/অসাবধানতা/	মন্তব্য নাই
শতকরা	১৫.৩৮%	১৩.৮৪%	৭০.৭৬%

দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৭১ভাগ মানুষই গণমাধ্যমের খবর অসত্য মনে হওয়ার কারণ চিহ্নিত করা থেকে বিরত রয়েছেন। আর যারা মন্তব্য করেছেন তাদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি লোকে বা ১৫.৩৮% মনে করেন গণমাধ্যম অতিরঞ্জিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সত্যের অপলাপ বা একই প্রতিবেদন এক এক পত্রিকা বা টিভিতে এক একভাবে বা ভিন্নতাসহ উপস্থাপিত হয়। আর ১৩.৮৪% লোকে মনে করেন প্রতিবেদনগুলো ত্রুটিপূর্ণ, তথ্যঘাটতি, বিভ্রান্তিকর ও অসাবধনতার সাথে তুলে ধরা হয়। ফলে সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

সারণী সাত : কোনও প্রতিবেদন অসত্য মনে হলে পাঠক-দর্শক কি করে

বিকল্প/অন্য পত্রিকা/টিভি	পদক্ষেপ নেয় না	সত্যাসত্য নিরূপনে ক্ষমতা নাই	উত্তর দানে বিরত	মন্তব্য নাই
৪৬.১৫%	৯.২৩%	১.৫৩%	৩.০৭%	৪০%

এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ৪০% লোকের কোন মন্তব্য নাই। আর খবরটি অসত্য মনে হলে ৪৬.১৫% লোক বিকল্প পন্থা গ্রহণ করে। অসত্য মনে হওয়ার পরও সঠিক তথ্য জানতে বিকল্প পদক্ষেপ নেয় না ৯.২৩ভাগ শিক্ষার্থী। আর ১.৫৩%-এর খবরের সত্যাসত্য নিরূপনের ক্ষমতাই নাই। এক্ষেত্রে উত্তর দানে বিরত ছিলেন ৩.০৭%।

Dhaka University Institutional Repository

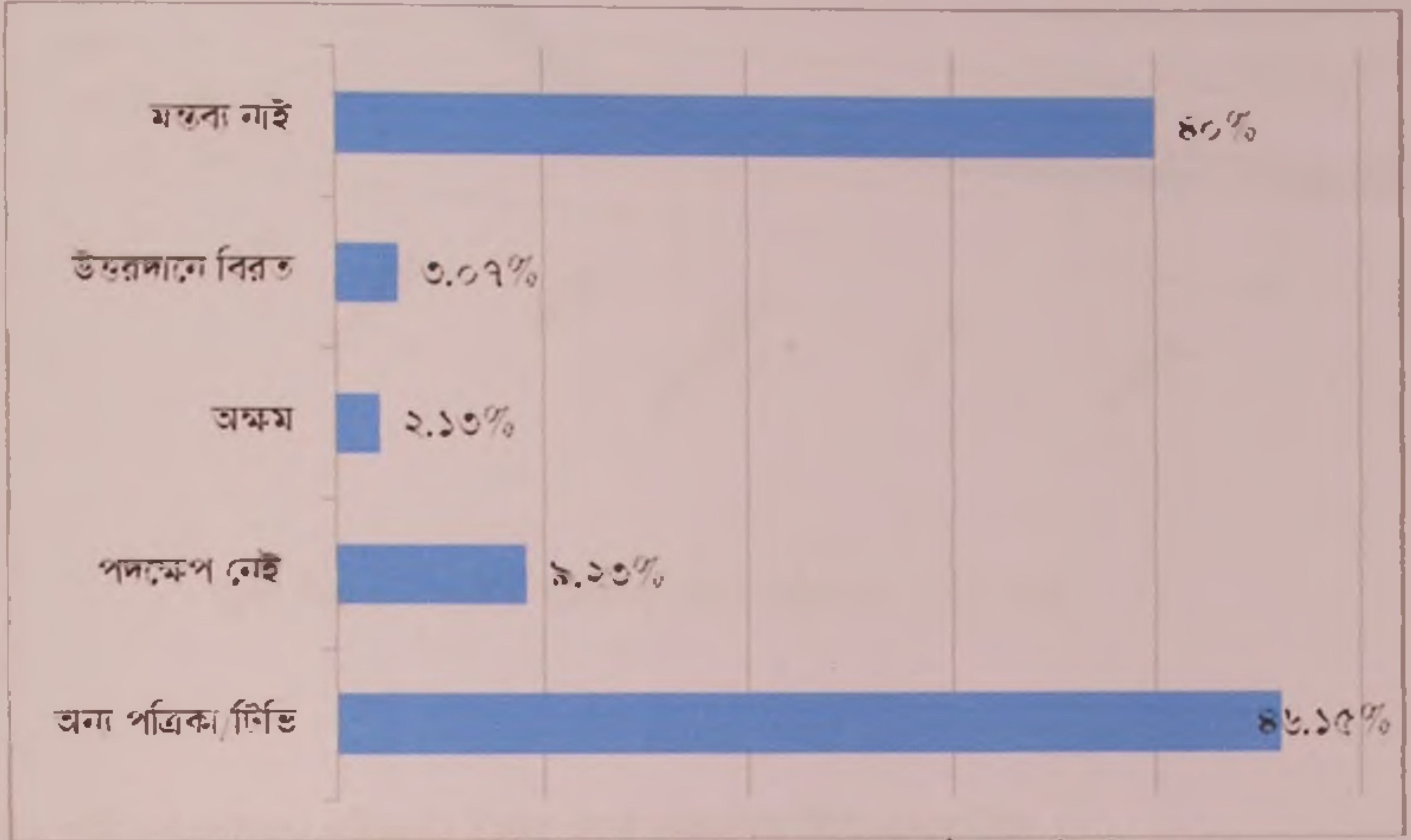

রেখা চিত্র-৭ : কোনও প্রতিবেদন অসত্য মনে হলে পাঠক-দর্শক কি করে

সারণী আট : পাঠক পত্রিকার কোন পৃষ্ঠাগুলো বেশি পড়ে

প্রথম/তৃতীয়/শেষপাতা (রাজনীতি/ দিনের আলোচিত ইস্যু বা ঘটনা/ বিশেষ রিপোর্ট/অপরাধ/দুর্নীতি)	খেলা	সম্পাদকীয়	ফিচার	আন্ত র্জাতিক	মফস্বল	জলবায়ু
১০০%	৪০%	৬০%	২০%	২০%	২০%	২০%

শতভাগ গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বই মনে করেন পাঠক পত্রিকার প্রথম, তৃতীয় ও শেষ পাতা বেশি পড়ে। আর নিউজ আইটেম বাছাইয়ে রাজনীতি, দিনের আলোচিত ইস্যু বা ঘটনা, অপরাধ, দুর্নীতি এব এবং বিশেষ রিপোর্ট বেশি পড়ে। ৪০% মনে করেন যে, পাঠকরা খেলার খবর বেশি পড়ে। ৬০% মনে করেন সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় বেশি পড়ে। ২০% মনে মফস্বল ও জলবায়ু সংক্রান্ত খবর বেশি পড়ে পাঠক।

Dhaka University Institutional Repository

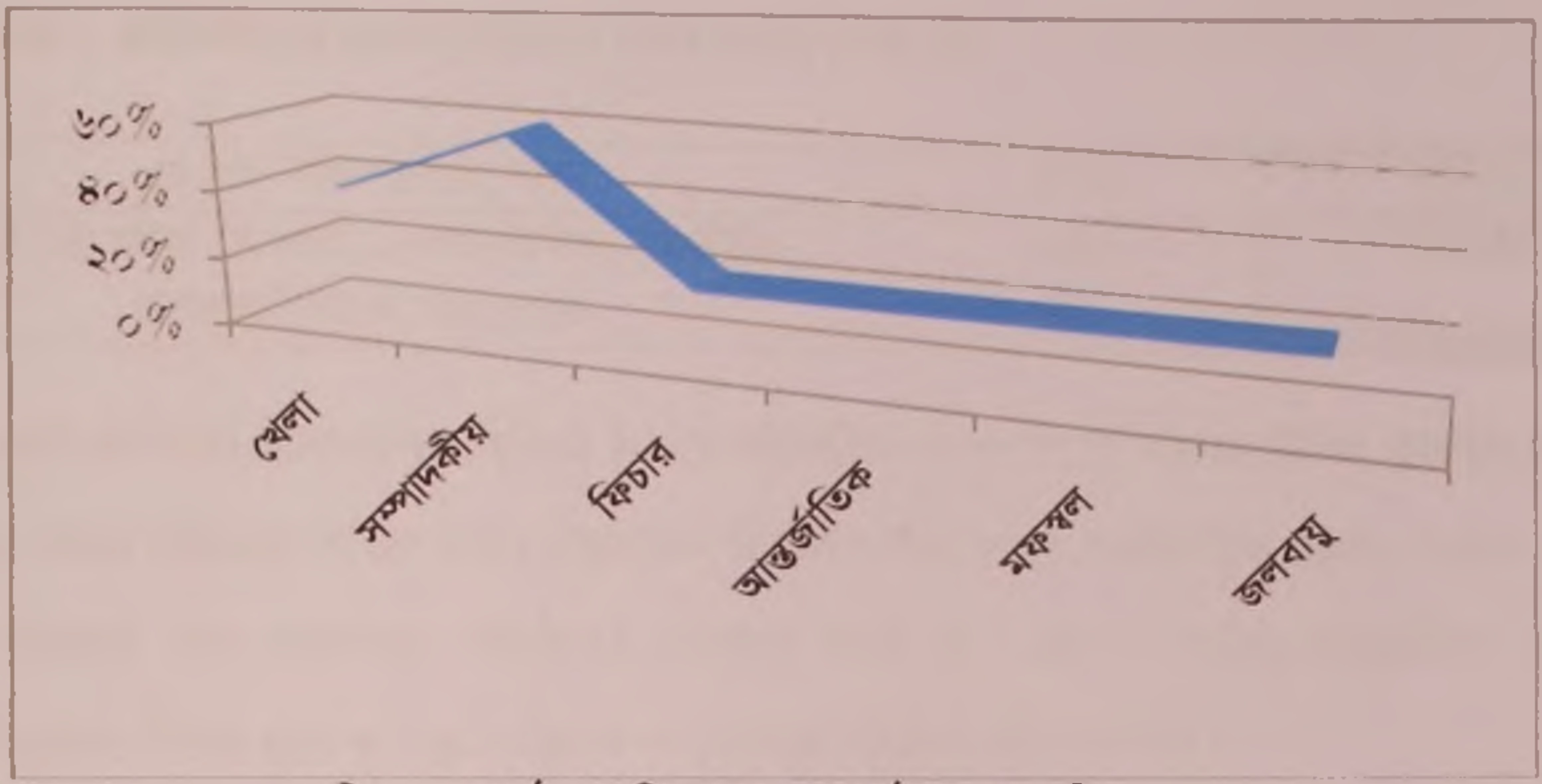

রেখা চিত্র-৮ : পাঠক পত্রিকার কোন পৃষ্ঠাগুলো বেশি পড়ে

সারণী নয় : পরিবেশ/জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর খবর সাধারণত ট্রিটমেন্টের চিত্র

প্রথম/শেষপাতা	ভেতরের পাতায়
জাতীয়-আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত/ব্রেকিং নিউজ বা বড় ইভেন্ট ও ইস্যু	সভা-সমাবেশ-সেমিনার বা নিউজের গুরুত্ব অনুযায়ী
১০০%	১০০%

নিউজের গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থ হলো জায়গা নির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ নেই। রাজনৈতিক খবর যেমনি প্রথম বা শেষপাতা কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে অমর একুশে বইমেলার জন্য সাধারণত প্রায় সব দৈনিকই শেষ পৃষ্ঠা ছেড়ে দেয়, এ ক্ষেত্রে সচরাচর তেমন গুরুত্ব পায় না। তবে প্রথম ও শেষপাতায় নিউজের ক্ষেত্রে পাঠক আগ্রহ, ব্রেকিং/বিশেষ নিউজ আইটেম ইত্যাদি বিবেচনা হয়।

সারণী দশ : দর্শকরা কোন কোন সময়ে টিভির খবর বেশি দেখে থাকে

মিডিয়া	সারাদিন	প্রাইম টাইম	সারাদিন-রাত
টিভি (বিটিভি)	--	১০০%	--
টিভি (স্যাটেলাইট)	--	১০০%	--
রেডিও(বেসরকারি)	--	--	১০০%
রেডিও (রাষ্ট্রায়ত্ব)	--	--	১০০%

টেলিভিশন মাধ্যমের কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন মানুষ সাধারণত প্রাইমটাইমে বা সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত টিভির খবর দেখে। আর রেডিও স্টেশনের একজন নীতি-নির্ধারকের সাক্ষাতকার নেয়া হয়। তাদের মতে, শ্রোতারা বলতে গেলে দিন-রাত সারাক্ষণ সময় পেলেই রেডিও শোনে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী এগার : প্রাইমটাইমে যেসব নিউজকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়

যে সব নিউজ গুরুত্ব পায়	সংখ্যা	শতকরা
দিনের বড় ঘটনা তা জাতীয়-আন্তর্জাতিক, রাজনীতি, অপরাধ ইত্যাদি হতে পারে	৩জন	১০০%

টিভি ও রেডিওর মতো ইলেকট্রনিক মিডিয়া দিনের আলোচিত ঘটনা দিয়েই তাদের নিউজ বুলেটিন সাজিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে নিউজের বিভিন্ন অংশে (বিজ্ঞাপন বিরতিকে ভাগ ধরে) আন্তর্জাতিক, খেলা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়মিত ভাগ থাকলেও পরিবেশের ব্যাপারে থাকে না। কেবল জাতীয়-আন্তর্জাতিক অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং নিউজ হলে বা সভা-সমাবেশ ও সেমিনার থাকলে কাভারেজ হয়।

সারণী বার : পরিবেশ/জলবায়ু সংক্রান্ত সংবাদ ট্রিটমেন্ট দেয়ার পলিসি

পরিবেশ ইস্যু	সংখ্যা	শতকরা
গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং নিউজ হলে বা সভা-সমাবেশ ও সেমিনার থাকলে	৩জন	১০০%

শতভাগেরই জবাব হচ্ছে, কেবল জাতীয়-আন্তর্জাতিক অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং নিউজ হলে বা সভা-সমাবেশ ও সেমিনার থাকলে কাভারেজ হয়। অর্থ্যাৎ, সচরাচর রাজনৈতিক সংবাদের মতো প্রথম ও শেষপাতা বা তৃতীয় পাতায় ট্রিট্রমেন্ট দেয়া হয় না।

সারণী তের : পরিবেশ ইস্যুর খবর যে পরিমাণ কাভারেজ পাচ্ছে, তাতে জনগণ যথেষ্ট কি না

হ্যাঁ	না	কম পাচ্ছে	মোটামুটি	আনুষ্ঠানিক	কাভারেজ বোঝেন না/পত্রিকা পড়েন না	উত্তর দেন নি	মোট ও শতকরা
১৫.৩৮%	৫৩.৮৪%	৪.৬১%	৪.৬১%	১.৫৩	১২.৩০%	৭.৭৩%	১০০%

৫৩.৮৪% লোক মনে করে পরিবেশ ইস্যু গণমাধ্যমে যে পরিমাণ কাভারেজ পাচ্ছে, তা যথেষ্ট নয়। অবশ্য ১৫.৩৮% লোক মনে করে যথেষ্ট। তারা এতে সন্তুষ্ট। ৪.৬১% মানুষ মনে করে কম পাচ্ছে। একই সংখ্যক মনে করে মোটামুটি পাচ্ছে। ১.৫৩% মনে করে গণমাধ্যমের কাভারেজ আনুষ্ঠানিক। ১২.৩০% মানুষ কাভারেজ বিষয়টি বোঝে না বা তারা পত্রিকাই পড়ে না। আর ৭.৭৩% মানুষ প্রশ্নটির উত্তর দেয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

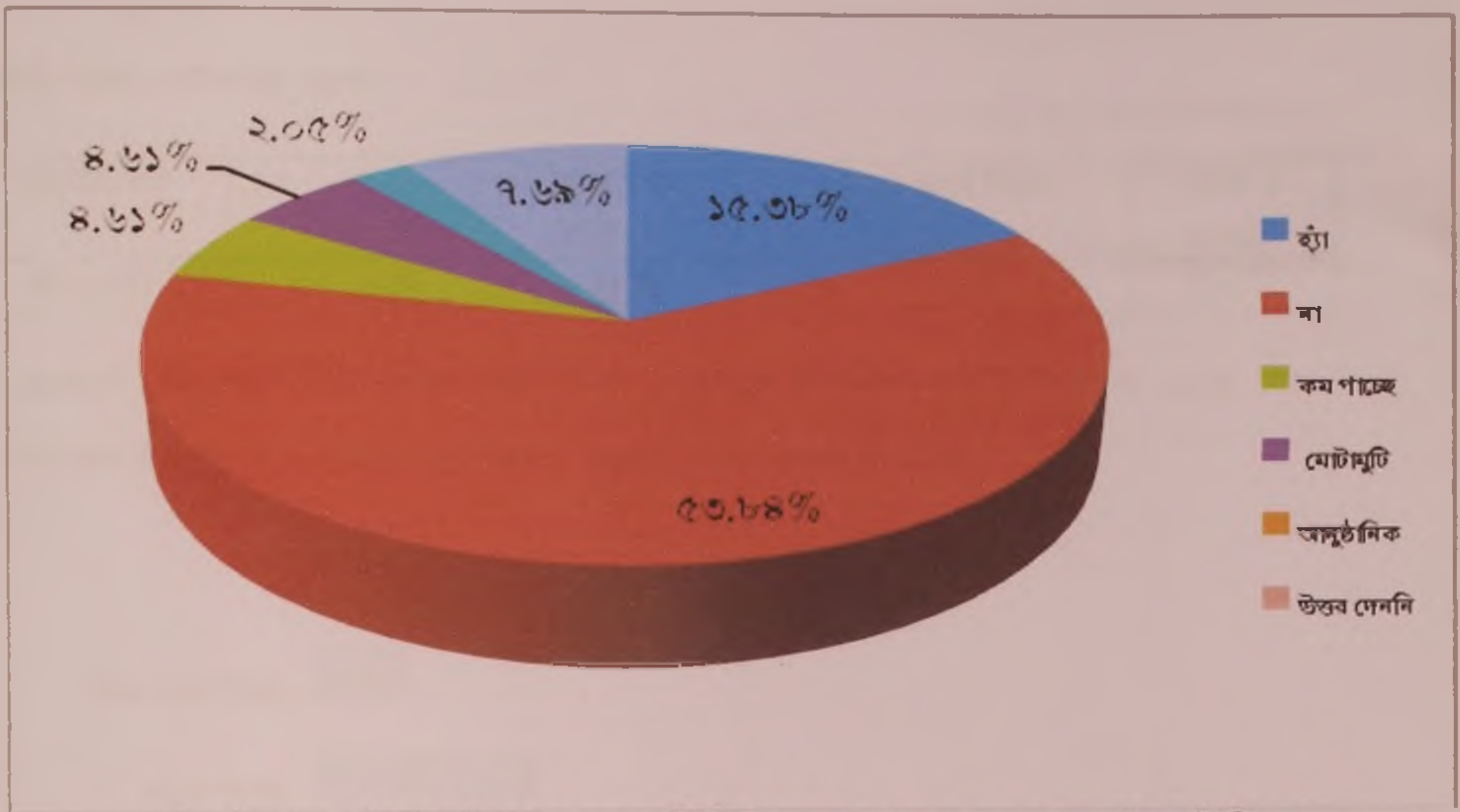

রেখা চিত্র-৯ : পরিবেশ ইস্যুর খবর যে পরিমাণ কাভারেজ পাচ্ছে, তাতে জনগণ সন্তুষ্ট কি না

সারণী চৌদ্দ : গণমাধ্যম তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে কিনা

হ্যাঁ	না	কম	মোটামুটি	মন্তব্য নাই	মোট ও শতকরা
১২.৩০%	৪৬.১৫%	১২.৩০%	৪.৬১%	২৪.৬১%	১০০%

পরিবেশের মতো জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গণমাধ্যমে যে পরিমাণ কাভারেজ পাচ্ছে, তাতে গণমাধ্যম যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না বলে মনে করে ৪৬.১৫% মানুষের। আর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে বলে মনে করে ১২.৩০%। প্রয়োজনের তুলনায় কম গুরত্ব দিচ্ছে বলে মনে করে ১২.৩০%। আর মোটামুটি কাভারেজ দিচ্ছে বলে মনে করে ৪.৬১%। ২৪.৬১% এ ব্যাপারে মতামত জানায় নি।

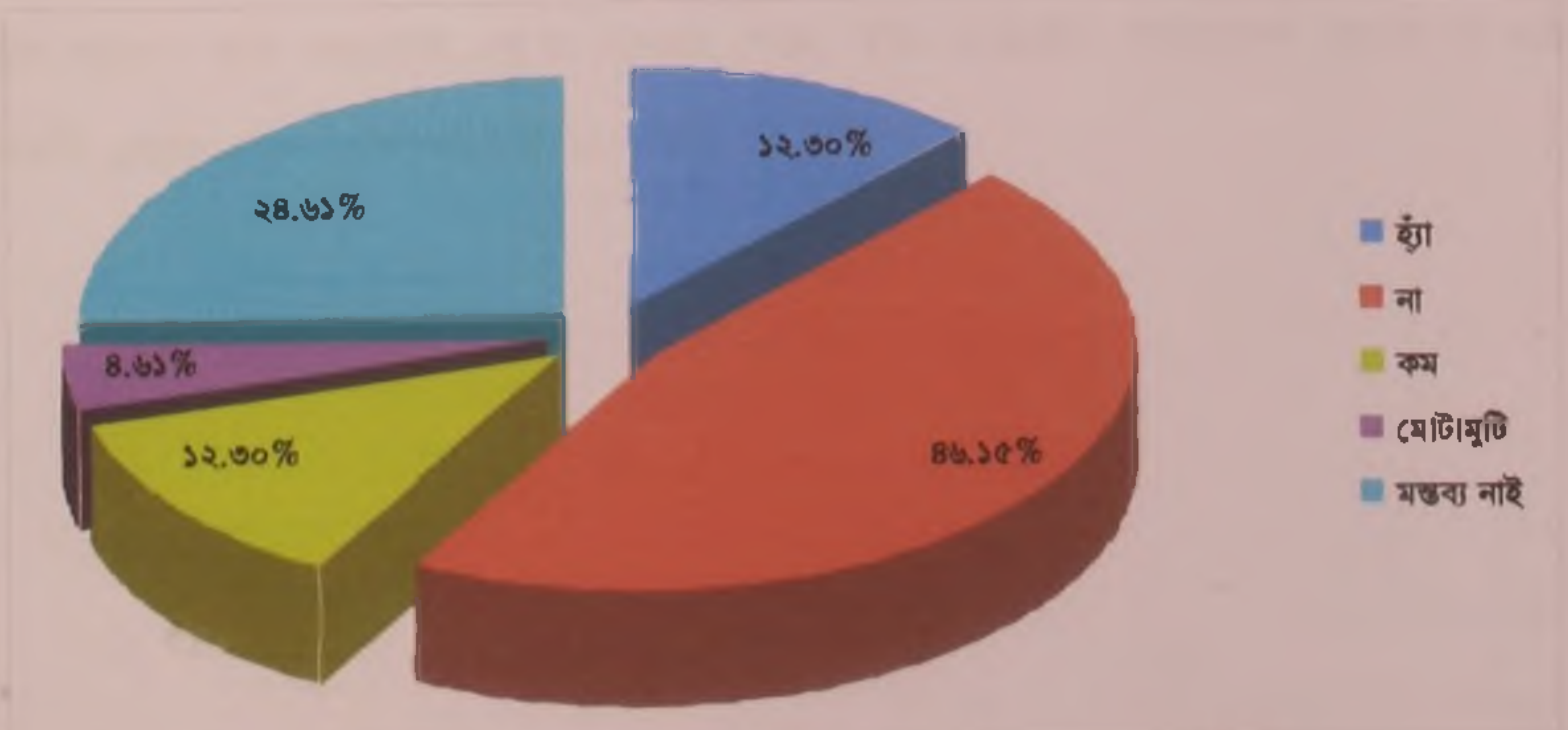

রেখা চিত্র-১০ : গণমাধ্যম তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে কিনা

Dhaka University Institutional Repository

সারণী পনের : বেতারের শ্রোতা

হ্যাঁ/নিয়মিত	না	মাঝে মাঝে/ সময় পেলে	উত্তর দানে বিরত	মোট ও শতকরা
৪১.৫৩%	৩০.৭৬%	২০%	৭.৬৯%	১০০%

৪১.৫৩ভাগ উত্তরদাতা নিয়মিত রেডিও শুনে থাকেন। ৩০.৭৬% উত্তরদাতা রেডিও শোনে না। ২০% লোক সময় পেলে বা মাঝে মধ্যে রেডিও শুনে থাকে। ৭.৬৯% ব্যক্তি উত্তরদান দেয়নি।

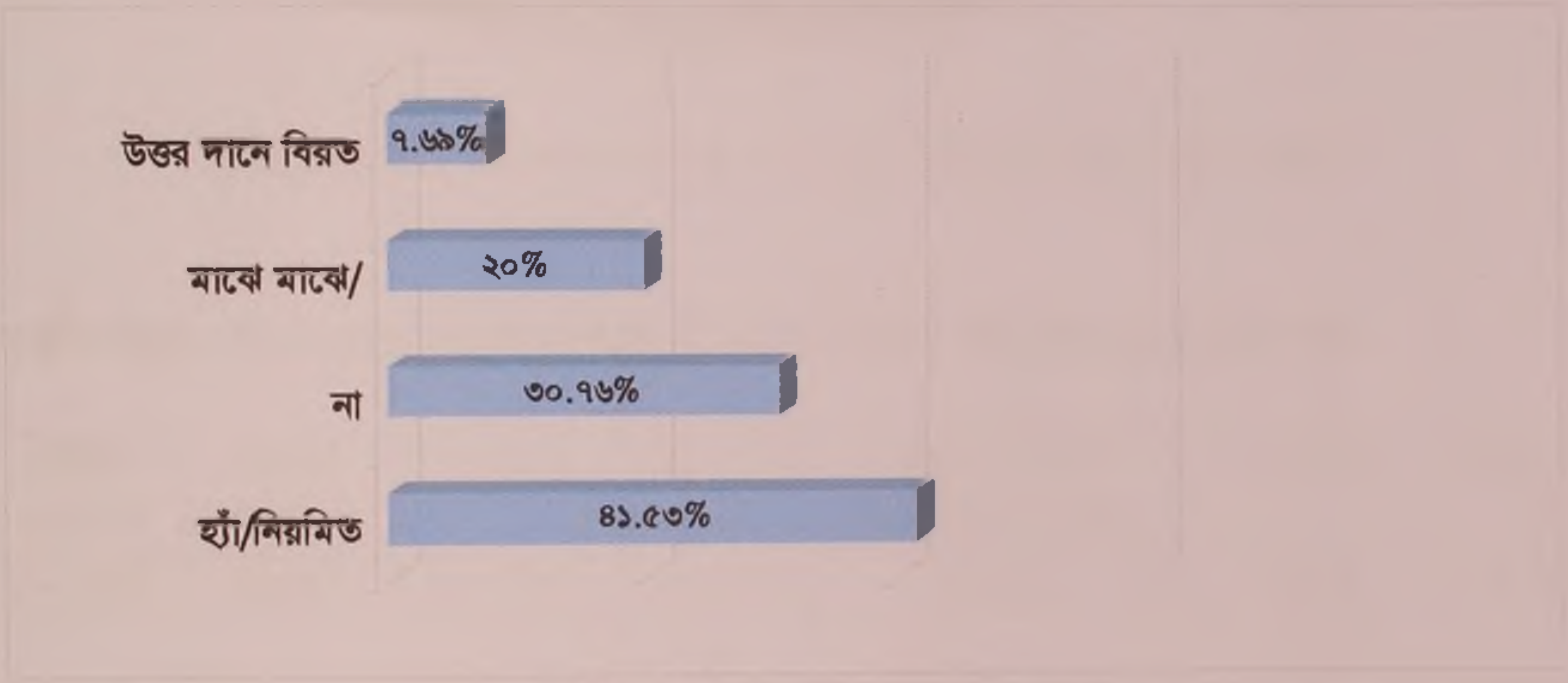

রেখা চিত্র-১১ : বেতারের শ্রোতা

সারণী ষোল : বাংলাদেশ বেতার ও এফএম রেডিও'র মধ্যে শ্রোতা সংখ্যা নির্ণয়

বেতার ও এফএম	এফএম	বেতার	কোনটিই না
১০.৭৬%	৪৬.১৫%	৪.৬১%	৩০.৭৬%

দেখা গেছে, মতামতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এফএম রেডিওর শ্রোতা বেশি। ৪৬.১৫% শ্রোতা এফএম রেডিও শুনে থাকে। আর বেতারের শ্রোতা পাওয়া গেছে, মাত্র ৪.৬১%। বাংলাদেশ বেতার ও এফএম রেডিও উভয়টি শোনে এমন শ্রোতা রয়েছে ১০.৭৬%।

Dhaka University Institutional Repository

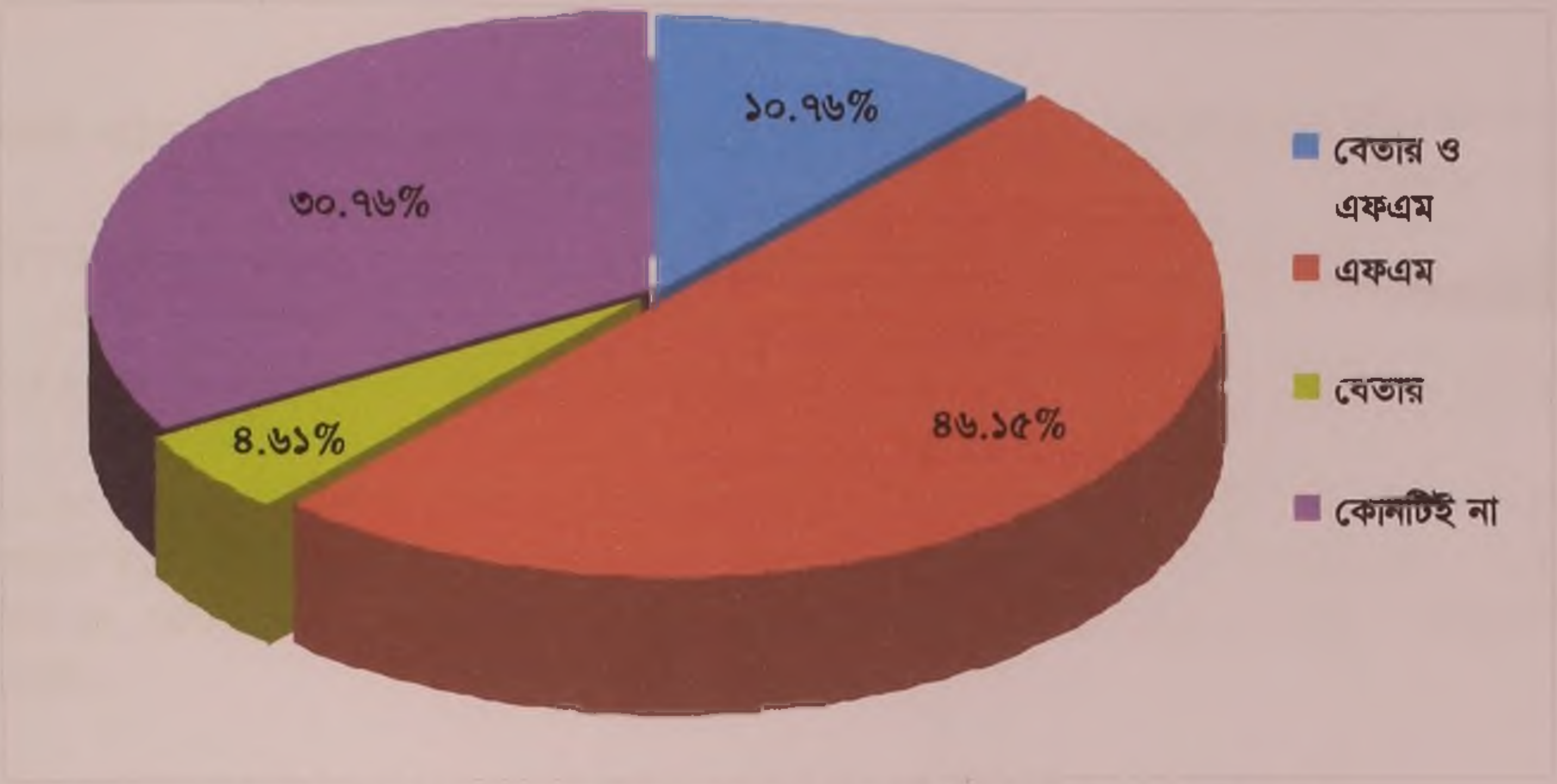

রেখা চিত্র-১২ : বাংলাদেশ বেতার না এফএম রেডিও'র মধ্যে শ্রোতা সংখ্যা

সারণী সতের : বাংলাদেশ টেলিভিশন পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে

বিটিভি দেখি না	কাভার করে না	কম করে	মোটামুটি	মন্ত্রীদের সংবাদ কাভার করে কেবল	জানেন না	উত্তর দেন নি
১৮.৪৬%	৪.৬১%	৩০.৭৬%	২১.৫৩%	৬.১৫%	৬.১৫%	১২.৩০%

২১.৫৩% লোক মনে করে বিটিভি পরিবেশ সংক্রান্ত খবর মোটামুটি কাভার করে। আর ৩০.৭৬% মনে করে কম কাভার করে। ১৮.৪৬% মানুষ বিটিভি দেখে না। যে কারণে তারা মন্তব্য করে নি। ৪.৬১% মনে করে বিটিভিতে এ সংক্রান্ত নিউজ কাভার হয় না। ৬.১৫% মনে বিটিভির পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদ মন্ত্রীদের প্রোগ্রাম কাভারেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আরও ৬.১৫% এ বিষয়টি জানে না। আর ১২.৩০% এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেননি।

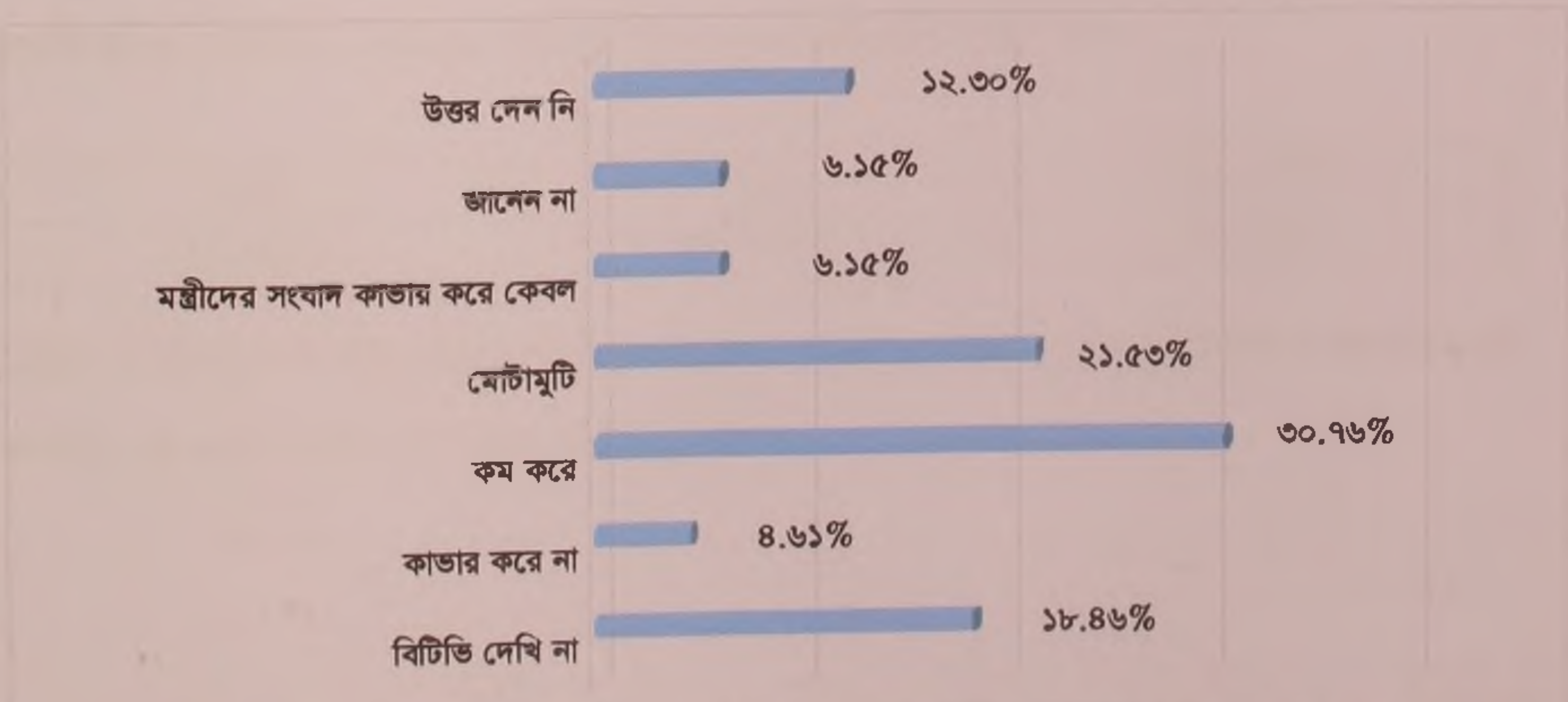

রেখা চিত্র-১৩ : বাংলাদেশ টেলিভিশন পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে

Dhaka University Institutional Repository

সারণী আঠার : বাংলাদেশ বেতার পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে

বেতার শুনি না	কাভার করে না	কম করে	মোটামুটি	মন্ত্রীদের সংবাদ কাভার করে কেবল	জানে না	উত্তর দেননি
৬১.৫৩%	৩.০৭%	৬.১৫%	৪.৬১%	৬.১৫%	৬.১৫%	১২.৩০%

৬১.৫৩% মানুষ বাংলাদেশ বেতার শোনে না। ৩.০৭% মনে করে পরিবেশ পরিবর্তন সংক্রান্ত খবর বেতার কাভার করে না। ৬.১৫ জানায়, কাভার করে, কম। ৪.৬১% বলেন যে, মোটামুটি কাভার করে। ৬.১৫% বলে যে, কেবল মন্ত্রী খবর কাভার করে। ৬.১৫% এ বিষয়টি জানে না, আর ১২.৩০% এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

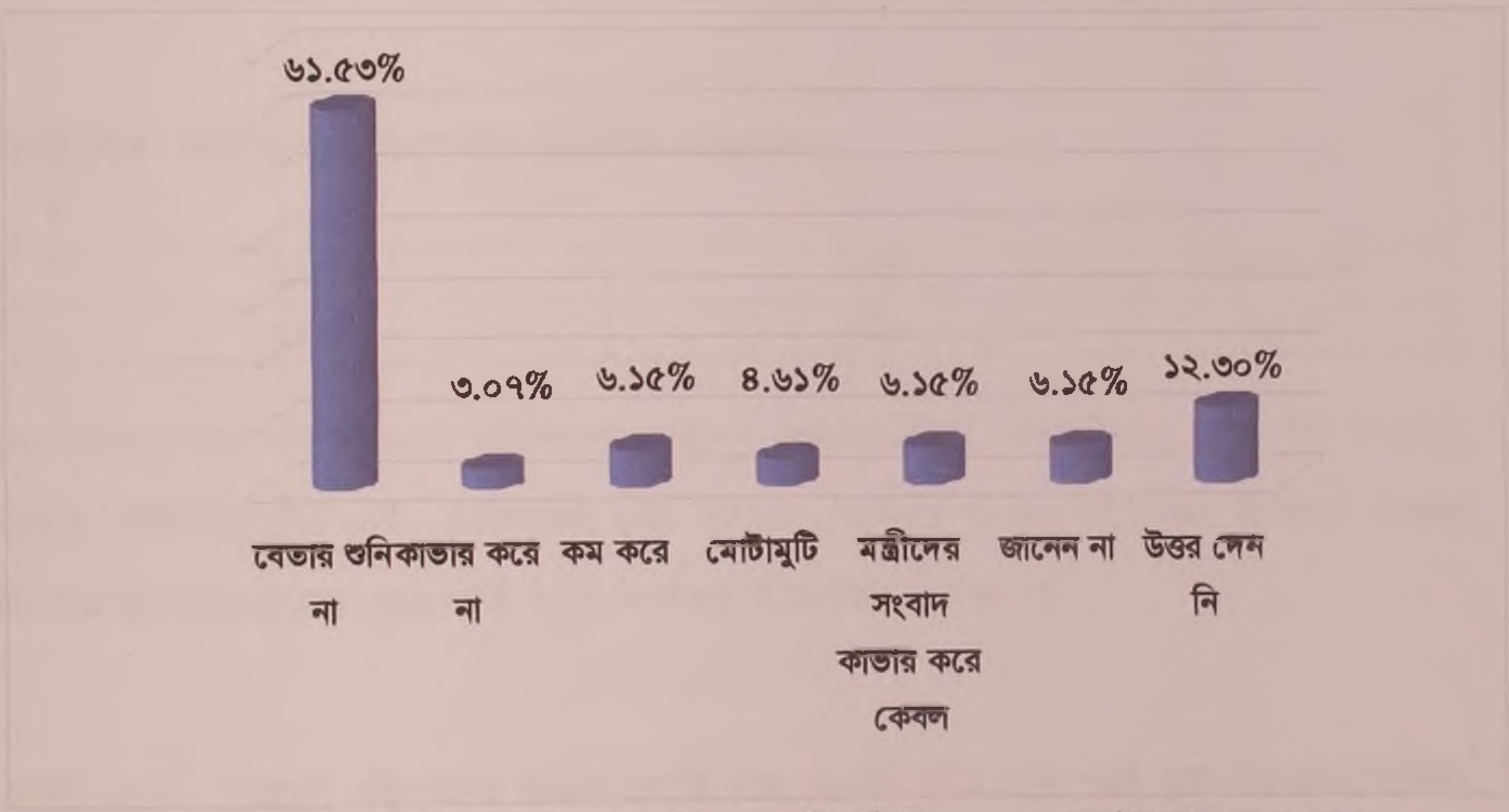

রেখা চিত্র-১৪ : বাংলাদেশ বেতার পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে

সারণী উনিশ : বিটিভি ও বেতারের পরিবেশ ইস্যুর খবর কাভারেজে সন্তুষ্ট কিনা

সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট	উত্তর দেয়নি
১৬.৯২%	৩৬.৯২%	৪৬.১৫%

বিটিভি ও বেতারের জলবায়ু ইস্যুর খবর কাভারেজে মাত্র ১৬.৯২% খুশি। আর এ ধরণের খবরে ৩৬.৯২% অসন্তুষ্ট। ৪৬.১৫% লোক এই প্রশ্নের জবাব দেয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

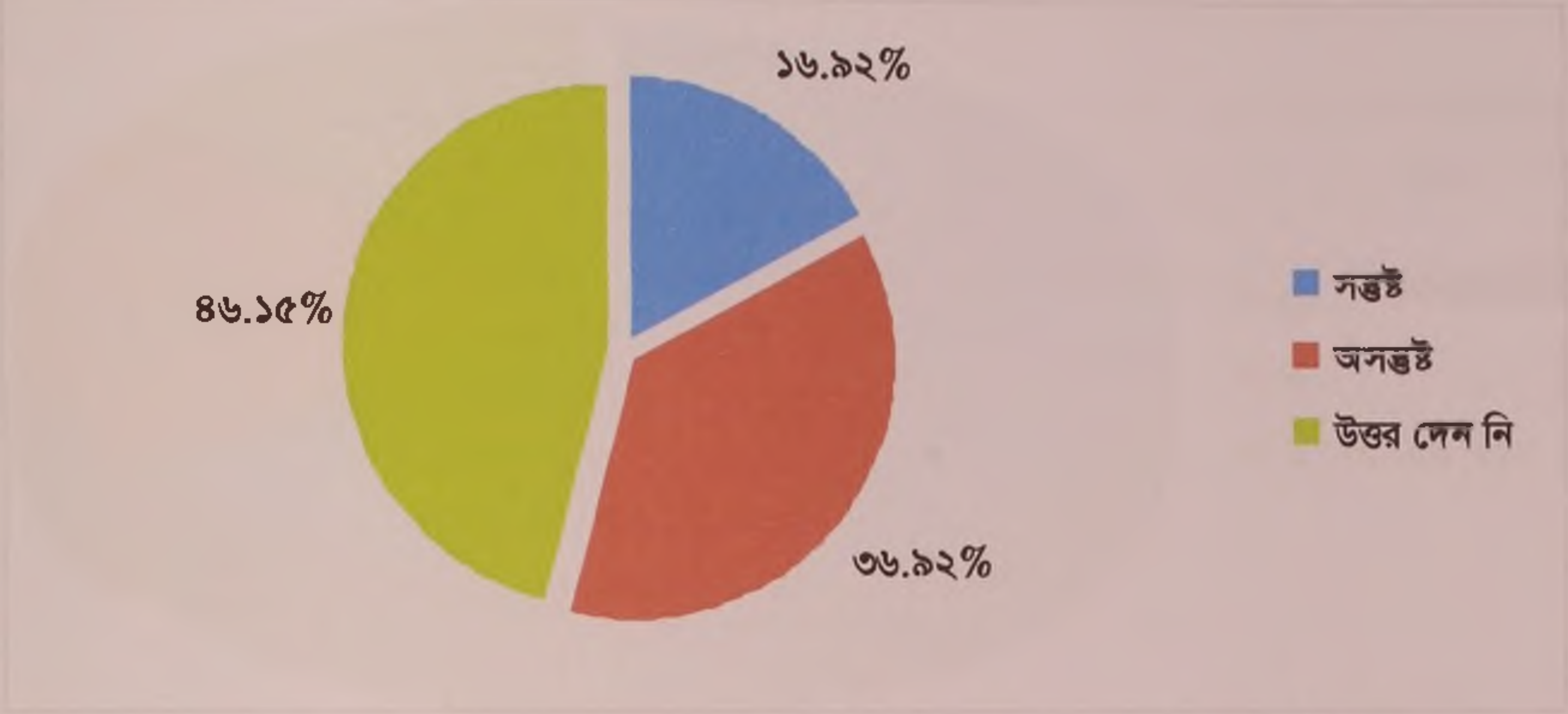

রেখা চিত্র-১৫ : বিটিভি ও বেতারের পরিবেশ ইস্যুর খবর কাভারেজে সন্তুষ্ট কিনা

সারণী বিশ : গণমাধ্যমে পরিবেশ বিটে রিপোর্টার আছে কিনা।

আছে	নেই	নিয়মিত নয়
৭৫%	০%	২৫%

দেখা যাচ্ছে, প্রায় সব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানেই পরিবেশ সংক্রান্ত নিউজ কাভার করার জন্য (বিট হিসাবে) দায়িত্ব নির্দিষ্ট রিপোর্টার নেই। একেবারেই নেই- তা নয়। এক্ষেত্রে ৭৫ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন, তাদের নিয়মিত রিপোর্টার রয়েছে। আর বাকি ২৫% বলেছেন, আছে কিন্তু নিয়মিত নয়।

সারণী একুশ : পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে দেশের প্রায় ১৮ভাগ ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভে ডুবে যাওয়াসহ জাতীয় সম্ভাব্য দুর্যোগের তথ্য জানার হার

হ্যাঁ	না	মন্তব্য দানে বিরত
৬৪.৫৮%	২০.৮৩%	১৪.৫৮%

পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে দেশের ভূ-খণ্ড ডুবে যাওয়াসহ বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবের তথ্য বেশির ভাগ লোকই জানে। মোট উত্তর দাতার মধ্যে ৬৪.৫৮% বিষয়গুলো জানে। ২০.৮৩% জানে না। আর ১৪.৫৮% মন্তব্য দানে বিরত ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

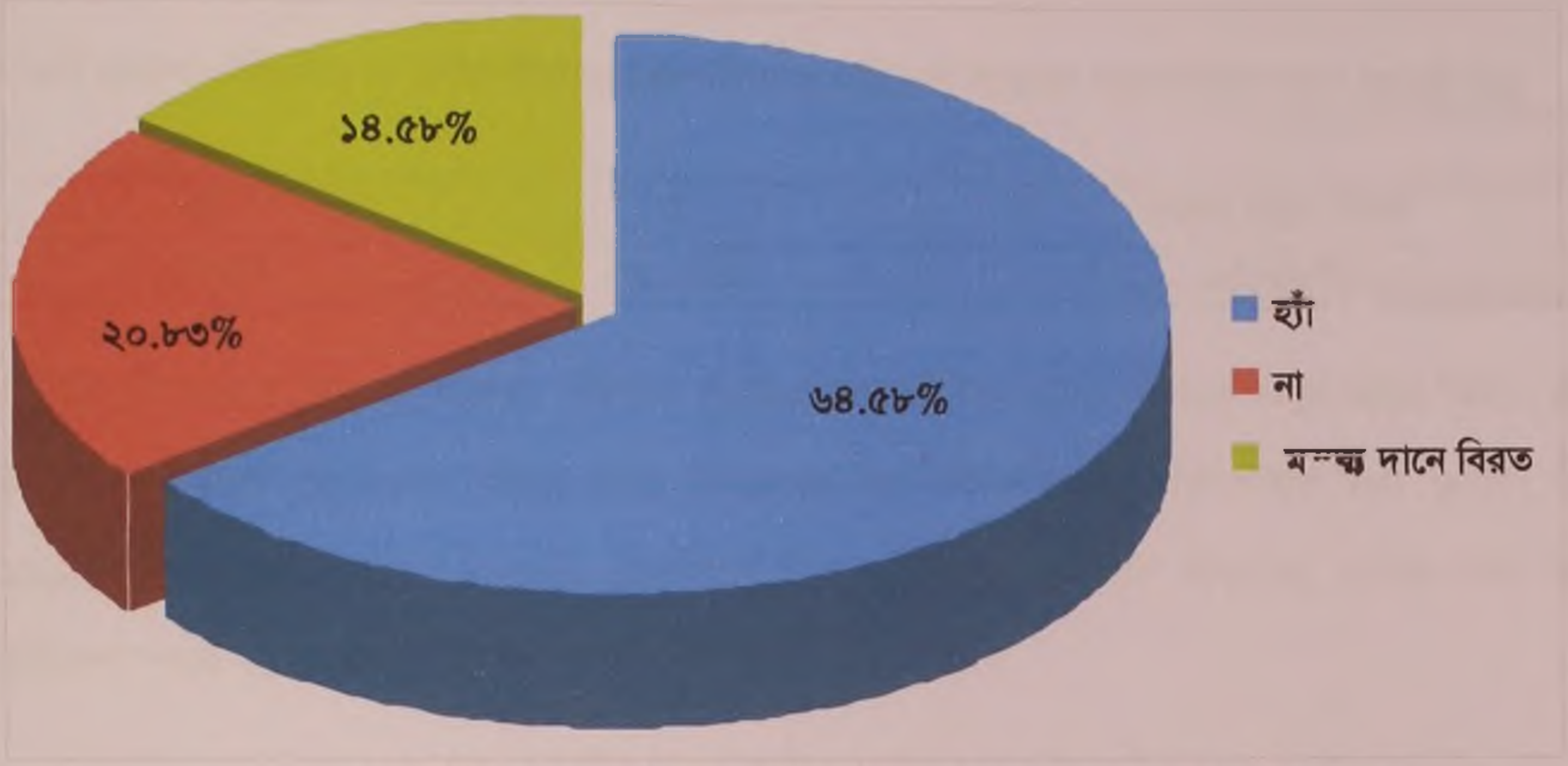

রেখা চিত্র- ১৬ : পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে প্রায় ১৮ভাগ ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভে ডুবে যাওয়াসহ নানা নেতিবাচকের প্রভাবের খবর জানার হার

সারণী বাইশ : যেসব মাধ্যম থেকে মানুষ পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য জেনে থাকে

পত্রিকা	টিভি	উভয় মাধ্যম	রেডিও	ইন্টারনেট	লোকমুখে	পাঠ্যবই/সাময়িকী
৩৫.৪৮%	৯.৬৭%	৩৫.৪৮%	৩.২২%	৩.২২%	৬.৪৫%	৬.৪৫%

পরিবেশ পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যগুলো পত্রিকা ও টিভি থেকে জেনেছে ৩৫.৩৮% লোক। এর বাইরে কেবল পত্রিকা থেকে জেনেছে ৩৫.৪৮% ও কেবল টিভি থেকে জেনেছে ৯.৬৭% লোক। রেডিও থেকে জেনেছে ৩.২২%, ইন্টারনেটে থেকে ৩.২২%, লোকমুখে ৬.৪৫% আর পাঠ্যবই ও সাময়িকী থেকে জেনেছে ৬.৪৫% লোক।

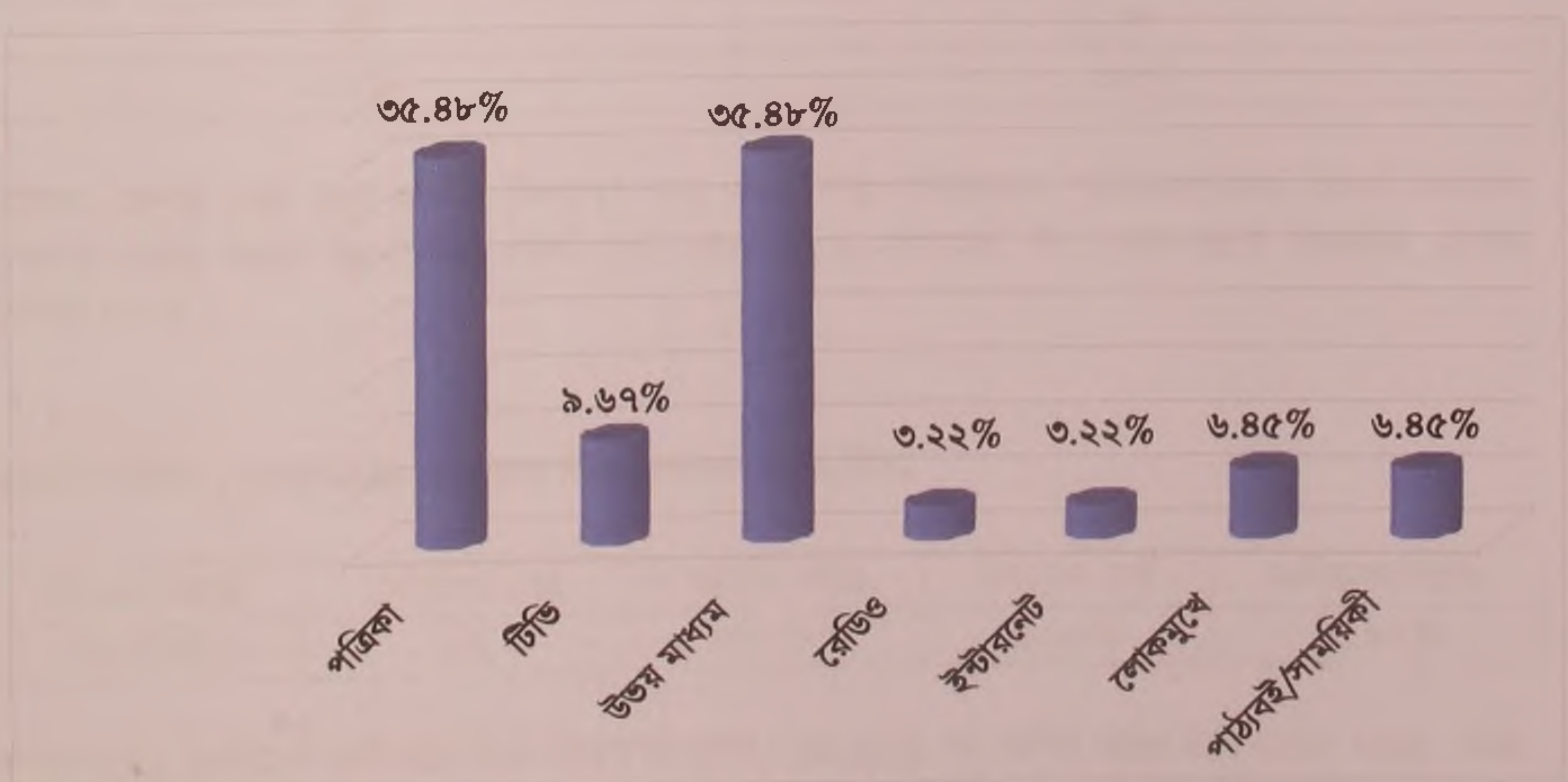

রেখা চিত্র- ১৭ : যেসব মাধ্যম থেকে মানুষ পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য জেনে থাকে

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তেইশ : হিমালয় ও এন্টার্কটিকার বরফ গলাসহ পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক তথ্য জানার হার

হ্যাঁ	না	মন্তব্য দানে বিরত
৫৬.২৫%	২৯.১৬%	১৪.৫৮%

এরপরে নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে, পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কে মানুষ জানে কিনা। মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৫৬.২৫% বলেছে তারা হিমালয়ের বা এন্টার্কটিকার বরফ গলার তথ্য জানে। কিন্তু ২৯.৯৬% জানে না। আর ১৪.৫৮% উত্তরদানে বিরত ছিলো। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, বেশির ভাগ মানুষ পরিবেশ স্পর্কে জানে।

সারণী চব্বিশ : পরিবেশ পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংবাদ জানার মাধ্যম

পত্রিকা	টিভি	উভয় মাধ্যম	রেডিও	ইন্টারনেট	লোকমুখে	পাঠ্যবই/সাময়িকী
৩৭.০৩%	১৪.৮১%	৩৩.৩৩	০%	৩.০৭%	৩.০৭%	১১.১১%

পত্রিকা থেকেই বেশির ভাগ লোকে এ তথ্য জানে। এ হার ৩৭.০৩%। আর টিভি এবং পত্রিকা উভয় মাধ্যম থেকে জানে ৩৩.৩৩%। ইন্টারনেটে থেকে জেনেছে ৩.০৭%, লোকমুখে ৩.০৭% আর পাঠ্যবই ও সাময়িকী থেকে ১১.১১%।

সারণী পঁচিশ : বিজ্ঞাপন দেয় এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের পরিবেশ দুষণের রিপোর্ট সেন্সর হয় কিনা

হ্যাঁ	না
২৫%	৭৫%

এরপর দেখার চেষ্টা করা হয়েছে বিজ্ঞাপন দেয় এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশদুষণের রিপোর্ট প্রকাশে কোনও সেন্সর করতে হয় কিনা। এতে দেখা গেছে, ২৫% বলেছেন, হ্যাঁ। আর ৭৫% বলেছেন, সেন্সর করতে হয় না।

সারণী ছাব্বিশ : গণমাধ্যমের দেশপ্রেম নিয়ে মতামত আছে কিনা।

দেশপ্রেম আছে	দেশপ্রেম নেই	ঘাটতি আছে	মতামত নেই	অনিচ্ছুক/বিব্রত
৪৪.৬১%	০%	৩৩.৮৪%	৪.৬১%	১৬.৯২%

গণমাধ্যমের দেশপ্রেম নেই বলে মনে করেন না কেউ। ৪৪.৬১% বা বেশির ভাগে মনে করেন আছে। কিন্তু ৩৩.৮৪% মনে করেন দেশপ্রেমে ঘাটতি আছে। ১৬.৯২% মতামত প্রদানে অনিচ্ছুক বা বিব্রত। আর ৪.৬১%-এর মতামত নেই।

Dhaka University Institutional Repository

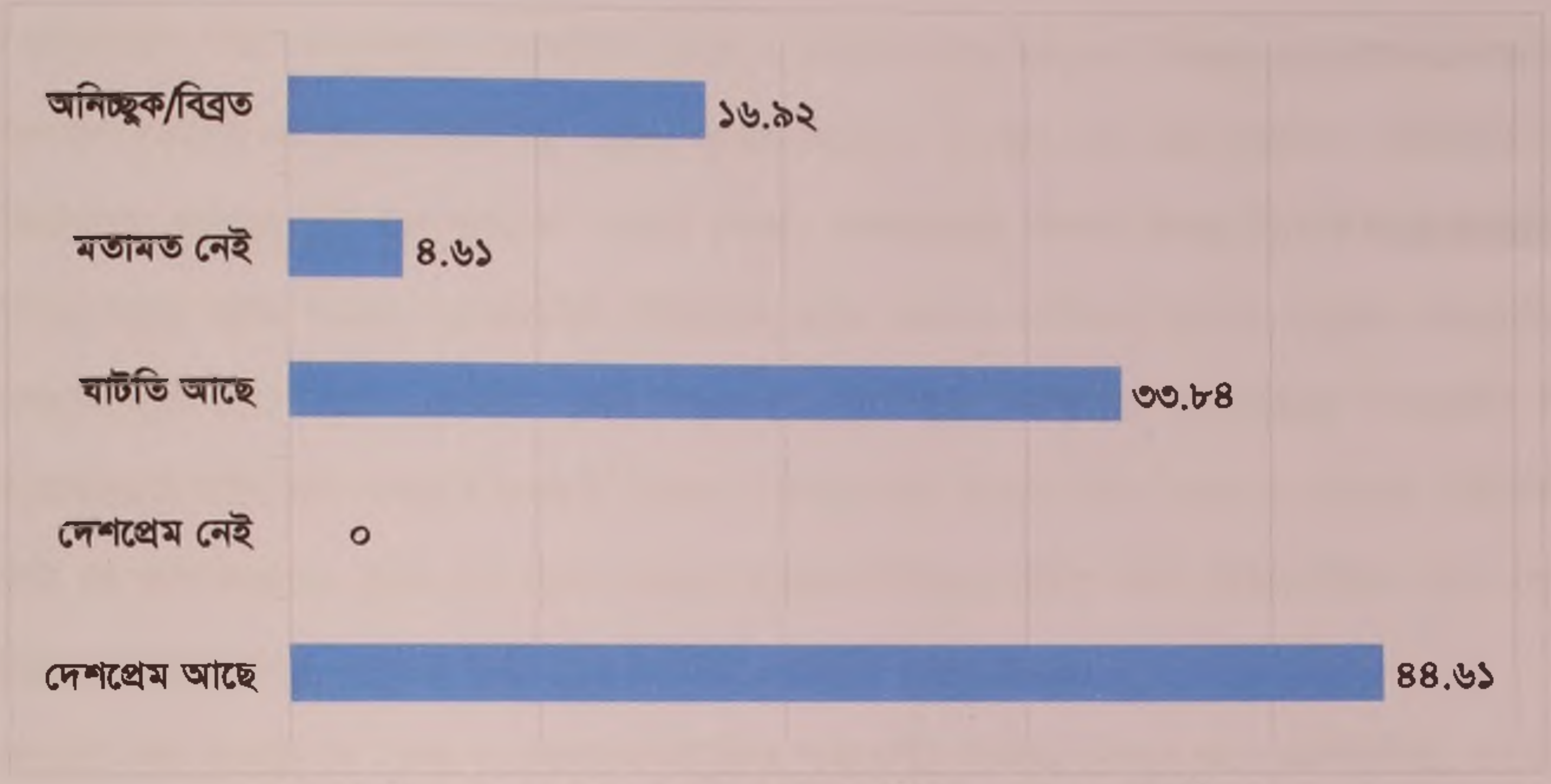

রেখা চিত্র- ১৮ : গণমাধ্যমের দেশপ্রেম নিয়ে মতামত আছে কিনা

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.২ গবেষণা ফলাফল

"বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা : একটি নৈতিক বিশ্লেষণ" বিষয়ে এ গবেষণায় বেশ কিছু ফলাফল বেরিয়ে এসেছে। বেশ কিছু প্রশ্নকে মাথায় নিয়ে এ গবেষণা শুরু করা হয়েছিল। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ফলাফলগুলো পাওয়া গেছে। গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন পত্রিকা, স্যাটেলাইট টেলিভিশন আর এফএম রেডিও'র কারণে মানুষের তথ্যপ্রাপ্তি ও তথ্যচাহিদায় বেশ উন্নতি এনেছে। সেই সাথে যুগ যুগ ধরে বিরাজমান গণমাধ্যমের অভ্যন্তরীণ কিছু সীমাবদ্ধতার ব্যাপারেও মানুষের অসন্তুষ্টি রয়েছে। যেহেতু অল্প সংখ্যক নমুনা থেকে এ গবেষণা পরিচালিত, তাই যে ফলাফলগুলো তুলে ধরা হলো সেগুলো হয়তো পত্রিকার পাঠক এবং রেডিও-টিভির দশক-শ্রোতা হিসেবে দেশের সমস্ত মানুষের পূর্ণাঙ্গ চিত্র না দিলেও কিছুটা ধারণা দেবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্য বিশেষ করে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট ও ইন্টারনেট মডেম, মোবাইল ফোন ইত্যাদির ব্যাপক বিস্তারের ফলে মানুষের তথ্যপ্রাপ্তি ও তথ্যচাহিদায় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ছাপাখানার আধুনিকায়ন, একমাত্র টেরিস্টিয়াল চ্যানেল বিটিভির পরিবর্তে বিভিন্ন স্যাটেলাইট টেলিভিশনের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ও বাংলাদেশ বেতারের পরিবর্তে এফএম রেডিওর প্রভূত উন্নতি মানুষের মাঝে এই পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছে। মানুষ দেশ-বিদেশের খবর জানতে চায়। এজন্য লোকমুখে নয়, তারা টিভি ও পত্রিকার দ্বারস্থ হয়। দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক মানুষ বা ৪৯.২৫% পত্রিকা এবং টিভি উভয় মাধ্যমের সংবাদ পড়ে ও শুনে-দেখে থাকে। সব মানুষের টিভি দেখার সক্ষমতা নাই। এ ক্ষেত্রে তথ্য জানার আগ্রহ থেকে ১৮.৪৬% মানুষ পত্রিকার খবর পড়ে, টিভি দেখে না। বিপরীত দিকে আবার ১৫.৩৮% শুধু টিভির খবর দেখে কিন্তু তারা পত্রিকা পড়ে না। অবশ্য কিছু মানুষ আছে যারা টিভি-পত্রিকা নিয়মিত দর্শক-পাঠক নয়, কেবল সময় পেলে টিভি-পত্রিকা নিয়ে বসে। এ ধরণের ১৩.৮৪% আছে (সময় পেলে) পত্রিকা পড়ে আর ১২.৩০% (সময় পেলে বা মাঝে-মধ্যে) টিভির খবর। কিন্তু এই যুগে ৪.৬১% লোক আছে যারা টিভি বা পত্রিকা কোন কিছুর খবরই দেখে না। প্রশ্ন করা হয়েছিলো মানুষ আসলে কেন পত্রিকা পড়ে বা টিভির খবর দেখেন? এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের উত্তরে ভিন্নতা পাওয়া গেছে। এ প্রশ্নের জবাবে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা বলেছেন যে, নিউজ প্ল্যানিং, কোন নিউজ মিস হয় কিনা বা লেখালেখির প্রয়োজনে তারা গণমাধ্যমের দ্বারস্থ হন। তবে সাধারণ মানুষ বলেছে, দেশ-বিদেশের সর্বশেষ খবর জানার জন্য তারা গণমাধ্যমের শরণাপন্ন হয়।

সেই পাকিস্তান আমল থেকেই আমাদের দেশে রাজনৈতিক খবরের পাঠক-দর্শক বেশি। একই অবস্থা সংবাদ কাভারেজ দেয়ার ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও এ অভ্যাসে পরিবর্তন হয়নি। এখনও এধরণের খবর সবচেয়ে বেশি কাভারেজ পায় (ফুয়াদ, ২০০৯ : ৩৪)। গবেষণায় দেখা যায়, গণমাধ্যম ম্যানেজারদের নিউজ কাভারেজ বা ট্রিটমেন্টে ঝোঁক না বদলালেও পাঠকদের খবর পড়ার রুচি বদলেছে। বর্তমানে খেলার খবরের পাঠক সবচেয়ে বেশি। এই হার ৪০%। মানুষের মধ্যে পত্রিকা পাঠে পছন্দ-অপছন্দের বিচারে পত্রিকার

Dhaka University Institutional Repository

পাতাও রয়েছে। প্রথম, তৃতীয় ও শেষপাতা বেশি পড়ার প্রবণতা রয়েছে ৩৮.৪৬% মানুষের। তবে ৩৬.৯২% লোক সবধরণের খবরই পড়েন। এ ক্ষেত্রে তারা প্রথম-শেষ পৃষ্ঠা থেকে মফস্বল সংবাদ পর্যন্ত ভালোভাবে পড়ার মাধ্যমে সারাদেশ সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন। সম্পাদকীয়/উপ-সম্পাদকীয়, কলাম লোকের সংখ্যাওবের করার চেষ্টা হয়েছে। এ ধরণের লোক ১৮.৪৬%। তবে বিনোদন ও ফিচারধর্মী রিপোর্ট ও লেখা প্রতি আগ্রহ অনেক কম মাত্র ৬.১৫%। এরচেয়ে বরং আন্তর্জাতিক খবর পড়ার প্রতি বেশি আগ্রহ বেশি দেখা যায়, ১৮.৪৬%। এরবাইরে ৯.২৩% মানুষ পাওয়া গেছে অর্থনৈতিক খবর পড়ার আগ্রহী। কিন্তু পরিবেশ সংক্রান্ত খবর পড়ার প্রতি বেশি আগ্রহ রয়েছে এমন লোক পাওয়া যায়নি। আলাপে উত্তরদাতারা বলেছে, এ ক্ষেত্রে খবরটি যদি প্রথম, তৃতীয় ও শেষপাতায় কাভারেজ পায় ও তাদের আকর্ষণ করে, তাহলে খবরটি তাদের পড়া হয়।

বর্তমানে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের দর্শক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। সুযোগ-সুবিধা থাকা সাপেক্ষে ইউনিয়ন পর্যন্ত স্যাটেলাইট বা ডিশ সংযোগের বিস্তার দেখা যায়। দিনদিন এধরণের দর্শকের সংখ্যা বাড়ছে। এরবাইরে বাংলাদেশ টেলিভিশন গোটা দেশ কাভার করছে। দেখা গেছে, টেলিভিশনের দর্শকদের মধ্যেও একইভাবে খেলার খবরের দর্শক বেশি, ৪০%। এরপরে রয়েছে সবধরণের খবর দেখার দর্শক সংখ্যা ৩৮.৪৬%। যদিও টিভির ক্ষেত্রে ইদানিং অর্থনীতি বা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, খেলা ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করে খবর কাভারেজ করতে দেখা যায়। কিন্তু টিভির খবরের ক্ষেত্রে সাধারণত বিজ্ঞাপন দেয়ার আগে পর্যন্ত যেসব খবর সাজানো হয়, তাই দেখে থাকে দর্শকরা। এরপরও রাজনৈতিক খবরের প্রতি আগ্রহী এমন ৩৬.৯২% লোক পাওয়া গেছে। এছাড়া সিরিয়াস ধরণের যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জনমতামত, বিশেষজ্ঞ মতামত, অ্যাডভেঞ্চার বা টক শো- ইত্যাদি জাতীয় খবরের দর্শক মাত্র ১৬.৯২%। টেলিভিশন বিনোদনের। নাটক, সিনেমাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বাইরে আলাদাভাবে বিনোদনধর্মী খবর দেখে থাকে ৬.১৫% লোক। আর আন্তর্জাতিক খবরের দর্শক রয়েছে ১৬.৯২%। বিজ্ঞাপনের পর খবরের শেষ অংশে দেয়া হলেও খবরের কাগজের মতোই ৯.২৩% অর্থনীতি, ৪.৬১% শিক্ষা সংক্রান্ত এবং পত্রিকার ক্ষেত্রে পরিবেশ ইস্যুর পাঠক আলাদাভাবে না মিললেও টিভির ক্ষেত্রে ১.৫৩% লোক পাওয়া গেছে। তবে সার্বিক অর্থে টিভির ক্ষেত্রে সবধরণের খবরের দর্শক বেশি এবং তারাই পরিবেশ সংক্রান্ত খবর দেখে থাকে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান যেমন পত্রিকা, রেডিও-টিভির ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারকরা সাধারণত সারাদিনই টিভির খবর দেখে থাকেন এজন্য যে নিজের স্টেশনের কোন নিউজ মিস হয় কিনা বা আর কোনও এঙ্গেল দিতে পারি কিনা ইত্যাদি প্রয়োজনে। এর বাইরে সরকারি-বেসরকারি অফিসে একধরণের দর্শক তৈরি হয়েছে যারা সারাদিনই খবরের চ্যানেল ধরে থাকে।

গবেষণার উদ্দেশ্যপূরণে মানুষ কখন পত্রিকা পড়ে বা টিভির খবর দেখে ও রেডিও শুনে থাকে, তা জানা দরকার ছিল। দেখা গেছে, মানুষ সাধারণত সকালে পত্রিকা পড়তে চায়। হকার পত্রিকা দিয়ে যাওয়ার পরপরই গরম পত্রিকা নেড়ে দেখার প্রতি অনেকে আগ্রহ রয়েছে। এছাড়া বিকালে বা রাতেও অনেকে খবরের কাগজ পড়ে তবে এরা সাধারণত ঢাকার বাইরের অধিবাসী। বিলম্বে পত্রিকা পৌঁছানোর কারণে তারা বিকালে বা রাতে পড়তে বাধ্য হয়। আর টিভির খবর দেখা হয় রাতে। দেখা গেছে, পত্রিকার খবর সকালে পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

৬৩.০৭%, বিকালে পড়ে ৩.০৭% এবং রাতে পড়ে ৩.০৭% লোক। এরবাইরে সময় পেলে পড়ে ১০.৭৬% আর সারাক্ষণ পড়ে ১.৫৩% লোক। সময় পেলে যারা পত্রিকা পড়ে, তাদের কারও পত্রিকা কেনার সামর্থ্য নাই বা পত্রিকা গ্রাহক নয় বা টিভির অভিগম্যতা নাই। একারণে সামনে পেলে বা সময় পেলে পত্রিকা পড়া ও টিভির খবর দেখা হয়। আবার তথ্যদাতাদের মধ্যে গণমাধ্যমের নীতি-নির্ধারক ছাড়া সকাল ও বিকালে টিভির খবরের দর্শক পাওয়া যায়নি। তবে রাতে ৪০% মানুষ টিভির খবর দেখে থাকে। সময় পেলে টিভির খবর দেখে এমন পাওয়া গেছে ১২.৩০%। অর্থ্যাৎ, এরা নিয়মিত খবরের দর্শক নয়। আর সারাক্ষণই টিভির খবর থেকে নিজেকে আপডেট রাখেন ২৪.৬১% লোক। এরাই গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারক বা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকাবি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত যারা নিজ নিজ অফিসে খবরের চ্যানেল ধরে রাখেন বা খবরের সময়ে চ্যানেল ঘুরিয়ে খবর দেখে থাকেন। এভাবে মোটের ওপর পত্রিকা পাঠক ৮১.৫৩% আর টিভির খবরের দর্শক ৭৬.৬১% পাওয়া গেছে।

গবেষণায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফাইন্ডিংস হলো যারা খবর পড়ে বা দেখে তাদের কাছে উপস্থাপিত তথ্য কখনো অসত্য মনে হয় কিনা। দেখা গেছে, অধিকাংশ লোকেই বলেছেন যে, তাদের কাছে মাঝে-মধ্যে অসত্য মনে হয়। এই হার ৫২.৩০%। আর ২৩.০৭% সরাসরি বলেছেন হ্যাঁ, অসত্য খবর প্রকাশ বা প্রচারিত হয় গণমাধ্যমে। আর ১৩.৮৪%-এর কাছে টিভি-পত্রিকার খবর অসত্য মনে হয় না। প্রশ্নের জবাব দেন নি ১০.৭৬%। সে হিসেবে ৬৬ ভাগেরও বেশি মানুষের কাছে টিভি-পত্রিকার খবর কমবেশি অসত্য মনে হয়। খবর অসত্য মনে হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অতিরঞ্জিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সত্যের অপলাপ, একই প্রতিবেদন এক এক পত্রিকা বা টিভিতে এক একভাবে বা ভিন্নতাসহ উপস্থাপন, ত্রুটিপূর্ণ, বিভ্রান্তিকর, তথ্যঘাটতি ও অসাবধনতার সাথে তুলে ধরা হয়। মোট ২৯ ভাগেরও বেশি মানুষ এসব কারণের কথা বলেছেন। এছাড়া কেউ কেউ বলেছেন, সাধারণত রাজনৈতিক ও দলীয় স্বার্থে সত্য প্রকাশ করা হয় না। কেউ কেউ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকের স্বার্থে পত্রিকার ব্যবহার হওয়ায়কেও চিহ্নিত করেছেন সংবাদ অসত্য মনে হওয়ার কারণ হিসেবে। একজন সাংবাদিক বলেছেন, পত্রিকার মালিক বা রিপোর্টারের রাজনৈতিক পরিচয়ও পাঠকের কাছে রিপোর্টের সত্যতার ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। মজার ব্যাপার হলো একজন সম্পাদক বলেছেন, অনেক সময়ই পত্রিকা/টিভির রিপোর্ট অসত্য মনে হয়। তাঁর মতে, মাঝে মাঝে প্রকাশিত সংবাদে উপস্থাপিত তথ্য সত্যের কাছাকাছিও থাকে না। ইন ডেপথ (নিগুঢ়) রিপোর্টিং থাকে না। আরেকজন সিনিয়র সাংবাদিক বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা হয় না। নিজে উপস্থিত ছিলেন তেমন ঘটনাও একেক পত্রিকায় একেকভাবে পেয়েছেন তিনি। এটা বিশেষ করে রাজনৈতিক খবরের ক্ষেত্রে ঘটে।

এ অবস্থায় প্রশ্ন ছিলো কোনও প্রতিবেদন অসত্য মনে হলে পাঠক-দর্শক কি করে থাকে। ৪৬.১৫% লোক বলেছেন, তারা বিকল্প পন্থা গ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে অনেকে একাধিক পত্রিকা পড়েন বা টিভি দেখেন। অনেকে বন্ধুবান্ধবসহ পরিচিত সাংবাদিকদের কাছ জানতে চান। আর গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা সত্যতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের কাছে জানতে চান। অসত্য মনে হওয়ার পরও সঠিক তথ্য জানতে বিকল্প পদক্ষেপ নেয়

Dhaka University Institutional Repository

না ৯.২৩ভাগ শিক্ষার্থী। নিউজের সত্যাসত্য নিরূপনের ক্ষমতাই নাই- এমন লোকও পাওয়া গেছে। তবে এ সংখ্যা কম, ১.৫৩%। কিন্তু ৪০% লোকের এ বিষয়ে কোন মন্তব্যই নাই।

পাঠকের কাছে জানার পর পত্রিকার নিউজ ম্যানেজারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো সাধারণত পাঠকরা পত্রিকার কোন পৃষ্ঠাগুলো বেশি পড়ে। এক্ষেত্রে শতভাগ গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বই মনে করেন, পাঠক পত্রিকার প্রথম, তৃতীয় ও শেষ পাতা বেশি পড়ে। আর নিউজ আইটেম বাছাইয়ে রাজনীতি, দিনের আলোচিত ইস্যু বা ঘটনা, অপরাধ, দুর্নীতি এবং বিশেষ রিপোর্ট বেশি পড়ে। পাঠকের মতামত আর গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে একটি জায়গায় আশ্চর্যজনকভাবে মিল পাওয়া গেছে। সেটি হলো খেলার খবরের পাঠকের সংখ্যায়। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, ৪০ভাগ পাঠক রয়েছে খেলার খবরের। পাঠকদের পাশাপাশি নীতি-নির্ধারকরাও বলেছেন ৪০%, পাঠক খেলার খবর বেশি পড়ে। তবে এটা সর্বোচ্চ সংখ্যা নয়। তাদের মধ্যে ৬০% নীতি-নির্ধারক মনে করেন, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় বেশি পড়ে। আর ২০% লোক মনে করেন মফস্বল ও পরিবেশ/জলবায়ু সংক্রান্ত খবর বেশি পড়ে পাঠক।

গবেষণা দেখা গেছে, রাজনীতিসহ দৈনন্দিন ইস্যুর খবর বেশি প্রাধান্য পেলেও পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর সাধারণত ট্রিটমেন্ট ভালো পায় না। পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদের জন্য জায়গা নির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ নেই। রাজনৈতিক খবর যেমনি প্রথম বা শেষপাতায় স্থান পায়, কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে অমর একুশে বইমেলার জন্য সাধারণত প্রায় সব দৈনিকই শেষ পৃষ্ঠা ছেড়ে দেয় বা প্রত্যেকটি স্যাটেলাইট টিভি বিশেষ গুরুত্বসহ প্রতিবেদনসহ প্রকাশ করে, এক্ষেত্রে সচরাচর তেমন গুরুত্ব পায় না। তবে প্রথম ও শেষপাতায় নিউজের ক্ষেত্রে পাঠক আগ্রহ, ব্রেকিং/বিশেষ নিউজ আইটেম ইত্যাদি বিবেচনা হয়। এক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত নিউজটি সেই মান অর্জন করলে ভালো ট্রিটমেন্ট পেয়ে থাকে। মতামত দাতা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারকদের সবাই এই দু'ক্যাটাগরিতে বা প্রথম ও শেষপাতায় এবং ভেতরের পাতায় ট্রিটমেন্ট পাওয়ার বৈশিষ্ট তুলে ধরেছেন। পত্রিকার পাঠকের পর টিভির দর্শক ও বেতারের শ্রোতাদের খবর দেখা ও শোনার সময় বের করা হয়েছে। এটা এজন্য যে পরিবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সংবাদ কখন প্রচার দরকার তা বের করা প্রয়োজন। এব্যাপারে গণমাধ্যমের র্কতাব্যক্তিরা মনে করেন, মানুষ সাধারণত প্রাইমটাইমে বা সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত টিভির খবর দেখে। আর বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে বেতারে পাইওনিয়ার স্টেশন 'রেডিও টুডে'র একজন নীতি-নির্ধারকের সাক্ষাতকার নেয়া হয়। ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান বার্তা সম্পাদকের মতে, শ্রোতারা বলতে গেলে দিন-রাত সারাক্ষণই সময় পেলে রেডিও শোনে। দেখা গেছে, টিভি ও রেডিওর মতো ইলেকট্রনিক মিডিয়া দিনের আলোচিত ঘটনা দিয়েই তাদের নিউজ বুলেটিন সাজিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিউজের বিভিন্ন অংশে আন্তর্জাতিক, খেলা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়মিত ভাগ থাকলেও পরিবেশের ব্যাপারে আলাদা কোনও সময় নির্ধারিত নাই। সংশ্লিষ্ট সবাই বলেছেন, কেবল জাতীয়-আন্ত র্জাতিক অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং নিউজ হলে বা সভা-সমাবেশ ও সেমিনার থাকলে তা কাভারেজ পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পরিবেশ/জলবায়ু সংক্রান্ত সংবাদ ট্রিটমেন্ট দেয়ার পলিসি নাই।

Dhaka University Institutional Repository

এ অবস্থায় পরিবেশ ইস্যুর খবর যে পরিমাণ কাভারেজ পাচ্ছে, তাতে ৫৩.৮৪% লোক মনে করে কাভারেজ যথেষ্ট নয়। অবশ্য ১৫.৩৮% লোক মনে করে যথেষ্ট। ৪.৬১% মানুষ মনে করেন যে, কাভারেজ যে পাচ্ছে না তা নয়, কিন্তু কম পাচ্ছে। একই সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ মনে করেন মোটামুটি খাবারেজ পাচ্ছে। গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ ১.৫৩% উত্তরদাতা মনে করেন গণমাধ্যমের পরিবেশ ইস্যুর কাভারেজ আনুষ্ঠানিক। এক্ষেত্রে সভা-সমাবেশ সেমিনারের কাভারেজ গুরুত্ব পায়। ১২.৩০% মানুষ কাভারেজ বিষয়টি কি, তা-ই বোঝে না বা তারা পত্রিকাই পড়ে না। আর ৭.৭৩% মানুষ প্রশ্নটির উত্তর দেয়নি।

গণমাধ্যমের দায়িত্ব পালনটি তার কাভারেজের মধ্যদিয়েই প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু পরিবেশের মতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গণমাধ্যমে যে পরিমাণ কাভারেজ পাচ্ছে, তাতে ৪৬.১৫% মানুষ মনে করেন, গণমাধ্যম নিজে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না। বিপরীত দিকে কাভারেজ যথেষ্ট বলে মনে করেন ১২.৩০% লোকে। এরবাইরে প্রয়োজনের তুলনায় কম পাচ্ছে বলে মনে করেন আরও ১২.৩০%। আর মোটামুটি কাভারেজ পাচ্ছে বলে মনে করেন ৪.৬১%। ২৪.৬১% এব্যাপারে মতামত জানান নি। সে দৃষ্টিকোন থেকে গণমাধ্যমে পরিবেশের কাভারেজের যে চিত্র তাতে বলা যায়, বেশির ভাগই মনে করছেন, গণমাধ্যম তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে না।

স্যাটেলাইট টিভি ও এফএম রেডিও সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে তার প্রচারের আওতা। স্যাটেলাইট সংযোগের বিস্তার যে পর্যন্ত এবং যারা তার সংযোগ গ্রহীতা, কেবল তারাই এধরণের টিভির সেবা পেয়ে থাকেন বা দেখে থাকেন। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আওতা সারাদেশ। এরবাইরে বিটিভি স্যাটেলাইট সার্ভিসও দিচ্ছে। অর্থ্যাৎ, মানুষের কাছে পৌছার ক্ষমতা এই দু'মাধ্যমের বেশি। কিন্তু তারা মানুষের কাছে কতটা পৌছাচ্ছে- এরপর তা বের করা হয়েছে। মতামতদাতাদের মধ্যে ৪১.৫৩% বলেছেন তারা নিয়মিত বেতারের খবর শুনে থাকেন। তবে ৩০.৭৬% উত্তরদাতা রেডিও শোনেন না। ২০% লোক সময় পেলে বা মাঝে মধ্যে রেডিও শুনে থাকে। ৭.৬৯% ব্যক্তি উত্তরদানে বিরত ছিলেন।

বাংলাদেশ বেতার ও এফএম রেডিও'র মধ্যে তুলনামূলক ৪৬.১৫% লোক এফএম রেডিও শুনে থাকেন। আর বেতারের শ্রোতা পাওয়া গেছে মাত্র ৪.৬১%। তবে বাংলাদেশ বেতার ও এফএম রেডিও উভয়টি শোনেন এমন শ্রোতা রয়েছে ১০.৭৬%। সবমিলিয়ে কার কেমন এখনও প্রায় ৭০ভাগ মানুষ রেডিও শুনে থাকে। এফএম ব্যান্ডে বেসরকারি রেডিও সম্প্রচার আর গাড়ি ও মোবাইল ফোনের বদৌলতে রেডিওর শ্রোতা বাড়ছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ার পাশাপাশি তার সারাদেশ কাভারেজ ক্ষমতা রয়েছে। এ অবস্থায় তারা পরিবেশ পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে। বেশির ভাগ লোকই বলেছেন যে, বিটিভি পরিবেশ পরিবর্তন সংক্রান্ত খবর বিটিভি কাভার করে। কিন্তু ২১.৫৩% লোক মনে করেন বিটিভি পরিবেশ সংক্রান্ত খবর মোটামুটি কাভার করে। আর ৩০.৭৬% মনে করে কম কাভার করে। ৬.১৫% মনে বিটিভির পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদ মন্ত্রীদের প্রোগ্রাম কাভারেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে হিসাবে ৫৮ভাগের বেশি মানুষ মনে করে বিটিভি কম-বেশি পরিবেশ ইস্যু কাভার করে। অবশ্য ৪.৬১% মান করে বিটিভিতে এ

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্ত নিউজ কাভার হয় না। কিন্তু এরচেয়েও বড় কথা হলো, বিটিভি দেখে না এমন একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা পাওয়া গেছে। মোট উত্তরদাতার মধ্যে ১৮.৪৬% মানুষই বিটিভি দেখে না বলে জানিয়েছেন। যে কারণে কাভারেজের ব্যাপারে তারা মন্তব্য করেন নি। এরবাইরে বিষয়টি জানে না এমন আরও ৬.১৫% পাওয়া গেছে। আর ১২.৩০% এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেন নি।

আলাদাভাবে বেতার পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদ কতটা কাভার করে, তাও বের করা হয়েছে। দেখা গেছে, আকর্ষণহীনতা, অন্যান্য গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারসহ নানান কারণে মোট ৬১.৫৩% মানুষ বাংলাদেশ বেতার শোনে না। ৩.০৭% মনে করেন, পরিবেশ পরিবর্তন সংক্রান্ত খবর বেতার কাভার করে না। ৬.১৫ বলেন যে কাভার করে, কাভার করলেও তা কম। ৪.৬১% বলেন যে, মোটামুটি কাভার করে। আর ৬.১৫% বলেন যে, কেবল মন্ত্রীদের খবর কাভার করে বেতার। ৬.১৫% এ বিষয়টি জানেন না আর ১২.৩০% লোকে এ প্রশ্নের উত্তর দেননি।

এসব কারণে বিটিভি ও বেতারের পরিবেশ ইস্যুর খবর কাভারেজে মাত্র ১৬.৯২% লোক খুশি। আর অসন্তুষ্ট লোকের সংখ্যা ৩৬.৯২%। ৪৬.১৫% লোক এই প্রশ্নের জবাব দেন নি। যারা এই প্রশ্নের জবাব দেন নি, তাদের কেউ বিটিভি দেখেন এবং বেতার শোনেন না।

গণমাধ্যমে সাধারণত প্রত্যেক ইস্যুর জন্য বিটভিত্তিক আলাদা দায়িত্বপ্রাপ্ত রিপোর্টার থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংক্রান্ত নিউজের কাভার করার জন্য বিট হিসাবে দায়িত্ব নির্দিষ্ট রিপোর্টার আছে। একেবারেই নেই- এমন প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে ৭৫ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন, তাদের নিয়মিত রিপোর্টার রয়েছেন। আর বাকি ২৫% বলেছেন, আছে কিন্তু নিয়মিত নয়।

দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে দেশের প্রায় ১ভাগ ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভে ডুবে যাওয়াসহ নানা নেতিবাচকের প্রভাবের খবর মানুষ জানে কিনা। এই ব্যাপারে তথ্য গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব-কর্মী[১৪] এবং পরিবেশ মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে জানতে চাওয়া হয়। বাকিদের মধ্যে দেখা গেছে, বেশির ভাগ লোকই তা জানেন। মোট উত্তর দাতার মধ্যে ৬৪.৫৮% বিষয়গুলো জানে বলে জানিয়েছে। আর ২০.৮৩% জানেন না। ১৪.৫৮% মন্তব্য দানে বিরত ছিলেন। আর পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাবে জাতীয়ভাবে বাংলাদেশ যেসব ভোগান্তি পোহাচ্ছে সেসব তথ্য মানুষকে অবহিত করানোর পেছনে পত্রিকার ভূমিকা বেশি। মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৩৫.৪৮% পত্রিকা থেকে জেনেছে। বিপরীত দিকে কেবল টিভি থেকে জেনেছে ৯.৬৭% লোক। এ ক্ষেত্রে রেডিওর ভূমিকা আরও কম, ৩.২২% মাত্র। এরবাইরে ইন্টারনেট থেকে ৩.২২%, লোকমুখে ৬.৪৫% আর পাঠ্যবই ও সাময়িকী থেকে জেনেছে ৬.৪৫% লোক। তবে পত্রিকা ও টিভি উভয় মাধ্যম থেকে জেনেছেন এমন লোকের হার ৩৫.৩৮%। ইন্টারনেট বলতে ব্লগিং আর লোকমুখে বলতে ক্লাসে শিক্ষক লেকচার, বন্ধুদের আড্ডা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সভা-সমাবেশ, সাময়িকী বলতে দেশী-বিদেশী ম্যাগাজিন, নিবন্ধ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, টিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও খবরের বাইরে (সংবাদে)

[১৪] গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব বলতে পত্রিকা, টিভি, রেডিও ও অনলাইন সাংবাদিকদের বোঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী মুখে ভাষণ-বক্তৃতায়, এবং ডকুমেন্টারিও রয়েছে জানার মাধ্যম হিসাবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা (বাড়ি দক্ষিণাঞ্চলে) থেকেও জানার-বোঝার উত্তরদাতা পাওয়া গেছে।

জাতীয় ইস্যুও পর হিমালয় ও এন্টার্কটিকার বরফ গলাসহ পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক তথ্য জানার হার নির্ণয় করতে গিয়ে জানা যায়, পরিবেশদুষণের কারণে ক্ষয়ক্ষতির আন্তর্জাতিক নানা ঘটনাবলী সম্পর্কে মানুষ জানে কিনা। দেখা গেছে, মোট উত্তরদাতার ৫৬.২৫% বলেছেন তারা হিমালয়ের বা এন্টার্কটিকার বরফ গলার তথ্য জানেন। কিন্তু ২৯.৯৬% জানে না। আর ১৪.৫৮% উত্তরদানে বিরত ছিলেন। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, বেশির ভাগ মানুষ পরিবেশ দুষণ ও পরিবর্তন সম্পর্কে জানেন। এসব তথ্য তাদের জানাতে এক্ষেত্রেও পত্রিকার ভূমিকাই বেশি। এই হার ৩৭.০৩%। আর টিভি এবং পত্রিকা উভয় মাধ্যম থেকে জানে ৩৩.৩৩%। কেবল টিভি থেকে জেনেছে ১৪.৮১%। ইন্টারনেটে থেকে জেনেছে ৩.০৭%, লোকমুখে ৩.০৭% আর পাঠ্যবই ও সাময়িকী থেকে ১১.১১%। এ ধরণের আন্তর্জাতিক তথ্য জনগণকে জানাতে রেডিওর ভূমিকা জানা যায়নি।

পরিবেশ দুষণের সাথে প্রধানত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রভাবশালী মহল বেশি জড়িত বাংলাদেশে। গণমাধ্যমের মালিকানাও তাদের বেশি। এ অবস্থায় বিজ্ঞাপন দেয় এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের পরিবেশ দুষণের রিপোর্ট সেন্সর হয় কিনা খোঁজার চেষ্টা করা হয়। এতে দেখা গেছে, ২৫% বলেছেন, হ্যাঁ। আর ৭৫% নমুনার বলেছেন, সেন্সর করতে হয় না। তবে যারা সেন্সর হয় না বলেছেন, তারা এও বলেছেন, তার প্রতিষ্ঠানে সেন্সর না হলেও অন্য প্রতিষ্ঠানে হয়।

সবশেষে গণমাধ্যমের দেশপ্রেম মানুষের মতামত বের করার চেষ্টা করা হয়। গণমাধ্যমের দেশপ্রেম নেই বলে মনে করেন না কেউই। তারা বলেছেন, আসলে গণমাধ্যমের দেশপ্রেম বলতে বাস্তবে কোনও বিষয় নেই। যা আছে তা হলো এতে কর্মরত সাংবাদিকদের। গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের দেশপ্রেম থাকলেই তা গণমাধ্যমের দেশপ্রেম বলে বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় ৪৪.৬১% বা বেশির ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন, গণমাধ্যম কর্মীদের দেশপ্রেম আছে। কিন্তু সমস্যা যা তা হলো রাজনৈতিক মতাদর্শ। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে সংবাদ বিভিন্ন রকম মনে হয়। ৩৩.৮৪% মনে করেন, গণমাধ্যম কর্মীদের দেশপ্রেমে ঘাটতি আছে। আর ১৬.৯২% মতামত প্রদানে অনিচ্ছুক বা বিব্রত। এদের কেউ কেউ গণমাধ্যম কর্মী বা সাংবাদিকদের সম্পর্কে চরম নেতিবাচক মন্তব্যও করেছেন। এর বাইরে আরও ৪.৬১% পাওয়া গেছে যারা মতামত দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পরিবেশ : বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতি

গাছের ছাল-বাকল, লতাপাতা, পশুর চামড়া দিয়ে লজ্জা নিবারনকারী ও বনবাদাড়ে ঘুরে অন্ন সংস্থান করে জীবনধারণকারী গুহা কিংবা মাটির গর্তে বসবাসী 'অসহায়-মানুষ' থেকে মঙ্গলগ্রহে বসতি গড়ার স্বপ্নে বিভোর আজকের 'অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন-মানুষ'- এই দীর্ঘ ইতিহাসটা তার (মানুষের) সংগ্রাম আর সফলতার ইতিহাস। আদিম অবস্থা থেকে অত্যাধুনিক শহরে উত্তরণের জন্য দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় মানুষ তৈরি করেছে সফলতার নানা মাইলফলক। এরজন্য সে যেমন অনেক সৃষ্টি করেছে. ধ্বংসও কম করেনি। এইসময়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের সহায়তা নিয়েছে ও ব্যবহার করেছে, সেটি হচ্ছে প্রকৃতি। প্রকৃতির একটি আপন জগৎ ও নিজস্ব পরিবেশ রয়েছে। এই পরিবেশকে বলা হয় 'প্রাকৃতিক পরিবেশ'। পরিবেশের অন্য প্রকারটির নাম সামাজিক পরিবেশ। এই উভয় পরিবেশের উপাদান হলো বিভিন্ন মানব ও অমানব সত্তা; যাদের এক কথায় 'বাস্তুসত্তা' বা 'বাস্তুতন্ত্র' (Ecology) ভুক্ত করা হয়। মানুষ ওই বাস্তুসত্তার বাইরে নয়। গোটা বাস্তুসত্তা বিশেষ করে জীবজগত একটি খাদ্য পিরামিডকে[1] ভিত্তিতে করে আবর্তিত ও সামনে এগিয়ে যায়। সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন, উৎকর্ষতার কুফল পড়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর। একটা আরেকটার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এককথায় বাস্তুজগত বিপন্ন হলে গোটা মানবসভ্যতাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেহেতু পরিবেশেরই অন্তর্গত এই বাস্তুজগত। তাই পরিবেশ বিপন্ন হলে বাস্তুজগত বিপন্ন হয়। আর বাস্তুজগত বিপন্ন হলে খাদ্য পিরামিডের আঘাত লাগে। এই খাদ্য পিরামিডের গোটা অংশে তো দূরের কথা, একটি স্তরেও আঘাত পেলে তা মানব অস্তিত্বই বিপন্ন করবে। কিন্তু সেই প্রাগৈতিকহাসিক কাল থেকে মানুষ এ পর্যন্ত বাস্তুজগতকে ব্যবহার করেই উৎকর্ষতার চরম সীমায় পৌঁছেছে। ব্যবহারটা ছিলো নির্বিচারে। যে কারণে যা হওয়ার তাই হয়েছে। বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্ব পরিবেশ পরিস্থিতি আজ নাকাল। পৃথিবী নামক একই নৌকায় আমরা যারা যাত্রী, পরিবেশের এই দশার জন্য বাস্তুতন্ত্রের সবাই নয়, কেবল মানুষই দায়ী।[2] আবার

---

[1] খাদ্য পিরামিড : 'চার্লস এল্টনের মতে, ইকোসিস্টেমের জৈবিক উপাদানগুলোর মধ্যে খাদ্য শিকলে উৎপাদক থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত জীবের সংখ্যা, ওজন ও শক্তির পরিমাণ পর্যায়ক্রমে হ্রাস পায়। তাই একটি খাদ্য শিকলের বিভিন্ন পুষ্টিস্তর সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, পরপর অবস্থানকারী জীবকুলের সংখ্যা ও অন্যান্য মাত্র ক্রমান্বয়ে কমে যায়। পুষ্টিগুলোর এরূপ সম্পর্কের লৈখিক নকশা করলে একটি পিরামিড আকৃতি পাওয়া যায়। খাদ্য শিকলের পুষ্টিগুলোর এই বিন্যাস সমন্বিত ছককে খাদ্য পিরামিড বা পরিবেশীয় পিরামিড বলা হয়।' (রহমান, শামসুর অবসর ২০০৫ : ১১২)

[2] এ ব্যাপারে ইউএনএফসিসিসির ১৯৯২সালের প্রথম রিপোর্টে বলা হয়, Stabilization of greenhouse gas concentrations in the atosphare at a level should be achieved within a time-frame sufficient ti akkow ecosystem to adapt naturally to climate change, to ensurethat food

Dhaka University Institutional Repository

গোটা পৃথিবীর মানুষ বা পৃথিবীর সব জাতি এরজন্য দায়ী নয়। উন্নতিতে চরম শিখরে পৌছা তথাকথিত সভ্য জাতিগুলিই এরজন্য দায়ী। তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনৈতিক প্রতিযোগিতা ও ওইসব জাতির নাগরিকদের বেপরোয়া লাগামহীন ভোগবাদী জীবন পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। বলা হয়, পরিবেশ ধ্বংসের জন্য যেসব দিক দায়ী তারমধ্যে অন্যতম শিল্প বর্জ্য, কীটনাশক, নানা রাসায়নিক, কার্বন ডাই অক্সাইড-নাইট্রাস অক্সাইড-মিথেন-সিএফসিসহ (Chlorofluorocarbons) বিভিন্ন ক্ষতিকর কার্বন ও গ্যাস, যা মানুষের জীবন নামক পানি, সঞ্জীবনীর বায়ু, খাদ্য ও উৎপাদনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রক আলো ইত্যাদিকে বেসামাল করে তুলেছে। এক কথায় সার্বিক পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র আজ নাকাল। এসবের জন্য বিশ্বব্যাপী আলোচনা-পর্যালোচনা আর আন্দোলনের শেষ নেই। বিশেষ করে গোটা বিশ্ব বা বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্তরা আজ পরিবেশ-বিপর্যয়কারী অন্যতম উপাদান জলবায়ু উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে একাট্টা। কিন্তু উন্নয়নে কে কাকে কত ছাড়িয়ে যাবে, আর কে এগিয়ে আসলো কি আসলো না- এই রাজনীতিতে কার্যকর উদ্যোগ নেই। যে কারণে এনিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে সর্বশেষ অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলন তো প্রায় ব্যর্থ হতে যাচ্ছিলো। অথচ তারা এ কথা বুঝতেই চাচ্ছে না যে, উন্নত-অনুন্নত মিলিয়ে আমরা সবাই পৃথিবী নামক যে একই নৌকার যাত্রী, সেই পৃথিবী বিপন্ন হলে বা ধ্বংসের-ঝড় উঠলে যে এই নৌকার যাত্রী হিসাবে তারাও রেহাই পাবে না। যে কারণে পৃথিবীব্যাপী আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবেশ সুরক্ষা। এখানে আমরা পরিবেশের বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি আলোচনা করবো। এরআগে পরিবেশের বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হওয়ার ইতিহাস আর পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যম কি ভূমিকা এখন পর্যন্ত পালন করেছে, তার একটি গবেষণাচিত্র উপস্থাপন করা হবে।

৪.১ পরিবেশের নানা কাল

সভ্যতার চরম উৎকর্ষের আজকের এই যুগে পৌছা পর্যন্ত মানুষ যে কত সময় পার করে এসেছে, তার কোনও সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে যে সময়ই পার হোক না কেন এটা ঠিক যে, আজকে যে সভ্যতায় আমরা অবস্থান করছি, সভ্যতা শুরুতে সে রকম ছিলো না। সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন অধ্যায় রয়েছে। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, আধুনিক যুগ নামে প্রধান অধ্যায় রয়েছে।

মানুষের সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় পাথরের ব্যবহারের মাধ্যমে। এজন্য আদিযুগের শুরুটাকে আদি পাথর যুগ বলে। পরবর্তীতে অবশ্য নতুন পাথর যুগেরও সন্ধান মেলে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার্য ছিলো পাথর। আদি পাথর যুগে মানুষ আবিষ্কার করে তীর-ধনুক। এই যুগে মানুষ নিজে উৎপাদন করতো না। যে কারণে প্রকৃতিই পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলো তার অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য। যেমন : বনজঙ্গলের গাছগাছালি থেকে ফলমূল, বিভিন্নধরণের পশুপাখি, পাখির ডিম, নদী-সমুদ্র থেকে মাছ ইত্যাদি প্রকৃতি থেকেই সংগৃহিত হতো। অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় মানুষ আগুণ আবিষ্কার করে। নিরাপত্তা,

---

production is not threatened and to enable evonomic development to proceed in a sustainabtle manner (UNFCCC 1992).

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্যচাহিদাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে এরপর সংগঠিত হয়। মানুষ সভ্যতা গড়ে তোলে। মেসোপটেমিয়া, মিসরীয়, আসিরীয়, ব্যবলনীয়, সিন্ধুসভ্যতা নামে যেসব সভ্যতা জানি তার সবই গড়ে ওঠে নদীর তীরবর্তী এলাকায়। অর্থ্যাৎ, এখানেও প্রকৃতি আর প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে তার প্রয়োজনের হাতিয়ার করে। এরপর মানুষ নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করতে শেখে। শুরু হয় কৃষি যুগ। কৃষির আবিষ্কার মানবজাতির ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক অধ্যায়। এইসাথে পশুপালন ও মৃৎপাত্র তৈরির মতো উদ্ভাবন হয়। প্রথম গৃহপালিত পশু ছিলো কুকুর। পরবর্তীতে ভেড়া, গরু, হাতি, গাধার মতো প্রাণীও পোষ মানিয়ে নানা কাজে ব্যবহার শুরু করে। পর ধীরে ধীরে মানুষ কৃষিতে পানিসম্পদের ব্যবহার শেখে। নানা হাতিয়ারের ব্যবহারও বাড়তে থাকে। পাথর দিয়ে নানা অস্ত্র, তীর-ধনুক নির্মাণ বিশেষ করে কৃষিতে হাতিয়ার আর গাছের ছাল-বাকল ছেড়ে যখন মানুষ বিভিন্ন পশুর চামড়া পোশাক হিসাবে ব্যবহার শিখলো মূলত তখনই তার শিল্পযুগ শুরু হলো। এই শিল্পযুগের নানা নির্মাণের মধ্যে কুকুরের শ্লেজ গাড়ি, নৌকা, নৌকার বৈঠা ইত্যাদি আদিযুগের মানুষের শিল্পদ্রব্য। এরপর চাকার আবিষ্কার এই শিল্পযুগকে প্রাথমিক পূর্ণতা দেয়। মানুষের নগরজীবনের গোড়াপত্তনও ঘটে এসময়ে।

সভ্যতার শুরুর দিকে জমির মালিকানা বলতে কোনও ধারণা ছিলো না। যে আবাস গড়া হতো, তার আশপাশের ভূমিতে মানুষ চাষাবাদ করতো। কিন্তু একটা সময়ে রাজা-বাদশার যুগ তৈরি হয়। মধ্যযুগে এসে যা আবার সুবা বা প্রদেশের শাসন কর্তায় বিভাজিত হয়। যাইহোক, সময়ের ধারাবাহিকতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির খাদ্যের প্রয়োজন আর ইতিমধ্যে চালু হওয়া শাসনব্যবস্থায় রাজাকে ট্যাক্স দেয়ার প্রয়োজনে মানুষের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিলো। তাই মধ্যযুগে এসে কৃষির ব্যাপক চাষাবাদ শুরু হলো। প্রাচীন যুগে যেখানে ফাঁকা জমিতে মানুষ চাষ করতো, সেখানে মানুষ জমি আবাদ শুরু করলো। একারণে কৃষি যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও শুরু হলো। এসময় এসে জমিতে সার প্রয়োগ শুরু হয়। তবে তা ছিলো প্রাকৃতিক সার। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, বনজঙ্গল আর পাহাড়ের গুহা ছেড়ে মানুষ যখন সভ্যতায় প্রবেশ করলো, প্রাচীন যুগে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও শুরু হয়। প্রাচীন গ্রীসের দর্শন-বিজ্ঞান চর্চার কথা সবাই জানি। আর এ কথাও সবাই জানি যে, প্রাচীন গ্রীসের ওই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিলো অনেকটাই স্বাধীন ও বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু অসহায় মানুষের অবচেতন মনে শক্তির প্রতি দুর্বলতা থেকে যে ধর্মের শুরু, মধ্যযুগে এসে মানুষের ওপর সেই ধর্মেও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। জ্ঞানচর্চা ছিলো তখন চার্চ কেন্দ্রিক। তবে এরপরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কারণেই মানুষের উন্নয়ন ও উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। প্রাচীন যুগে শিল্প আবিষ্কারের মধ্যে যেমন 'চাকা' মানুষের জীবনের চাকা ঘুরিয়ে দেয়, তেমনি মধ্যযুগে এই চাকার ব্যবহার আরও সার্থক হয় বয়নশিল্পে ব্যবহারের মাধ্যমে। মানুষ বস্ত্র তৈরি করতে শুরু করলো। তুলা, বুননের যন্ত্রসহ এই বস্ত্রের কাঁচামাল সে প্রকৃতি থেকেই আহরণ করতো। ফলে মানুষের পরিবেশ-নির্ভরতা ও এর ব্যবহার আরও বাড়লো। ধীরে ধীরে মানুষ প্রকৃতিজগতকে ব্যবহার করে বিভিন্নধরণের বস্ত্র, চিনি, গুড়, লবনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি যানবাহন মানুষের উদ্ভাবনী আর আবিষ্কারের সারিতে যুক্ত হয়। বর্তমানের সবচেয়ে বড় জ্বালানি কয়লার ব্যবহার এই মধ্যযুগেই শুরুর প্রমাণ মেলে। কয়লার

Dhaka University Institutional Repository

কারণে বায়ুমণ্ডলসহ পরিবেশের ক্ষতির কারণে ১২৭২সালেই ইংল্যান্ডে রাজা কর্তৃক কয়লা পোড়ানো নিষিদ্ধ করতে দেখা গেছে।[৩] ইতিহাসে পরিবেশদুষণের প্রথম প্রমাণ এবং পরিবেশ সচেতনতার প্রমাণ এই মিললো। এরপর যতই দিন গেছে, পরিবেশের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা এবং পরিবেশের ব্যবহার বাড়লো। শুধু তাই নয়, একটা পর্যায়ে এই ব্যবহার অপব্যবহারে রূপ নিলো। এভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠা আর শিল্পে বিভিন্ন কাঁচামালের সহজলভ্যতা, মানুষের প্রয়োজন ইত্যাদি বিবেচনায় মধ্যযুগের একটা পযায়ে বা অষ্টাদশ শতকের এসে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই শিল্প বিপ্লব পরিবেশ দুষণকে আরও ত্বরান্বিত করে। এসময় কয়লা, জীবাশ্ম ইত্যাদি পোড়ানোর ফলে বায়ু দুষণ বাড়তে থাকে। কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্যসহ মনুষ্য সৃষ্ট নানা বর্জ্যাদি পরিবেশকে দারুণভাবে দুষিত করতে থাকে। বর্তমানে ওজন স্তরে যে কার্বন অবদান রাখছে, তার ৫৫ভাগই মানুষের সৃষ্টি মনে করেন বৈজ্ঞানিকরা।

শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে আধুনিক যুগের পুরো বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র অবশ্য তৈরি করেছিলো কৃষি বিপ্লবই। এছাড়া চতুর্দশ শতকে ইতালিতে সংঘটিত রেনেসাঁ[৪] আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটায়। রেনেসাঁর পর পণ্য উৎপাদনে নতুন মাত্রা পায়। নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে গতি আর সমৃদ্ধি আনে। কৃষি বিপ্লবের কারণেই এবং কৃষিতে যন্ত্রপাতির চাহিদার প্রেক্ষিতে শিল্পের বিস্তার ঘটে। একদিকে কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন সমানুপাতিক হারে বাড়তে থাকে। অন্যদিকে কৃষি বিপ্লবের যুগে কৃষির উৎপাদনও চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এসময়ে কৃষি পণ্যের দাম নির্ধারণে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে পার্লামেন্ট পর্যন্ত ভূমিকা রাখে। কৃষির উৎকর্ষতা এমন পর্যায়ে পৌছে যে, অভিজাত শ্রেণী বলতে তখন এই কৃষি পেশার লোজনদের বোঝাতো। কৃষি পেশাই তখন সবচেয়ে মর্যাদাবান বলে মনে করা হতো। এসব এলিটরা তখন পাশাপাশি পুঁজিবাদী হয়ে উঠতে থাকে। উৎপাদিত বাড়তি পণ্য স্থানীয় বা আঞ্চলিক বাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সন্ধানে নামে। মুনাফাঅর্জনও হয় সেই হারে। ইতিহাসের এই পর্যায়ে এসে আরেকটি মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। কৃষি উৎপাদনে প্রকৃতির ওপর

---

[৩] মধ্যযুগের প্রারম্ভে ১২৭২সালে ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা এডওয়ার্ড (১২৩৯-১৩০৭) সরকারিভাবে কয়লা জ্বালানো বন্ধ করেছিলেন। সূত্র : ইন্টারনেট

[৪] রেনেসাঁ : The Renaissance was a cultural movementthat spanned the period roughly from the 14th to the 17th century, beginning in Italy in the Late Middle Ages and later spreading to the rest of Europe. Though the invention of printing sped the dissemination of ideas from the later 15th century, the changes of the Renaissance were not uniformly experienced across Europe. As a cultural movement, it encompassed innovative flowering of Latin and vernacular literatures, beginning with the 14th-century resurgence of learning based on classical sources, which contemporaries credited to Petrarch, the development of linearperspective and other techniques of rendering a more natural reality in painting, and gradual but widespread educational reform. In politics the Renaissance contributed the development of the conventions of diplomacy, and in science an increased reliance on observation that would flower later in the Scientific Revolution beginning in the 17th century. Traditionally, this intellectual transformation has resulted in the Renaissance being viewed as a bridge between the Middle Agesand the Modern era.   Source: Internet

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। যেমন সেচ যন্ত্র ও ক্ষেত-খামারে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার শুরু হয়। অর্থ্যাৎ প্রকৃতি নির্ভরশীলতা হ্রাস পেলেও প্রকারান্তরে কৃষির শিল্প নির্ভরতা তৈরি হয়। এভাবে কৃষির সহায়ক শক্তি হিসাবেই মূলত বিস্তার ঘটে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের। পাশাপাশি নগরায়ন আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা শিল্পবিস্তারে পালে হাওয়া লাগিয়ে দেয়। নগরায়নের জন্য যে আধুনিক দ্রব্যাদি দরকার তা উৎপাদন হয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে। বাড়তি জনসংখ্যার কারণেও শিল্পের চাহিদা বাড়ে। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর কেউ ক্ষেত-খামার আর কেউ শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করার কারণে তাদের হাতে যে বাড়তি পয়সা আসে, তা দিয়ে অনেকেই দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে শিল্পজাত দ্রব্যের ভোক্তা হয় অনেকে। ফলে একদিকে শিল্পের উৎপাদন খরচ হ্রাসের পাশাপাশি কম দামের কারণে আরও ভোক্তা শ্রেণী তৈরি করে। এটা বিশেষ করে ইংল্যান্ডে ১৭১৫ থেকে ১৭৫০সালের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। এতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিকাশ আরও ত্বরান্বিত হয়। ফলে শিল্পবিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে। একারণে মুনাফালোভী অনেক জমিদার নিজের প্রয়োজন মেটানোর বাইরে আরও মুনাফার লোভে কৃষি থেকে পাওয়া মুনাফার অর্থ শিল্পে বিনিয়োগ করে। এসময় দু'টি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, কৃষি বিপ্লব অল্প জমির মালিককে ভূমিহীনে পরিণত করে। অনেকেই ভূমির ওপর কর্তৃত্ব হারায়। সমাজে ধনি-দরিদ্র গোষ্ঠীর মাঝে বৈষম্যমূলক অবস্থা তৈরি করে। এসময়েই আবিষ্কৃত নতুন ওইসব বিভিন্ন কৃষিসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির মালিকানা আর বাড়তি উৎপাদনের মুনাফার ভোগ-বন্টন নিয়ে একটি শ্রেণী গড়ে ওঠে যারা 'বুর্জোয়া' নামে পরিচিতি পায়। এই বুর্জোয়াদের প্রধান নেশা আর লক্ষ্য হয়ে ওঠে উৎপাদন ও মুনাফা অর্জন। মুনাফার জন্য অনেকটা ব্যগ্র হয়ে যায় এরা। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপের ইতিহাস ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। ফরাসী বিপ্লব আর সম্রাট নেপোলিয়নের রাজ্য বিজয় নীতি ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ করে তোলে ফ্রান্সকে। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের মতো ঘটনা পর্যন্ত ঘটে ইংল্যান্ডের। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডে যে শিল্প বিপ্লব ঘটে, পরে তা বেলজিয়াম, ফ্রান্স হয়ে জার্মানী, রাশিয়াসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বিস্তার ঘটে। এসময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে একধরণের শত্রুতাবস্থা আর যুদ্ধাবস্থা লেগেই থাকতো। তবে যুদ্ধবিগ্রহ যা-ই হোক কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, বাণিজ্য বিপ্লব আর পরিবহন বিপ্লব যে হাত ধরাধরি করে কৃষি বিপ্লবকেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা, কৃষি ও শিল্পের পণ্য বিকিকিনির জন্য আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি করা হয়েছিলো। আর সেই বাজারে পণ্য পরিবহনে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে রেল ও নৌ যোগাযোগে ইংল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে চরম বিকাশ লাভ করে। আর এসবের আড়ালে অনিবার্যভাবে পরিবেশের মারাত্মক নেতিবাচক অপব্যবহারও ত্বরান্বিত হয়।

তাই দেখা যাচ্ছে, সেই আদি পাথর যুগ থেকেই মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে বা প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যবহার করে নিজের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ভবঘুরে জীবন থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজজীবন, সেখান থেকে মধ্যযুগের শিল্পবিপ্লব ও পরবর্তীতে এই শিল্পের জন্য শ্রমিক-ভোক্তা-র প্রয়োজনে বাড়তি জনসংখ্যা, শিল্পের শ্রমিকসহ বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাতে অধিক ফসলের প্রয়োজনে জমি ব্যবহারে

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন, জমিতে ডিডিটিসহ নানা রাসায়নিক*, কীটনাশক ব্যবহার, পরিবেশ ধ্বংস করে ও বনউজার করে নগরায়ন, পরিবহন, বাণিজ্যিক প্রসার, শিল্পের কাঁচামাল সংস্থান এবং এই সংস্থানের প্রয়োজনে দেশবিদেশে অভিযান, নতুন নতুন গবেষণা ও এরমাধ্যমে নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে খনিজ অনুসন্ধানসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আরও বেশি বেশি গ্রহণ, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে রাসায়নিক, কয়লা, লোহা, ইস্পাত ইত্যাদির ব্যবহার পরিবেশকে বিপর্যস্থ ও ভারসাম্য করে তোলে। শিল্পবিস্তার মানুষকে ভোগবাদী করে তোলে। যে কারণে শিল্প কারখানার বর্জ্য আর দুষণের বাইরে সিনথেটিকের ব্যবহার, যানবাহনের নির্গত ধোয়া, পারমানবিক চুল্লি এককথায় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও তার কারণে সৃষ্ট কার্যক্রম পরিবেশের মৌল উপাদান বায়ু ও পানিদুষণসহ সবচেয়ে বড় অবদান বিশ্ব উষ্ণায়ন বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এই উষ্ণায়নের ফলে গোটা প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ ভয়াবহ হুমকির মুখে। মানব-অমানব প্রকৃতির এমন কোন দিক নাই যেখানে আঘাত হানে নি। উষ্ণায়নের প্রথম চাক্ষুষ প্রভাব হলো জলবায়ু[৫] পরিবর্তন। এরফলে বৃষ্টিপাতের ভিন্নতা, এই ভিন্নতার কারণে অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির কারণে বন্যা, অনাবৃষ্টির কারণে খরা, খরা থেকে মরুকরণ, ভূমিধবস, মাটিক্ষয়, নদীভাঙন, খরা, জলাবদ্ধতা, পানিদুষণ, মেরুঅঞ্চলেরও পাহাড়ের বরফগলা, এরফলে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি রয়েছে। সার্বিকভাবে শিল্পবিস্তার প্রকৃতির রুঢ় আচরণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সেইসাথে এর সর্বব্যাপী প্রভাব খাদ্য ঘাটতি, সুপেয় পানির হাহাকার, স্বাস্থ্য সংকটসহ পুরো মানবজাতিই বিলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

মানুষ যে সভ্যতা বিনির্মাণ করেছে, আগেই বলা হয়েছে, সেটা সে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যবহার করেই অর্জন করেছে। নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে সে উন্নততর স্তরে পৌছে। এই ব্যবহারকালে এক একটি সময় পার হওয়ার সাথে সাথে যেমন এক একটি যুগ পার করেছে, তেমনি নতুন যুগে নতুন যে অবলম্বনকে মানুষ সঙ্গী করে ক্রম উন্নততর জীবনযাপন করেছে, সেই নতুন জীবনে সে প্রকৃতিকে আরও বেশি ভোগ ও ব্যবহার করেছে। এভাবে মানুষ আজকের এই মঙ্গলগ্রহে বসবাসের স্বপ্ন দেখার যুগে এসে উপনীত হয়েছে। অনেক কিছু অর্জন করলেও মানুষ পথিমধ্যে কী ফেলে বা হারিয়ে এসেছে তা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার প্রতি' কবিতায় কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কবিগুরুর ভাষায়, 'দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য, লও এ নগর/লও যত লৌহ-লোস্ট্র/কাষ্ঠ ও প্রস্তর/হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী/হে নব সভ্যতা।'

---

* মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর পৃথিবীতে এমন সত্তর হাজার রাসায়নিক দ্রব্য এখন পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে। (আলী, মোহাম্মদ, দর্শন পরিবেশ এবং..., রেনেসাঁ, ২০০৮, পৃ-৫৯)

[৫] জলবায়ু (Climate) হলো আবহাওয়ার দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষণের প্রতিফলন। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন-ডব্লিউএমও) মতে, কোন একটি এলাকা বা অঞ্চলের কমপক্ষে ৩০বছরের আবহাওয়ার গড়ই হলো জলবায়ু। আর আবহাওয়া (Weather) হলো বায়ুমন্ডলের দৈনন্দিন পরিস্থিতি যা বর্তমানে ঘটে যাচ্ছে বা আগামীকাল ঘটবে অথবা খুব সম্প্রতি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট এলাকার স্বল্পকালীন বায়ুমন্ডলীয় অবস্থা হলো আবহাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ পরিবেশ : বিশ্ব পরিস্থিতি

পরিবেশদুষণ বা ধ্বংসের কারণ কেবল বিভিন্নধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান নয়, বর্ধিত জনসংখ্যা এবং নগরায়ন থেকে শুরু করে কৃষিতে ব্যবহারের জন্য নানা রাসায়নিক ও কীটনাশক, রাসায়নিক সার, উচ্চফলনশীল বীজ, জৈবপ্রযুক্তি, শব্দদুষণ, বাতাসে কার্বন ও ক্ষতিকর নানা বিষাক্ত উপাদানের মিশ্রণ, জাহাজভাঙা শিল্প, ট্যানারি, কাপড় উৎপাদনকারী মিল, জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন (খনি খনন ও খনি থেকে উত্তোলন), পাহাড় কাটা (যেমন লাইবেরিয়ায় লোহার পাহাড় কাটা হচ্ছে। বাংলাদেশে বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকায় পাহাড় কাটা হচ্ছে), বনভূমি উজাড়, পানিতে আর্সেনিক, ভূ-গর্ভস্থ পানির অতি ব্যবহার, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও এরপ্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি। পরিবেশদুষণের আরেকটি বড় খাত হচ্ছে পরমানু স্থাপনা। পরমানু স্থাপনা প্রতিনিয়ত কার্বন তৈরি করে তা বায়ুমন্ডলে ছাড়ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন খাতের মধ্যে ৮টি প্রধান খাত রয়েছে যেগুলো কার্বন নির্গমনকারী শীর্ষ খাত হিসাবে চিহ্নিত। ওইগুলির সেরা হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এটা কার্বন নির্গমন করে ২১.৩%। এরপরে রয়েছে শিল্প-কারখানা ১৬.৮%। এছাড়া পরিবহন ১৪.০%, কৃষি উপজাত ১২.৫%, জীবাশ্ম জ্বালানি* উত্তোলন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ১১.৩%, আবাসিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ১০.৩%, ভূমি ব্যবহার ও জৈবজ্বালানি ১০.০% এবং বর্জ্য নিষ্কাশন ও পরিশোধন ব্যবস্থা ৩.৪%।[৬] এসবই সার্বিক পরিবেশকে ভারসাম্যহীন করে তুলছে। আর বেশির ভাগই প্রকারান্তরে কোনও না কোনওভাবে কার্বন তৈরি করছে। সেই কার্বন বায়ুমন্ডলে মিশে বায়ুমন্ডল গরম করছে। এরফলে জলবায়ুর স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে। বিপরীত দিকে এই কার্বন নিঃসরণের বাইরে বিভিন্ন রাসায়নিকের বিক্রিয়া ও এর প্রভাবের কারণে পানি ও বায়ু দুষিত হচ্ছে। এভাবে গোটা পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র আক্রান্ত হচ্ছে নানাভাবে। তবে এদের মধ্যে সর্বগ্রাসী প্রভাব রাখছে কার্বন। এটা (কার্বন) ওজনস্তর** বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে

---

* মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা জীবদেহ থেকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় কার্বন জারিত হয়ে যে জ্বালানি তৈরি হয়, তাকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে। যেমন : পেট্রোল, ডিজেল, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। সাধারণত এ ধরনের জ্বালানি তৈরি হতে কয়েক লক্ষ বছর লেগে যায়। পৃথিবীর খনিতে ৬৫কোটি বছর ধরে তৈরি হয়েছে এমন জীবাশ্ম জ্বালানিও রয়েছে।

[৬] সূত্র : www.epa.ie

** Ozone is a gas that occurs naturally in our atmosphere. Most of it is concentrated in the ozone layer, a region located in the stratosphere several miles above the surface of the Earth. Although ozone represents only a small fraction of the gas present in the atmosphere, it plays a vital role by shielding humans and other life from harmful ultraviolet light from the Sun. Human activities in the last several decades have produced chemicals, such as chlorofluorocarbons (CFCs), which have been released into the atmosphere and have contributed to the depletion of this important protective layer. When scientists realized the destructive effect these chemicals could have on the ozone layer, international agreements were put in place to limit such emissions. As a result, it is expected that the ozone layer will recover in the coming decades. Ozone is also a greenhouse gas in the upper atmosphere and, therefore, plays a role in Earth's climate. The increases in primary greenhouse gases, such as carbon dioxide, may affect how the ozone layer recovers in coming years. Understanding precisely how ozone abundances will change in a future with diminished chlorofluorocarbon

Dhaka University Institutional Repository

ওজনস্তর পৃথিবীকে ছাতার মতো সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে সুরক্ষায় অবদান রাখে, সেই ওজনস্তর আশংকাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। এরবাইরে বাতাসেও মিশে যাচ্ছে কার্বন। এই অবস্থায় বাতাসে গ্রীণহাউজ গ্যাসের পরিমাণ যত বেশি হয়, তাপ আটকে থাকার পরিমাণও তত বেশি হয়। এরফলে পৃথিবী উষ্ণ হওয়ার মাত্রাও সমান্তরালে বাড়ে। এই অনাকাঙ্খিত-বর্ধিত তাপমাত্রা গোটা পৃথিবীকেই উষ্ণ করে তুলছে। ফলে পরিবেশদুষণ আর পৃথিবীর কিছু উপাদান যেমন পানি, বায়ু বা স্থানীয় (শিল্পপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট) জীববৈচিত্র্যের ওপর সীমাবদ্ধ থাকছে না। তা হয়ে উঠছে বৈশ্বিক দুর্যোগের কারণ। অন্য অর্থে গোটা পরিবেশ ও প্রতিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রের জন্য অভিশাপরূপে নাজিল হয় এই উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন। রাসায়নিক দ্রব্য পানিতে মিশে হয়তো পানিদুষণ বা পানিনির্ভর জীববৈচিত্র্য, কিংবা পানি পানে মানুষ, অথবা সেই পানি ভূগর্ভে গিয়ে ভূঅভ্যন্তরে নানা সমস্যা তৈরি করছে। বায়ুমন্ডলের দুষণে স্বাস্থ্যকর বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করে। কিন্তু কার্বন বা জলবায়ু উষ্ণায়ন এই দু'টিসহ গোটা প্রতিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রে আঘাত হানছে। যে কারণে পরিবেশ সুরক্ষার ইস্যু নিয়ে ১৯৭২সালে জাতিসংঘ যে আন্দোলন শুরু করে, তা এখন কার্বন নির্গমনবিরোধী বা জলবায়ু পরিবর্তনবিরোধী বা প্রতিরোধের আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, কোনও একটি এলাকা বা দেশের শিল্পের* কারণে কেবল সংশ্লিষ্ট এলাকা বা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন ধারণা ঠিক নয়। মনে হতে পারে, আফ্রিকার নীলনদের তীরের শিল্পপ্রতিষ্ঠান অপরিশোধিত বর্জ্য ত্যাগ করলে হয়তো কেবল ওই নদীর পানিদুষিত করবে। কিংবা কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিঃসরিত কার্বন কেবল সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে- তা নয়। তা গোটা বিশ্ব পরিবেশকেই আক্রান্ত করে। বিশেষ করে নিঃসরণকৃত কার্বন পৃথিবীর 'ওজন স্তরে' আঘাত হানে। ওজন স্তর ক্ষয় করে ফেলে। সূর্য-তাপ ধারণ করে রেখে উষ্ণায়ন বৃদ্ধি করে।

---

emissions and increased emissions of greenhouse gases remains an important challenge for atmospheric scientists in NOAA and other research centers.

* যে কোনও শিল্প। যেমন : কৃষিতে ব্যবহারের জন্য নানা রাসায়নিক ও কীটনাশক, রাসায়নিক সার, সেচযন্ত্র, ট্রাক্টরসহ কৃষির সহায়ক সবকিছু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, জাহাজভাঙা শিল্প, ট্যানারি, কাপড় উৎপাদনকারী শিল্প ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকা মহাদেশের একটি উন্নয়নশীল দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে কার্বন (সালফার-ডাই-অক্সাইড) নির্গমনের চিত্র
সূত্র : উইকিপিডিয়া

উষ্ণায়ন বৃদ্ধির কারণে আবার জলীয় বাষ্প তৈরি। এসবই সার্বিক পরিবেশ-ব্যবস্থার জন্য অশনি সংকেত। পানি দুষণের প্রভাব বা সংক্রমন নির্ধারণ করা সম্ভব হলেও (যদিও সম্ভব নয়, তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কম দ্রুত ছড়ায়) কার্বনের প্রভাবকে সীমারেখায় আটকানো সম্ভব নয়। এরফলে পানি, বায়ু, ফসল, উৎপাদন ও জীবপ্রকৃতির ওপর এর প্রভাব আর সীমাবদ্ধ থাকে না। কিংবা তা শুধু দরিদ্রদের আক্রান্ত করে- এমনও নয়; ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই আক্রান্ত করে। তা হয়ে ওঠে বৈশ্বিক। সেই মেরুঅঞ্চল থেকে শুরু করে জনবহুল এই বাংলাদেশের জনজীবন ও প্রকৃতিতে তার করাল প্রভাব পড়ে। এ ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রিয় গ্রহ 'পৃথিবী'কে একটি নৌকার সাথে তুলনা করলে বলা চলে, শিল্প কারখানার একটিমাত্র উপাদান 'গ্রীনহাউজ গ্যাস' (GHG) নির্গমনের কারণে পৃথিবীর অবস্থাটা দাঁড়ায় ঝড়ের কবলে পড়া মাঝ সাগরের সেই অস্থির নৌকার মতো। পৃথিবী আজ অস্থির, বিপন্ন। যে কারণে পরিবেশ বা জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটি আজ বৈশ্বিক এজেন্ডা।

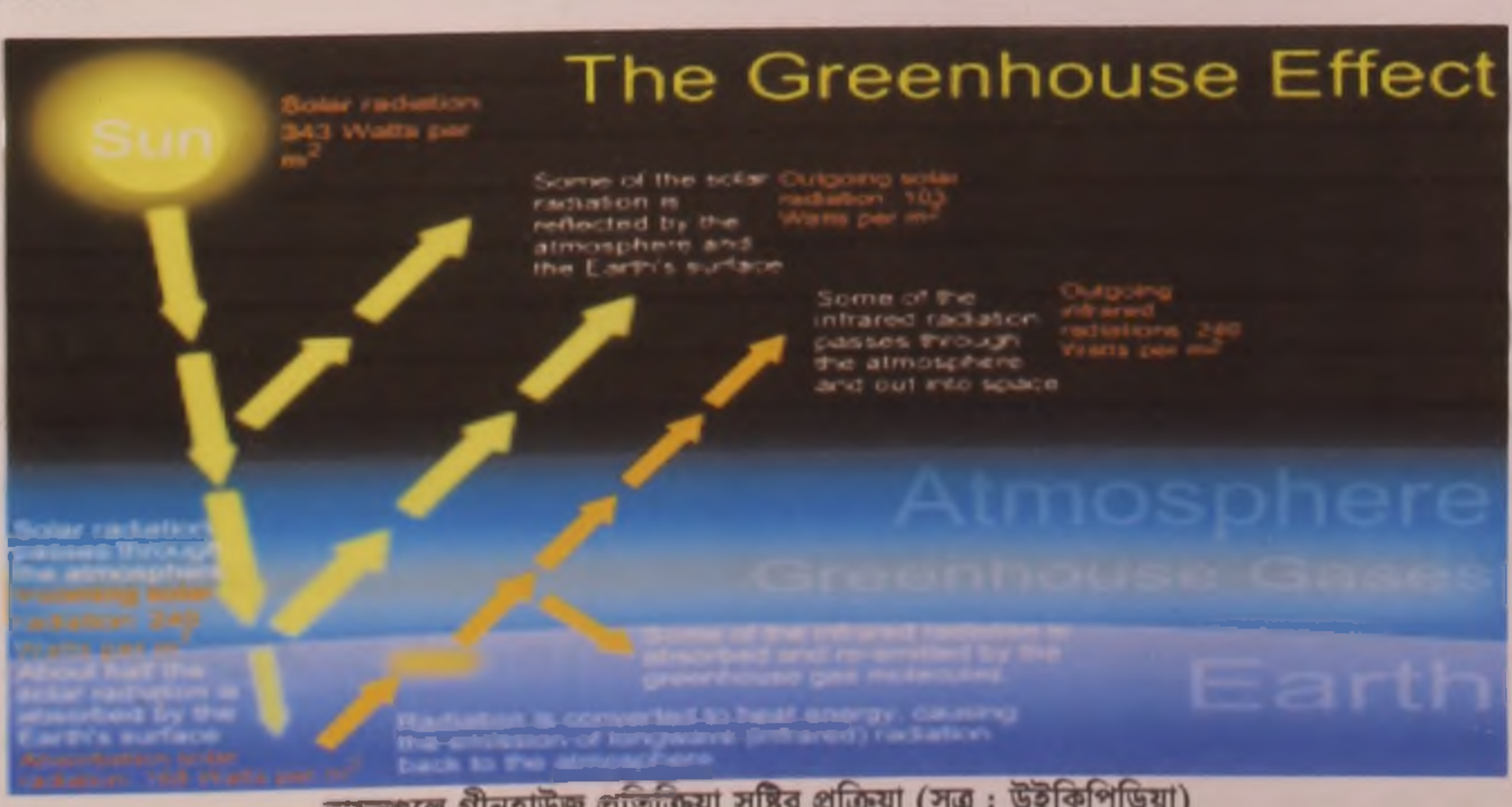

বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া (সূত্র : উইকিপিডিয়া)

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানীদের মতে, জলবায়ু যে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন হয় না তা নয়। কিন্তু তা পরিবর্তনের একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক চক্র আছে। প্রতি ১১বছরে, ১৫০০ বছরে, ৯হাজার বছরে, ২৬হাজার বছরে এবং ৪১হাজার বছরের চক্রে জলবায়ুর স্বাভাবিক পরিবর্তন হয় (এনওএএ, ২০১০)। তবে তা যেমন ধীরগতির, তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মেই নিরাময়যোগ্য। কিন্তু রেনেসাঁর পর থেকে বিশেষ করে ১৮৫০সাল নাগাদ শিল্প বিপ্লবের পর শিল্পোন্নত দেশগুলোর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও শিল্পের কাঁচামালের জন্য একপ্রকার প্রতিযোগিতা করে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস যে শুরু হয়, তা এখনও চলছে নির্বিচারে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মহামন্দার কালে তা আরও বেড়ে যায়। বিশ্বব্যাপী প্রবল আন্দোলন ও আলোড়ন সত্ত্বেও বরং এই বিশ্বমন্দার প্রভাব মোকাবেলা, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার বা বাজার দখলসহ অন্যান্য কারণে আগামীতে যে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনে কৃচ্ছতা সাধনের কথা বলা হচ্ছে, তা নাও হতে পারে- সেটা এই মুহূর্তে আশংকা করাই যায়।

বিজ্ঞানীদের এই এক গ্রীনহাউজ গ্যাসের ব্যাপারে এত উদ্বেগের কারণ হলো, সূর্য আমাদের এই ধরণীকে আলো দেয়। সূর্য থেকে যে আলো পৃথিবীতে আসে, তার বেশির ভাগই রেডিয়েশনের প্রভাবে বায়ুমন্ডলে ফিরে যায়। কিন্তু বায়ুমন্ডলে ফিরতি পথে বাতাসে থাকা গ্রীনহাউজ গ্যাস বা কার্বন কিছু তাপ শোষণ করে রাখে। গ্যাসে আটকে থাকা তাপমাত্রা পৃথিবীকে গরম করে তোলে। কিন্তু বাতাসে কার্বনের পরিমাণ সহনীয় থাকলে এমনটি ঘটতো না। সূর্যের তাপ মহাশূন্যে ফিরে যেতো। ধরণীর উষ্ণায়নের সম্ভাবনা থাকতো না। ফলে রক্ষা পেতো ধরণী ও মানুষ বা গোটা পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র।

কার্বন সাধারণত তিনটি উৎসে শোষিত হয়। সেগুলি হচ্ছে, গাছপালা, বায়ুমন্ডল ও অগভীর সমুদ্র। এগুলির মধ্যে বায়ুমণ্ডল একাই ৫৫% শোষণ করে। এরবাইরে গাছপালা ১৫-২০% ও সমুদ্র ২৫-৩০% শোষণ করে। কিন্তু বায়ুমন্ডলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কার্বন শোষণ না করা, গণহারে বৃক্ষ নিধন আর সাগরের ধারণ করার পর বাড়তি কার্বন বাতাসেই থাকছে যা সূর্যের তাপ ধারণ করার মাধ্যমে উষ্ণায়নেরই কারণ হচ্ছে।

জীবন ও জীবিকার জন্য মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী পুরোপুরি পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। বাতাস, পানি, মাটি, সবুজ অরণ্য, নদী-সাগর-মহাসাগর ও তাপমাত্রা ইত্যাদি এই পরিবেশের উপাদান। এই পরিবেশ বা প্রতিবেশের একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে। যার মাধ্যমে সে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু কার্বনের অতি উপস্থিতির কারণে যদি তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে উল্লেখিত কোন উপাদানই আর ঠিক থাকে না। তখনই প্রকৃতির রুদ্র-রূপ দেখা যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাতাস, পানি, মাটি ইত্যাদির মৌল বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আসে। বাতাস আছে বলেই পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল বেঁচে আছে। বাতাসে আছে অক্সিজেনসহ নানা উপাদান। শ্বাস-নিঃশ্বাসের জন্য একজন মানুষের দৈনিক অন্তত ১৬কেজি অক্সিজেন গ্রহণ করে। নিঃশ্বাস ছাড়ার মাধ্যম ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে ভোগ-বিলাস ও উৎপাদনে মানুষ কার্বন উৎপাদন করে, যা উল্লেখিত তিনটি আধার (বায়ুমন্ডল, সাগর, গাছপালা) ধারণ করে। কিন্তু বাতাস কার্বনমুক্ত না হলে অক্সিজেন মিলবে কোথায়। আবার বাতাসে কার্বন থাকলে তাপমাত্রা বাড়বে। এ অবস্থায় কেবল এই একটি

Dhaka University Institutional Repository

উপাদানের (কার্বন) কারণে মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন রক্ষাকারী অন্যান্য উপাদান পানি এবং বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তিমূল মাটিও আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পৃথিবী ধ্বংসের আয়োজন সম্পন্ন করবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কার্বন শোষণ ক্ষমতার কারণে বন ও সমুদ্রকে যথাক্রমে কার্বন আধার (Carbon-Sink) ও কার্বন-শোষক (Carbon-Sink) বলা হয়। পৃথিবীতে বিদ্যমান বনগুলোতে ২৮,৩০০ কোটি টন কার্বন রয়েছে। এরবাইরে নানাভাবে মজুদ থাকা কাঠের মধ্যে রয়েছে ৩হাজার ৮০০কোটি টান। আর পুরো প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা বাস্তুতন্ত্র শোষণ করতে পারে ৬৩হাজার ৮০০ কোটি টন কার্বন। সুতরাং কার্বনের প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে যেমন পরিবেশের ক্ষতি হয়, তেমনি সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র কার্বন শোষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসও করে। এটাই প্রাকৃতিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই'র মাউনালোয়াতে বিশ্ব কার্বন মাপা হয়। বিজ্ঞানীরা জানান, ২০০বছর আগে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ ছিলো ২৮০পিপিএম। বর্তমানে বাতাসে কার্বনের ঘনত্ব ৩৯৩ পিপিএম* ছাড়িয়ে গেছে। শিল্প বিপ্লবকালীন সময়ের চেয়ে যা ৩৯গুণ বেশি। কিন্তু এ পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ ৩৫০পিপিএমের নীচে নামিয়ে আনার সুপারিশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তা না হলে এবং বাতাসে কার্বনের পরিমাণ বর্তমান সময়ের ধারায় বাড়তে থাকলে ২১০০সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা হবে ৫.৮° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যদিকে গত ১০০ বছরে বাতাসের তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরমধ্যে শুধু ১৯৭০সাল থেকে এ পর্যন্ত রয়েছে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীদের মতে, ২০৫০সালের মধ্যে বাতাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৫ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে রাখতে না পারলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। একারণেই বাতাসে কার্বনের ঘনত্ব ৩৫০পিপিএমের নীচে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই ৩৩০পিপিএমের বেশি হয়ে গেলে ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনতে পারে। মার্কিন গবেষক এল ডেভিড রোপার (২০০৮) মনে করেন, বিগত ৬লাখ

466279

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

* পিপিএম-পার্টস পার মিলিয়ন (প্রতি দশ লক্ষে একটি কণার পরিমাণ)। এক টন পানির মধ্যে ১গ্রাম লবন থাকলে লবনের মাত্রা ১ পিপিএম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

Gas	Preindustrial level	Current level	Increase since 1750	Radiative forcing(W/m^2)
Carbon dioxide	280 ppm	393 ppm	113 ppm	1.46
Methane	700 ppb	1745 ppb	1045 ppb	0.48
Nitrous oxide	270 ppb	314 ppb	44 ppb	0.15
CFC-12	0	533 ppt	533 ppt	0.17

বাতাসে কার্বনসহ বিভিন্নধরণের গ্যাসের পরিমাণ
সূত্র : উইকিপিডিয়া

৫০হাজার বছরের মধ্যে বর্তমানে পৃথিবী সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মোকাবেলা করছে। অন্যদিকে পৃথিবীর সব থেকে গরম বছরগুলোর ১০টি রেকর্ড করা হয় গত ১৪বছরের মধ্যে। যারমধ্যে ২০১০সাল ছিলো প্রথম এবং ২০০৬সাল ছিলো ষষ্ঠ উষ্ণতম বছর)মেহেদী ও হক, ২০১১)।

আগেই বলা হয়েছে, এই উষ্ণায়নের কারণেই মূলত আমাদের সার্বিক পরিবেশ-প্রতিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। অন্যান্য নেতিবাচক ও করাল প্রভাবের মধ্যে একটি হলো সমুদ্রস্তর বৃদ্ধি। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীর ৯০ভাগেরও বেশি বরফ খনি এন্টার্কটিকায় (দক্ষিণমেরু)। সেখানকার বরফ গলার হার বেড়েছে বহুগুণে। বরফের বিশাল বিশাল খণ্ড (আইসবার্গ) অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এরইমধ্যে এন্টার্কটিকার পাইন আইল্যান্ড সংলগ্ন হীমবাহসহ* আরও বরফ গলতে শুরু করেছে আশংকাজনক হারে। দক্ষিণ পেনিনসুলার বিস্তৃত অঞ্চলের পশ্চিম এন্টার্কটিকা বরফখণ্ড যে পরিমাণ পানি ধরে রাখে যা গলে গেলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০ফুট বেড়ে যাবে। রাশিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় কয়েক হাজার বছর ধরে জমে থাকা বরফপুঞ্জ গলতে শুরু করেছে। সাইবেরিয়ার বরফে ঢাকা লেকগুলোর ১১ভাগ ইতিধ্যে গলে গেছে। এখানে চাপা পড়ে থাকা কয়েক বিলিয়ন টন আবর্জনা বেরিয়ে পড়লে এর মিথেন পৃথিবীর জন্য ভয়াবহ পরিণতির কারণ হবে।[৭] অবশ্য ইতিমধ্যে আলাস্কা খবরের শিরোনাম হয়েছে অতিরিক্ত তুষারপাতের কারণে। আলাস্কাসহ উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্ব উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এ রাজ্যটি এমনিতেই

* হিমবাহ হলো চলতে থাকা বরফের বিশাল স্তুপ বা নদী। শীতপ্রধান অঞ্চলে পর্বতের উপর জমে থাকা বরফ মাধ্যাকর্ষণের কারণে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলে তাকে হিমবাহ বলে।

[৭] Melting Permafrost Methane emissions : Another threat to Climate Change. http://terranature.org/ methanesiberia.htm

Dhaka University Institutional Repository

চিরতুষারের দেশ। আর্কটিক মেরুঅঞ্চলে অবস্থিত এ বিশাল রাজ্যে এমনিতেই বছরের বেশির ভাগ সময়ে বেশির ভাগ এলাকা তুষারে ঢাকা থাকে। এমন বরফের দেশে অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব তুষারের প্রাবল্যের কারণেই তারা খবরের শিরোনাম হয়েছে (চৌধুরী, ফখরুজ্জামান, ২০১২)। আবহাওয়াবিদরা বলেন যে, 'এল নিনো'* নামক এক প্রাকৃতিক বৈরি অবস্থার জন্যই জনজীবন বিপর্যয়কর এই তুষারপাত হয়। এরজন্য সেখানে জনজীবন অচল হওয়া ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জ্বালানি তেলের সরবরাহে ঘাটতি হয়। সেই ঘাটতি পূরণে অনেকটা ব্যর্থ হয় ফেডারেল সরকার। তখন তারা রুশ তেলবাহী ট্যাংকারের সাহায্য পর্যন্ত নিয়ে কেবলমাত্র নোম (রাজ্যের রাজধানী জুনু ও সবচেয়ে বড় শহর অ্যাংকোরেজ) শহরে জ্বালানি সরবরাহ করে।

আইপিসিসির সর্বশেষ মূল্যায়নে (২০০৭) দেখা যায়, উল্লেখিত এলাকাগুলোতে বরফ গলার কারণে ১৯৬১-১৯৯২ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে গড়ে ১.৮ মি. মি.। আর ১৯৯৩-২০০৩সালে এ হার বেড়ে দাঁড়ায় ৩.১ মি. মি.। এই হার অব্যাহত থাকলে একুশ শতকের শেষদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১৮ থেকে ৫৯ সে.মি. (৭-২৩ ইঞ্চি) বাড়বে (আইপসিসি, ২০০৭)।

বিজ্ঞানীরা বলেন, শুধু বরফ গলা নয়, তাপমাত্রা বাড়লে জলীয় বাষ্প, পানি স্ফীত হওয়া, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, মরুময়তা, রোগবালাই, কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব বা ফসলহানি, মৎসসম্পদ বিলুপ্তি, মিঠা পানির হাহাকার এককথায় গোটা পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপন্ন হয়ে দাঁড়ায়। জলীয় বাষ্প বা পানি কার্বন ও মিথেনকে সাথে করেই গ্রীনহাউস ইফেক্ট তৈরি করে। এই উষ্ণায়নের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, উষ্ণায়নে সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আর এটার কারণে যে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প তৈরি হওয়া ছাড়াও নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের পৌনঃপুনিকতা এবং ভয়াবহতা বাড়ছে। ১৯৭০-এর দশকে সংঘটিত মোট সাইক্লোনের শতকরা ২০ভাগের গতি ছিলো ২০০ কিলোমিটারের বেশি। আর ১৯৯০ সালে তা বেড়ে ৩৫ভাগ হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ ক্যাটাগরির সাইক্লোন বৃদ্ধির সঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে (নুস্টান, ২০১১)। দুরারোগ্য রোগ-বালাইও বাড়বে। কেননা, তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সাধারণত জীবানু ও জীবানুবাহীপতঙ্গের বিস্তার ও বিচরণক্ষেত্র বেড়ে যাবে। এখানেই শেষ নয়, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রোগ-বালাইসহ দুরারোগ্য মরণব্যাধি ক্যান্সারও দারুণভাবে বেড়েছে। বর্তমান বিশ্বে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে, শিল্পোন্নত দেশগুলো বিগত দিনগুলোতে সতর্ক থাকলে এ অর্থ সাশ্রয় হতো। বাতাসে কার্বন যৌগের কারণে এসিড বৃষ্টির সম্ভাবনাও বাড়বে। আর নদী ভাঙন, উদ্বাস্তু সৃষ্টি, দ্বীপরাষ্ট্রের সমুদ্র গর্ভে বিলীন হওয়া, সমুদ্রের স্রোতের গতিপথ পরিবর্তনের বাইরে সমুদ্রে মেলা নদীর মাধ্যমে লবন পানি ভূখণ্ডে প্রবেশ বা ভূমি চুইয়ে লবনাক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছ, ফসলহানি, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ইত্যাদি বাড়বে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে

---

* হিস্পানিক শব্দ এল নিনো। এর অর্থ হলো খুদে বালক। আবার কখনো শিশু যিশুও বলা হয়। কারণ দক্ষিণ আমেরিকা সংলগ্ন প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনোর উৎপত্তি হয় ডিসেম্বরে বড়দিনের কাছাকাছি সময়ে। প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুবরেখার চারপাশের জলপৃষ্ঠে আবহাওয়ার উষ্ণতার কারণে এল নিনোর সৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাদুপানির তীব্র হাহাকার দেখা দেবে। এমনকি এনিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে যেতে পারে। আইসল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট গ্রিমসন বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাতে পারে এই মিঠা পানির দখল নিয়ে।

আইপিসিসির রিপোর্ট অনুযায়ী এভাবে পৃথিবীর পরিবেশ-ব্যবস্থার কি পরিমাণ ও কেমন ক্ষয়ক্ষতি হবে, তার একটি ধারণা পাওয়া যায়। কম্পিউটার মডেল বিশ্লেষণ করে তারা পৃথিবীকে মোট ৮টি ভাগে ভাগ করে প্রভাব তুলে ধরেছেন। এরমধ্যে কয়েকটি প্রভাব হলো- এশিয়া : ২০৫০সাল নাগাদ মধ্য, দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিশেষ করে বড় নদীগুলিতে স্বাদু পানি কমে যাবে, মালদ্বীপ, বাংলাদেশসহ বিভিন্নধরণের দ্বীপ ঘন ঘন পানিতে ডুবে যাবে, বন্যা-খরার সঙ্গে ডায়রিয়া জাতীয় রোগের প্রকোপ ও মৃত্যুহার ব্যাপকভাবে বাড়বে ইত্যাদি। খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। আফ্রিকা : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০২০ সাল নাগাদ সাড়ে ৭কোটি থেকে ২৫কোটি মানুষ তীব্র পানীয় জলের সঙ্কটে পতিত হবে। বর্ষানির্ভর কৃষির উৎপাদন হ্রাস পাবে ৫০ভাগ। অভিযোজন খাতে জিডিপির ৫-১০% অর্থ ব্যয় হবে। ২০৮০সাল নাগাদ শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক এলাকা ৫-৮% বাড়বে। খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড : ২০২০ সাল নাগাদ গ্রেট ব্যারিয়ার ও কুইন্সল্যান্ড আর্দ্র বর্ষা অরণ্যসহ সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্রের প্রাণবৈচিত্র্য সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। দক্ষিণ ও পূর্ব অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের উত্তর ও পূর্বের কিছু এলাকায় ২০৩০সালের মধ্যে পানি সংকট দেখা দেবে। এছাড়া প্রচণ্ড খরা ও দাবদাহে কৃষি ও বনভূমি ব্যাপক হ্রাস পাবে। ইউরোপ : ভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও অবকাঠামোর ওপর প্রভাব ছাড়াও ঢলজনিত বন্যা, প্লাবন, ভাঙন, পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহ সংকুচিত, বরফের আবরণ হ্রাস, শীতকালীন পর্যটন হ্রাস, ২০৮০সাল নাগাদ ৬০% পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতি কমে যাওয়া, শস্য উৎপাদন হ্রাস পাবে। দক্ষিণ ইউরোপের ঝুঁকি বেশি। দক্ষিণ আমেরিকা : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বনভূমি আমাজানের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমি তৃণভূমিতে পরিণত, প্রাণবৈচিত্র্য হ্রাস, খাদ্যনিরাপত্তা হুমকি, পানি সংকট ইত্যাদি দেখা দেবে। উত্তর আমেরিকা : পশ্চিম অঞ্চলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পাহাড়ের বরফ গলা, শীতকালীন বন্যা, গ্রীষ্মে পানিপ্রবাহ হ্রাস, পানিসম্পদের ওপর প্রতিযোগিতা, বর্ষানির্ভর কৃষি ৫-২০% হ্রাসসহ কৃষি হুমকি, দাবদাহ আরও বৃদ্ধি ও মারাত্মক স্বাস্থ্য এবং উপকূলীয় এলাকায় বসবাস ঝুঁকিপূর্ণ হবে। মেরুঅঞ্চল : হিমবাহ, বরফস্তর ও সমুদ্রস্তর গলে যাওয়া, বাস্তুতন্ত্রের অবনতি এবং উভয় মেরুতেই প্রাণবসতি ঝুঁকি বাড়বে। ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র : সমুদ্রস্ফীতির কারণে নিমজ্জন, জলোচ্ছ্বাস, ভাঙন, উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকি রয়েছে। ফলে জীবন-জীবিকা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। স্থানীয় সম্পদের ওপর বিরূপ প্রভাব বাড়বে।২০৫০সাল নাগাদ ক্যারিবীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসহ অনেক দ্বীপরাষ্ট্রে পানিসম্পদ হ্রাস পাবে। মিঠা পানির হাহাকার হবে ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বহিরাগত প্রজাতির আগ্রাসন বাড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনের কারণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। কিন্তু এটা অর্থনৈতিক ক্ষতিরও কম কারণ নয়। ২০০৮সালকে মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের বছর হিসাবে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বছর সারা পৃথিবীতে দুর্যোগের কারণে ২০হাজার কোটি ডলার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানায় বিশ্বের বৃহত্তর বীমা

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানী মিউনিখ রে (যুগান্তর, ২০০৮)। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ নিকোলাস হারবার্ট স্টার্নের (Nicholas Herbert Stern) ২০০৬সালে 'Stern Review on the Economics of Climate Change' শীর্ষক ৭০০ পৃষ্ঠার এক বিখ্যাত প্রবন্ধ রচনা করেন। ওইবছরের ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত ওই প্রবন্ধে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়া হলে এতে প্রতিবছর সমগ্র বিশ্বের জিডিপির ৫ভাগ সমপরিমাণ ক্ষতি হবে (ইসলাম, সালমা ২০১২)। এতে আরও হুঁশিয়ারি দেয়া হয়, জলবায়ু পরিবর্তনকে অনিয়ন্ত্রিত রেখে দিলে বিশ্ব জিডিপির ২০% পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে। আর বর্তমান অবস্থার রাশ টেনে ধরতে কত ব্যয় হবে তাও এতে উল্লেখ করে বলা হয়, বিশ্ব জিডিপির মাত্র ১%-এরও কম। আর ২০০৯সালে বাংলাদেশের 'রিসার্চ গ্রুপের (ইআরজি) এক গবেষণায় বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ৫৯শতাংশ ব্যয়ই ঝুঁকিতে রয়েছে (যুগান্তর, ২০০৯)। অর্থ্যাৎ, একটি দেশের বার্ষিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য অংশ থমকে যাচ্ছে কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের নানাপ্রভাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কার্বন নির্গমনের ফলে ও যাদের কারণে গোটা পরিবেশ আজ চরম বিপন্ন সেইসব কুশীলব কারা। 'জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মকাঠামো সনদ' বা ইউএনএফসিসিসি* (ইউনাইটেড ন্যাশন্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) মনে করে, জলবায়ুর ত্বরিৎ ও ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলো দায়ী। এগুলো অ্যানেক্স-১ ভূক্ত দেশও বলা হয়। ওইসব দেশের মধ্যে দুষণের ও কার্বন নির্গমনের শীর্ষস্থান অনুযায়ী রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র (মাথাপিছু নির্গমনের পরিমাণ ১৮.৯ মে. ট.), অস্ট্রেলিয়া (১৭.৯), কানাডা (১৬.৯), জাপান (৯.৮), জার্মানি (৯.৬), যুক্তরাজ্য (৮.৯), স্পেন (৮.২), ইতালি (৭.৭), ইউক্রেন (৬.৯), ফ্রান্স (৬.০)। অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীনও রয়েছে দুষণের তালিকায়। এমনকি সাম্প্রতিককালে চীন ও ভারত দুষণে উন্নত অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়া পাকিস্তান, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, টোগো, মালদ্বীপ অন্যতম।

৪.৩ পরিবেশ : বাংলাদেশ পরিস্থিতি

বিশ্ব পরিবেশদুষণ আর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এখন বাংলাদেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে 'নগর পুড়িলে এড়ায় কী দেবালয়'র মতো। সর্বগ্রাসী বৈশ্বিক উষ্ণতা ও তার প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের যে বাস্তবতা তার জন্য বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলি মোটেই দায়ী নয়। বরং মাথাপিছু প্রাপ্য কার্বনটুকু পর্যন্ত পোড়ায় না এদেশ। কিন্তু জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য বিশ্বের বুকে এখন বাংলাদেশকে 'মডেল' বা 'ব্র্যান্ডিং' করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদফতরের এক দলিলে দেখা গেছে, কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের এই একটি বিষয়ের সাথে দেশের অন্তত ১৫টি খাত গভীরভাবে সম্পৃক্ত (ইসলাম, মনোয়ার ২০১২)। ওইগুলি হচ্ছে, খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অবকাঠামো, শিল্প, বাণিজ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাণিসম্পদ, ব্যক্তিগত

---

* ১৯৯৪ সালের ২১মার্চ এটি কার্যকর হয় এবং ১৯২টি দেশ এটি অনুমোদন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মস্থানের অংশ হিসাবে পশুপালন, বনসম্পদ, দারিদ্র্য, জেন্ডার সমস্যা, দেশের অভ্যন্তর ও উপকূলে আঞ্চলিক প্রভাব, আপদকালীন সংরক্ষণ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। সার্বিক পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র বলতে য়া বোঝায় তার প্রায় সবকিছুই এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আক্রান্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন বা কার্বন নির্গমান ছাড়াও বাংলাদেশের পরিবেশের নাজুকদশার জন্য আরও যে দিকগুলি চিহ্নিত করা যায়, সেগুলি হচ্ছে- কৃষিভিত্তিক ভূমি ও ভূমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ, কীটনাশক ও জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে দুষণ, বিভিন্নধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ও রাসায়নিকদুষণ, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প, বননিধন, নদীমাতৃক সমস্যা, জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি ও প্রতিবেশী আগ্রাসন, আর্সেনিক ও ভূগর্ভস্থ পানি হ্রাস, নগরায়ন ও আবাসন শিল্প, পাহাড় কাটা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্যে ভেজাল অন্যতম। পরিবেশের এই পরিবর্তন ও জলবায়ুর প্রভাবে খরা, বন্যা, মৌসুমী ঝড়, ভূমিকম্প, ফসলহানি, স্বাস্থ্যগত নানা সমস্যা, বেকারত্ব, মৃত্যুহার বৃদ্ধিসহ নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে। এরজন্য সরকার ও জনগণকে কোটি কোটি টাকা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি গুণতে হচ্ছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এক দলিলে দেখা যায়, বিগত তিন দশকে জলবায়ু পুনর্বাসন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষায় ১০বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে (ইসলাম মনোয়ার, ২০১২।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতির যাত্রাও কৃষিনির্ভরতা দিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পেশা পরিবর্তন করেছে অনেকে। এরপর এখনও দেশের ৭৭% মানুষ কৃষিজীবী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশে খাদ্য চাহিদা ব্যাপক। বিপরীত দিকে খাদ্য ঘাটতি পূরণে সরকারি পর্যায় থেকে অধিক ফসল ফলানোর গতশতকের আশির দশকে 'সবুজ বিপ্লব' নামে ক্যাম্পেইন চালানো হয়। এ কারণে অধিক ফসলের আশায় কৃষিতে সনাতনী বীজের জায়গা দখল করেছে হাইব্রিড ও বিদেশী বীজ। চিরাচরিত চাষাবাদ পদ্ধতি ও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে রাসায়নিক সার, ডিডিটিসহ নানা কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এতে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যাভাব কমেছে ঠিকই, কিন্তু এই নির্ভরতা নিজস্ব কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে ও কৃষির প্রাণবৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট করেছে। খাদ্য ও কৃষিতে ব্যবহৃত উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অনুজীবের জাত ও জাতের ভিন্নতাই কৃষি প্রাণবৈচিত্র্য। এরমধ্যে রয়েছে খাদ্য, পশুখাদ্য, আঁশ, জ্বালানী এবং ভেষজ খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন জাত ও প্রজাতিসমূহ। উৎপাদন সহায়তাকারী হিসাবে আছে মৃত্তিকা, অণুজীব, প্রিডেটর, পলিনেটর ইত্যাদি। কৃষি প্রাণবৈচিত্র্যে মাটি, পানি, বিভিন্ন জাতের পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, ফলমূল, লতাপাতা, মানুষসহ সবকিছুকেই বিবেচনা করা হয়। কারণ সবগুলিই পরস্পর যুক্ত। কিন্তু সমস্যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভূত-ভবিষ্যত বিবেচনা ছাড়া নির্বিচারে বিদেশী বীজসহ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে। বিদেশী গাছপালা রোপইের সমস্যা। এরফলে কৃষির প্রাণবৈচিত্র্য আজ বিলুপ্ত। পৃথিবীতে একসময়ে ৮০হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি নিজেদের বৈচিত্র্যময় খাবার তৈরি করত। কিন্তু বর্তমানে মানুষ খুব অল্পসংখ্যক উদ্ভিদ প্রজাতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে মাত্র ৩০টি প্রজাতি ৯৫ভাগ খাদ্য উৎপাদনে নির্ভরশীল। প্রকৃতির লাঙ্গল কেঁচো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর জমিতে। আধুনিক সার, রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারে হয়তো অধিক ফলন বা কৃষি বিপ্লব হয়েছে। কিন্তু তা নিধন করেছে দেশী প্রাণবৈচিত্র্য। একসময়ে কৃষি জমিতে বিভিন্নধরণের মাছ, ব্যাঙসহ প্রাণী পাওয়া যেতো। মানুষ গরু, ছাগল, মহিষসহ বিভিন্ন প্রাণী পালতো। কিন্তু মাছের অসংখ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রজাতি আর গৃহপালিত পশুর অর্ধেক জাত আজ বিলুপ্ত। গরু-মহিষের স্থান ট্রাক্টর দখল করেছে। একই ঘটনা ধান, পাট, আলুসহ বিভিন্ন ফসলের প্রজাতির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। দেখা গেছে, এসব বিলুপ্ত ধানের জাত, উদ্ভিদ, পশু ও মাছ বিদেশী প্রজাতি দিয়ে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে সুফল মেলেনি। কেননা হাজার বছরের অভিযোজন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী পাশাপাশি বসবাস করে। দেখা গেছে, দেশী মাগুরের পরিবর্তে আফ্রিকার মাগুর প্রতিস্থাপনের চেষ্টার সুফল পাওয়া যায়নি। বরং যে পুকুরে তা চাষ করা হয়েছে, সেই পুকুরের অন্যান্য মাছ ও প্রাণী সাবাড় করার কারণে তা রাক্ষুসে মাছ হিসাবে আখ্যা পেয়েছিলো। এভাবে বিদেশী বৃক্ষ রোপনের কারণে দেশী কীটপতঙ্গ সেখানে আর টিকতে পারে না। হয় সেগুলি পার্শ্ববর্তী দেশী জাতের বৃক্ষবনে আশ্রয় নেয় কিংবা মারা যায়। আবার বৃষ্টি ও পুকুর-খালে সংরক্ষিত পানির সেচের কৃষির পরিবর্তে গভীর-অগভীর নলকূপের পানির সেচ নির্ভর হয়ে পড়েছে আমাদের কৃষি। এতে একদিকে মেশিন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎপাদন খরচ বাড়ছে। অন্যদিকে ভূগর্ভের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করছে। আর্সেনিক মানুষের জন্য আরেক ভয়ংকর বিপদ। ভূগর্ভের পানিতে সেচ করায় সেই পানিতে আর্সেনিক মিশ্রনে উৎপাদিত ফসলও মানবস্বাস্থ্যের জন্য অশনি সংকেত নিয়ে এসেছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তা আরেক বাস্তবতা। সেখানে মাইলের পর মাইল ঘুরে মিঠা পানি বা ভূ-অভ্যন্তরে নলকূপ বসিয়েও পানি মেলে না সচরাচর। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মাত্রাতিরিক্ত চাষাবাদ, নিয়ন্ত্রণহীন বৃক্ষনিধন, বনভূমির অবলুপ্তি, ব্যাপক ভূমিক্ষয়, ত্রুটিপূর্ণ সেচ ব্যবস্থা, ভূগর্ভের পানি উত্তোলন, নদীর শুষ্কতা ইত্যাদি কারণে মরুকরণ হচ্ছে। সরেজমিনে দেশের বরেন্দ্র জেলা নওগাঁয় দেখা গেছে, মরুকরণ আর সেচের পানির অভাবে সেখানে ফসলী জমিতে মানুষ এখন আম বাগান করছে।

পরিবেশের আরেক শত্রু হলো কৃষি ও প্রাণবৈচিত্র্যের জৈবপ্রযুক্তি। দুধ থেকে দই এবং চিনি থেকে মদ তৈরি একধরণের জৈবপ্রযুক্তি। দুই প্রজাতির গরুও সংকরণের মাধ্যমের বাছুর তৈরিও এধরণের প্রযুক্তি। কিন্তু জীব দেহের কোষ পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে বর্তমানে এমন জৈবপ্রযুক্তি করা হচ্ছে যা পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের হুমকিস্বরূপ। এটা প্রকৃতিতে সম্ভব নয়। যেমন টমেটোতে মাছের বংশানু দেয়া হচ্ছে। এরফলে উৎপাদিত টমেটো পচে না। টিস্যু কালচারও একধরণের জৈবপ্রযুক্তি। এভাবে কৃষি ও তৎসংলগ্ন পরিবেশে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বেশি অবদান রাখছে অতি মুনাফালোভী বহুজাতিক কোম্পানীগুলো।

অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্রিটিশদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিলক্ষিত হয়। ১৭৫৭সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা দখল করে। এরপর তারা বিভিন্নসময়ে এ অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। তবে ১৯৪৭সালে দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশ শিল্পায়ন শুরু করে। যদিও বাংলায় শিল্পের ইতিহাস ২০০০বছরের। অর্থ্যাৎ খ্রিস্টীয় প্রথম শতকেই ঢাকাই মসলিন ইউরোপের বাজারে পরিচিত ছিলো (টেলর, ২০০১)। তার মানে হলো, যে পণ্য রফতানি মান অর্জন করে, নিশ্চয়ই তার উদ্ভব আরও আগে। ১৮৪০সালে কলকাতা মিলিটারি অরফ্যান প্রেস থেকে প্রকাশিত 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' (কোম্পানী আমলে ঢাকা) গ্রন্থে জেমস টেলর জানান যে, সরেজমিন অনুসন্ধানে তিনি তখন (গ্রন্থ প্রণয়নকালে) বয়ন, তুলা থেকে সুতা তৈরি ও তুলা কাটার সূচীশিল্প, সাবান, চামড়া, তাম্রনির্মিত বাসন-

Dhaka University Institutional Repository

কোসন, ধৌতকরণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং শঙ্খবলয় তৈরি ইত্যাদি শিল্পের অস্তিত্ব পেয়েছেন। ব্রিটিশ আমলে কৃষি পণ্যের মধ্যে বাংলাদেশ শুরু থেকেই পাটে সুনাম অর্জন করে। ১৮০৫সালে বাংলাদেশ থেকে ১০লাখ ৮২হাজার ২৭৫টাকার পাট রফতানির রেকর্ড জানা যায় (আলী, ২০১০)। এই অবস্থায় বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট কলকাতাসহ দেশের বাইরে রফতানি হতে থাকে। কলকাতার ১০৮টি পাটকলের ৭১হাজার ৩শ' তাঁত তো বাংলার পাটের ওপরই নির্ভরশীল ছিলো। এ অবস্থায় ১৯৫১সালে বাংলায় বাওয়ানী নামে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। একইবছর আদমজী জুট মিলও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০সাল পর্যন্ত মোট ৭৭টি পাটকল স্থাপিত হয় বাংলায়। এভাবে বাংলাদেশে শিল্পের যুগ শুরু ও বিস্তার লাভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ছোট-বড় নানানধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। দেশের প্রধান শিল্পের মধ্যে বর্তমানে পাট, বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, সার, ট্যানারি, তেল পরিশোধনাগার, জাহাজ ভাঙ্গা ও নির্মাণ, ডাইং, লৌহ-ইস্পাত ইত্যাদি শিল্প রয়েছে।

উন্নতি আর শিল্প অগ্রগতি- আধুনিককালে এই দু'টো পরিপূরক শব্দ। তাই উন্নতি চাইলে শিল্পের বিকাশকে প্রশ্রয় দিতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে শিল্পবিপ্লব মানবজীবনে গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। কিন্তু এর বিপরীত দিকও রয়েছে। শিল্প বিস্তার প্রাণী, উদ্ভিদ, জীব বৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। দেশের অধিকাংশ শিল্প কোনও না কোন নদীর তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত। এছাড়া বেশকিছু আছে ফসলি জমি ও ভূমি সংলগ্ন। এক্ষেত্রে টঙ্গী, গাজিপুর, জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ, সাভার, মানিকগঞ্জ এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরের দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে যে অপরিশোধিত রাসায়নিক বর্জ্য বের হয়, তা পানিতে মিশে মাছসহ সার্বিক জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে। কার্বন নিঃসরন করে গ্রীনহাউজে অবদান রাখছে। আছে শব্দদুষণও। চট্টগ্রামে বঙ্গোপসাগর ঘিরে গড়ে উঠেছে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প। পুরনো জাহাজ ভেঙ্গে তা পুনরায় শিল্পে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই প্রক্রিয়ায়। দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে মোট চাহিদার ৯০% পূরণ করে এই জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ইস্পাত। এই জাহাজ ভাঙ্গার ফলে অর্থনৈতিক আর যে লাভই হোক না কেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়। যে কারণে গত শতকের সত্তরের দশকেই উন্নত দেশগুলো জাহাজ ভাঙ্গা বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে তা এশিয়ায়, তাইওয়ান, চীন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে বিকাল লাভ করে। এখানেই শেষ নয়, পরিবেশ মারাত্মক দুষণের বিষয়টি মাথায় রেখে তাইওয়ানও এশিয়ার মধ্যে প্রথম তা বন্ধ করে দিয়েছে। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ওপর বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী গবেষণা হয়েছে। মর্টন রোনিং (Morton Ronning) ২০০০সালে 'Stuck in the Mud : On Shipbreaking labour Condition and Environment in Chittagong Bangladesh' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, এরফলে সাগর ও উপকূলীয় প্রাণবৈচিত্র্যে সংকট তৈরি করেছে। যে কারণে অনেক জেলের পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কানাডার এক গবেষণায় দেখা গেছে, জাহাজ ভাঙ্গার কারণে সে দেশের বাতাসে সীসার পরিাণ বেড়ে যায়। একারণে তারা জাহাজ ভাঙ্গা বন্ধ করে দেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Impact of Ship scrapping in the Costal Environment of

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায়, ভূমিক্ষয়, তৈলদুষণ, ধাতব পদার্থের দুষণ, বিষক্রিয়া জনিত দুষণ ইত্যাদি ঘটিয়ে সাগরের পরিবেশ বিপর্যস্থ হচ্ছে। সামুদ্রিক পরিবেশ অবক্ষয়ের ফলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে মৎস ও অন্যান্য প্রাণীর ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে (আলী, ২০১০)। ২০০০ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) কর্তৃক পরিচালিত আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প থেকে বিলজ ব্যালাসড পানি, রং ও কোটিং, এজবেস্টস, পিসিবিসহ বিভিন্ন নামের রাসায়নিক দ্রব্য বের হয় যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এসব উপাদান সমুদ্রের মাছের প্রজনন বন্ধ, প্রজাতি বিপন্ন, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, মাটিদুষণ, শব্দদুষণ ও কম্পন, বনজস্পদ বিপন্ন করে।

ট্যানারি আরেক শিল্প যা পরিবেশের ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে। বাংলাদেশে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রথমে নারায়নগঞ্জ ও পরে পুরান ঢাকার হাজারিবাগে ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়। সারাদেশে ২শতাধিক ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বছরে অন্তত আড়াই কোটি পিস কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাত হয়। চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে গিয়ে নানাধরণের জৈব, অজৈব, বর্জ্যপদার্থ ও বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এগুলো একইসঙ্গে পানি, বাতাস, মাটিকে দুষিত করছে। ট্যানারি থেকে বর্জ্য হিসাবে যে দুষিত পানি বের হয়, তারমধ্যে প্রাণনাশক ক্রেমসল, ক্রোমিয়াম, এমনকি আর্সেনিকের মতো বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে। আরও রয়েছে, পচনশীল জৈব পদার্থ, দ্রবীভূত লবন, চর্বি, রক্ত, সালকার ফসফেট ইত্যাদি। হাজারিবাগের ট্যানারি থেকে এগুলো বুড়িগঙ্গা নদীতে মিশছে। এগুলো পানিতে মিশলে পানির অক্সিজেনের পরিমাল হ্রাস পায়। অপরদিকে এই শিল্প বাতাসও দুষণ ঘটায়। ট্যানারি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয় প্রতিদিন যা বায়ুদুষণ করছে। এছাড়া যেসব জৈব ও তরল পদার্থ বের হয় তা মাটির দুষণ করছে।

ট্যানারির মতো সার কারখানাগুলোও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ সার কারখানা হলো যমুনা সার কারখানা। এটি প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক তরল বর্জ্য পাইপযোগে যমুনা নদীতে ফেলছে। সেই সঙ্গে সেখানে উৎপাদিত অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক গ্যাস চিমনিযোগে বায়ুমণ্ডলে ছাড়ার ফলে আশেপাশে ১০কি.মি. এলাকায় পরিবেশ বিপর্যায়ের আশংকা তৈরি হয়েছে। কারখানা সংলগ্ন নদী ও জলাশয়ে মৎসসম্পদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চাষাবাদের ক্ষেত্রেও পড়েছে বিরূপ প্রভাব। একইদশা জনস্বাস্থ্যেরও। সংশ্লিষ্ট এলাকায় মানুষের হাঁপানী, ব্রংকাইটিস, জটিল পেটের পীড়াসহ বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এভাবে অন্যান্য সার কারখানাও পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করছে।

আধুনিক সভ্যতার আরেক আশচর্যজনক ও দৈনন্দিন মানবজীবনের অত্যাবশ্যক পরিসেবার নাম হলো মোটর যান। জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক অবস্থা, ক্রয়ক্ষমতা আর শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির সাথে এধরণের যানবাহনও বাড়ছে। কার্বন নির্গমনের আরেকটি খাত হলো এই যানবাহন। একদিকে কিছু যানবাহন রয়েছে যা কালো ধোঁয়া ছাড়ছে, অন্যদিকে ভালো রূপে বিবেচিত গাড়িগুলিরও নির্গত ধোয়া কার্বন তৈরিতে সহায়তা করছে। যানবাহনের ধোঁয়া ছাড়াও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বায়ুমণ্ডলে ছাড়া কার্বনের কারণে ঢাকার বাতাসে কার্বন ও সীসার

Dhaka University Institutional Repository

আধিক্য বেশি। বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকার বাতাসে সীসার পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে ৪৬৩ ন্যানোগ্রাম। বাতাসে যেসব উৎস থেকে সীসা যুক্ত হয় তার ৯০ভাগই অবদান রাখছে যানবাহন। পরিবেশ অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী কালো ধোঁয়া সৃষ্টিকারী গাড়িগুলো সীসার বাইরে কার্বন মনোঅক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন বাতাসে ছাড়ছে। ফলে যানবাহনও ওজনস্তরের ক্ষয়, এসিড বৃষ্টি, ভূ-মণ্ডলের উষ্ণতা, গ্রীন হাউজ ইত্যাদি সমস্যায় অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের পরিবেশ নষ্টকারী আরেক শিল্প হচ্ছে ডাইং। ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা নারায়নগঞ্জের শীতলক্ষা নদীর তীরে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে এই শিল্প। এসব কারখানার কেবল তার রাসায়নিক দুষিত বর্জ্য শীতলক্ষার পানিতেই ফেলছে না; এরমাধ্যমে নদীর পানিদুষণ করে প্রকারান্তরে সেচের পানির সংকট, জমির উর্বরতা হ্রাস, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করেছে। ঢাকার আরেকদিকে সাভার, নবীনগর, জয়দেবপুর, সফিপুর, চন্দ্রা,নরসিংদীর কয়েকটি উপজেলা, নারায়নগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলা ইত্যাদি এলাকায়ও ডাইং মিল রয়েছে। এককথায় সারাদেশে গড়ে ওঠা ছোট-বড় বিভিন্ন ডাইংও পরিবেশের ক্ষতি করছে। দুষিত রাসায়নিক বর্জ্য নির্বিচারে নিষ্কাষণের কারণে কারখানার আশপাশ এলাকার জমিতে আর চাষাবাদ হয় না। মাছসহ জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির পথে।

নগরায়ন মানবসভ্যতার অন্যতম মৌলিক ও প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। হালে শুরু হয়েছে আবাসন ব্যবসা। এই আবাসন ব্যবসাকে অবশ্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আবাসন সন্ত্রাস বলতে চাই। কৃষি জমি, জলাভূমি, মানুষের বসতবাড়ি, নদী-খাল কোনও কিছুই রেহাই পাচ্ছে না এই আবাসন ব্যবসায়ী নামক ভূমি দস্যুদের হাত থেকে। এরাই আমেরিকা-ইউরোপসহ বিশ্বে চলমান মহামন্দায় অবদান রেখেছে। রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী চারদিকে সরেজমিন পরিদর্শনে এবিষয়টিই প্রমাণ দেয়। উন্নততর জীবনযাপন পদ্ধতির দিকে গমনই করেছে মানুষ নগরায়নের মধ্যদিয়ে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ আর আমাদের ভূমি সংকটের কারণে আবাসন ব্যবসায়ীদের অ্যাপার্টমেন্ট র্নিমাণের উদ্যোগ হয়তো প্রয়োজন রয়েছে। তারা নগরায়নে দ্রুত অবদানও রাখতে পারে। কিন্তু এই নগরায়নের সঙ্গে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ধ্বংসের সম্পর্ক রয়েছে। এই পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর ভর করেই মানুষ তার সভ্যতা গড়ে তুলেছে। নগরায়ন নিঃসন্দেহে মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে নানা সুখের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই সুখের ব্যবস্থা করতে গিয়ে বনউজার, ইটের প্রয়োজনে ইট ভাটা তৈরি, ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার, পাহাড় কর্তন, জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি, সালোক সংশ্লেষণ ইত্যাদি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আর এসবের ফলে যদি বাস্তুতন্ত্র তার বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা হারায়, তাহলে সেই নগরায়ন গ্রহণযোগ্য কিনা সেটাই ভেবে দেখার বিষয়।

সর্বোপরি পরিবেশ সমস্যার মৌলিক কারণ হলো অধিক জনসংখ্যা সমস্যা। অর্থ্যাৎ, অধিক মানুষের জন্য জীবনজীবিকার জন্য অধিক অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, যানবাহন, ওষুধ এক কথায় মানুষের সাধারণ চাহিদা এবং একপর্যায়ে উচ্চাভিলাসী ভোগবিলাস পরিবেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। উপরে সভ্যতার উন্নতির নিদর্শনস্বরূপ কৃষি ও শিল্পের অবাধ বিস্তার, নগরায়নসহ যে সব বিষয় আলোচনা করা হলো, তার সবকিছুই যেমন মানবসভ্যতার তরে, তেমনি এসবই পরিবেশের প্রধানতম উপাদান পানি, বায়ু, মাটি, শব্দদুষণসহ

Dhaka University Institutional Repository

তেজস্ক্রিয় পদার্থের দুষণ, বর্জ্য ও রাসায়নিক দুষণের কারণ। এসবের মধ্যে কার্বন নির্গমন থেকে বায়ুদুষণ ও উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন, এর থেকেই গোটা পরিবেশ আজ ধ্বংসের কিনারে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর এই বাড়তি জনসংখ্যা বা জনসংখ্যার চাপ বেশি দিনের নয়। মানুষের সূচনা থেকে খ্রিস্টের জন্ম পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিলো ৩০কোটি। পরবর্তী ১৫০০বছর পর্যন্ত জনসংখ্যার হার একই রকম ছিলো (রাশিদা আখতার খানম, ২০০৯ : ১০১)। কিন্তু এরপর শিল্পবিপ্লবকালে জনসংখ্যা বিপুল হারে বাড়ে। ১৮০০সালে এই সংখ্যা ১০০কোটিতে পৌছে। এরপর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ম্যালথাসের তত্ত্বই যেন অনুসরণ করে। পরবর্তী ১৩০বছরে ১০০ কোটি (১৯৩০সালে ২০০কোটি) বাড়লে এরপরের ৩০বছরে বা ১৯৬০সালে ৩০০কোটিতে পৌছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এর পরের ইতিহাস নাটকীয়। ১৯৭৫সালে ৪০০কোটি, ১৯৮৭সালে ৫০০কোটি, ১৯৯৯সালে ৬০০কোটি এবং ২০১১সালের ডিসেম্বরে ৭০০কোটিতে পৌছে। বাংলাদেশ বিশ্বের মোট ভূখণ্ডের মাত্র ০.১ভাগ স্থল নিয়ে একটি দেশ। অথচ এর জনসংখ্যা বিশাল ১৭কোটিরও বেশি যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ২.৪২%। এই বিশাল জনসংখ্যাই যেমন দেশের পরিবেশের জন্য একটি সমস্যা, তেমনি এই জনসংখ্যার ভোগের বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদনের কৃষি ও শিল্প এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিবারের পরিবেশদুষণ ও কার্বন নির্গমন সমস্যার নির্মম শিকার বাংলাদেশ। কার্বন নির্গমন থেকে উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে যে অন্তত ১৫টি খাত আক্রান্ত হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভয়াবহ তাপপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা ইত্যাদি দেখা দেবে। (BCCSAP, (2009), p-1)। এরবাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে আইপিসিসির ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যে সমস্যা মোকাবেলা করবে, বাংলাদেশকেও সেগুলি করতে হবে। এই সাথে প্রতিবেশী দেশের পানি আগ্রাসন যে হারে দিন দিন বাড়ছে, তাতে আইপিসিসি ভবিষ্যদ্বাণী ও নির্দেশিত সময়ের আগেই এই দেশ ও দেশের মানুষ যে নিশ্চিহ্ন হবে না, তা নিশ্চিত করার কোনও ইতিবাচক দিক নেই। কেননা, বাংলাদেশে যেসব বড় বড় নদী নদী রয়েছে, তার বেশির ভাগের উৎস ভারতে। ভারত এক ফারাক্কা বাদ দিয়ে ইতিমধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চল মরুকরণ করে ফেলেছে। যমুনা আর পদ্মা নদীর অস্তিত্ব ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিতে চলেছে। ওই দু'নদীর বুকে ধু ধু বালুরাশি। লবনাক্ততার কথা বলা হলেও বড় নদী পদ্মা-যমুনায় পানি প্রবাহ কমার কারণে বঙ্গোপসাগরের লবন পানির অস্তিত্ব এখনই দেশের ভেতরে পাওয়া যাচ্ছে। একদিকে পাকশি আরেকদিকে ভৈরব পর্যন্ত পৌছেছে লবন। ষড়ঋতুর দেশ তিন ঋতুতে পরিণত হয়েছে অনেক আগেই। এখন যা দেখা যাচ্ছে তা হলো শীত ও বর্ষার সীমা কমে গ্রীষ্মের আকার বড় করেছে। ভরা বর্ষায়ও যেমন বৃষ্টির দেখা মেলে না, তেমনি পৌষ-মাঘেও শীত দেখা মেলে না। এসবই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। আর জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাবের সঙ্গে শীত ও বর্ষাকালীন ফসলাদিসহ নানা কিছুর উৎপাদন ও প্রজনন জড়িত, যা বিঘ্নিত হচ্ছে। পরিবেশদুষণ এর অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে বন্যা বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, বন্যাপ্রবণ দেশের মানুষের জন্য তা ভয়ের কিছু নয়। কিন্তু এক বন্যার ক্ষতি ও ধকল কাটিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ওঠার আগেই যদি আরেক বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে, সেই ধাক্কা কীভাবে সামলাবে মানুষ ও সরকার। ২০০৭সালে একইবছর দু'টি বন্যার আবির্ভাব ও এরআগের বন্যাগুলির বছর গণনায় সময়ের দুরত্ব কমে যাওয়ায় এ আশংকা। ২০০৮সালে ২ মে নার্গিস ও ২৭অক্টোবর রশ্মির নামক ঘূর্ণিঝড় হয়। পরের বছরই আবার ২৬মে আইলা আঘাত করে। সেই আইলার ক্ষত এখন খুলনা, বাগের হাট, বরগুণার মানুষ বহন করছে। সরকারের ধারণা, এই তিন বন্যায় মোট ১১৩বিলিয়ন টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সরকার মনে করছে, এধরণের বন্যায় কমপক্ষে সাড়ে ৪কোটি মানুষ আক্রান্ত হবে। ২০০৭সালের বন্যায় ৩০লাখ ঘরবাড়ি নষ্ট হয়। একই অবস্থা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে। সর্বশেষ ২০০৮সালের ২৮জুলাই মাত্র ৬ঘন্টার বৃষ্টিতে ঢাকা শহরের অনেক রাজপথে রিকসা চলে। বিপরীত দিকে পরের বছর ২০০৯সালেই খরা দেখা দেয়। সেইবছর মৌসুমে ২১ভাগ কম বৃষ্টিপাত হয়। ১৪বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা ৪২.০৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় যশোরে। এছাড়া ২০০৭সালে দেশের সবচেয়ে কম তাপমাত্রা ৫ডিগ্রি হয়েছিলো উত্তরের তিন জেলায় যা ৩৮বছরের রেকর্ড। সুতরাং আবহাওয়ার রুদ্র আচরণ অব্যাহত আছে। আবার খাদ্য নিরাপত্তা এই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম হুঁশিয়ারি। আইপিসিসি বলছে, ২০50সাল নাগাদ বাংলাদেশে চাল উৎপাদন কমবে ৮% আর গ ৩২%। বাংলাদেশ সাধারণত চীন ও ভারত থেকে খাদ্য শস্য আমদানি করে থাকে। ওই দু'দেশেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় দেশের সম্ভাব্য খাদ্য সংকট বড় ঝুঁকি। সমুদ্রস্তর বাড়লে এবং দেশের এক-চতুর্থাংশ ডুবলে ২ থেকে আড়াই কোটি লোক বাস্তুহারা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বড় শিকার হবে নারীরা। এখনই দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে আইলা ও সিডরের কারণে মিঠা পানির হাহাকার। খরার কারণে দেশের উত্তরাঞ্চলেও একইদশা। গৃহস্থালীসহ দৈনন্দিন মিঠা পানির প্রয়োজনে পানি সংগ্রহে নারীদেরই বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে টিউবওয়েলের মিঠা পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতিবেশী বা পানির মালিকের বর্বরতার শিকার হয়েছে দু'শিশু। তাদের গায়ে আগুণ ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। (দৈনিক যুগান্তর, মার্চ ২০১২)। আবার সমুদ্রের পানি বাড়লে উপকূলের কৃষি যেমন ধ্বংস হবে, তেমনি শিল্পায়নও বিঘ্নিত হবে। বাংলাদেশের অকৃত্রিম প্রাকৃতিক বন্ধু ও নিরাপত্তা বেষ্টনী সুন্দরবনের তো এখনই মরণদশা। লবনাক্ততার কারণে বিভিন্ন বৃক্ষ যেমন মরে যাচ্ছে, তেমনি বাঘসহ বিভিন্ন পানিরও জীবন হুমকির মুখে। অন্যান্য জীববৈচিত্র্য একইভাবে বিপন্নদশায় রয়েছে। এককথায় উপকূলীয় এলাকায় সর্বব্যাপী ভূ-প্রাকৃতিক সমস্যা বেশি দেখা দেবে যা মানুষের আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ সীমিত করে তুলবে (আহসান উদ্দিন আহমেদ, ২০০৮ : ১৪)। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় এর প্রভাব পড়বে। যেমন : ২০১১সালের রমজান মাসে সারাদেশের রাস্তার নাজুক দশার পেছনে তখনকার অতিবৃষ্টিকে দায়ী করা হয়েছিলো। বৃষ্টিতে সড়কের বিটুমিন (পাথর ঢালাই) উঠে যায়। ফলে সড়ক যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশদুষণের সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেবে জনস্বাস্থ্যে। উল্লেখিত সব দুর্যোগের কেন্দ্রে যেহেতু মানুষ থাকবে, তাই মানুষকে ডায়েরিয়া, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, আমাশয়সহ নানা রোগে আক্রান্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ। সূত্র : পরিবেশ অধিদফতর

৪.৪ পরিবেশ : ভিন্নমত

পরিবেশদুষণের বিষয়টি বিশ্ববাস্তবতা। এনিয়ে ভিন্নমত নেই। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তন ও এরপ্রভাব নিয়েও নেই তেমন ভিন্নমত। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের হার কতটা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভিন্নমত দেখা দেয়। আর এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ওপর মানুষের আস্থাও কমেছে। ২০১২সালের ২৭জানুয়ারি ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত এক নিবন্ধের শিরোনামই ছিলো 'বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে আতঙ্কের কিছু নাই' (No Need to Panic About Global Warming)। এতে উপ-শিরোনামে (Sub-Heading) বলা ছিলো ,'বিশ্ব অর্থনীতিকে 'ডিকার্বোনাইজড' করতে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়ার পেছনে বাধ্যতামূলক বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই' (ইন্টারনেট, ২০১২)। নিবন্ধটি ১৬জন বৈজ্ঞানিকের লেখা। তাদের দাবি, জলবায়ূ পরিবর্তন আদতে একটি ফন্দি। এরমাধ্যমে বিভিন্ন দেশ যেমন ট্যাক্স বাড়াতে চায়, তেমনি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো চায় তহবিলের বহর বাড়াতে। এসব বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অবশ্য আরও অনেকে কথা বলেছেন। তাদের যুক্তি হলো, জলবায়ুর প্রভাব অবাস্তব নয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি নতুন নয়। লাখ লাখ বছর ধরে পৃথিবীতেহচ্ছে।

ওয়ালস্ট্রিটের ওই নিবন্ধের টার্গেট ছিলো যদিও আমেরিকান অর্থনীতি। কিন্তু এর কারণে অন্যান্য দেশেও তোলপাড় হয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের৪০জন খ্যাতিমান জলবায়ু বিজ্ঞানী কড়া প্রতিবাদ পাঠান।

পদার্থ বিজ্ঞানী ফেড্রারিক সিটজ (Frederick Seity) ১৯৬০সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতি ছিলেন। ১৯৯৮সালে তিনি বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি সম্পর্কে '*ওরিগোন পিটিশন*' নামে প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধের মূল কথা হচ্ছে ১৯৯৭সালে ডিস্বেরে জাপানের কিয়োটোতে গৃহিত প্রস্তাবটির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। তার বক্তব্যে উল্লেখিত বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্যের সমর্থন মেলে। তার এই গবেষণাটি অবশ্য বিশ্বের বৃহত্তম কর্পোরেট GO&b- মোবিলের কাছ থেকে ৬লাখ ৩০হাজার পাউন্ড অনুদান নিয়ে পরিচালনা করা হয়। বিশ্বের বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এভাবে সমাজবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী গবেষকরা নিয়োজিত

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন, যারা গবেষণার মাধ্যমে কর্পোরেটতন্ত্রের ইচ্ছাপূরণ করে থাকেন। ২০০১সালের ২৯ জুলাই 'মেইল অন সানডে' (Mail On Sunday) শীর্ষক পত্রিকায় পিটার হিটেনস লেখেন 'Global Warming? Hot Air and Hypocrisy' । তার দাবি জর্জ বুশই ঠিক। কিয়োটো সমঝোতা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রিন হাউজ গ্যাসের সম্ভবত কোনও অস্তিত নাই। তিনি আরও বলেন, বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির সূর্য। তিনি এজন্য নাসার এক গবেষণাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। ২০০৬ সালের ১৩জানুয়ারি মেলাইন ফিলিস বলেন যে, আবহাওয়া অবশ্যই গরম হচ্ছে। তবে এরমানে এই নয় যে, এরজন্য গ্রিনহাউজ গ্যাস দায়ী। ২০০৩সালে ওকলাহোমা থেকে নির্বাচিত সিনেটর জেমস ইনহোকে (রিপাবলিকান) সিনেটে আবহাওয়া পরিবর্তনের ওপর এক বক্তৃতায় বলেন, মানবসৃষ্ট গ্যাসই যে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ, তা ঠিক নয়- এ দাবির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই।

জলবায়ু পরিবর্তন আর উষ্ণায়ন নিয়ে বিশেষ করে বাতাসে কার্বনের অস্তিত্ব এনিয়ে যখন এমনি নানা বির্তক চলছিলো, ঠিক তখন ২০১০সালের ১৭নভেম্বর কানকুন সম্মেলনের আগে এক তথ্য-বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় একদল হ্যাকার। তারা যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট অ্যাংলিয়ার জলবায়ু গবেষণা ইউনিটের (সিআরইউ) রাশিয়াভিত্তিক একটি ওয়েবমেইল সার্ভারে ঢুকেকয়েক ১০৭৩টি মেইল চুরি করে (ইন্টারনেট, ২০১২)। এরপর বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন আর উষ্ণায়নের তথ্য অনেকটা অতিরঞ্জিত। ওই সিআরইউ ছিলো আইপিসিসির চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্টেও তাপমাত্রা সংক্রান্ত অংশের তথ্যপ্রণয়নকারী। চুরি হওয়া ইমেইলগুলো সিআরইউ ও আইপিসিসির মধ্যে চালাচালি হয়েছিলো। ওইসব ইমেইলের মাধ্যমে ২০৩৫সালের মধ্যে হিমালয়ের হিমবাহ গলা এবং বাংলাদেশসহ এই অঞ্চল জলমগ্ন হওয়ার আশংকা ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। এটা এ জন্য যে, মানবসৃষ্ট কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে- এ বিষয়টি বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করানোর জন্যে জলবায়ু গবেষণা রিপোর্ট ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উপস্থাপনের নির্দেশ ছিলো বিজ্ঞানীদের প্রতি। এব্যাপারে আইপিসিসি বিজ্ঞানীদের 'সুচতুর' হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তাপমাত্রা 'কম হওয়ার' রেকর্ডগুলো বাদ দিঢেয় গ্রাফ তৈরি করতে বলা হয়েছিলো, যাতে বিশ্ব তাপমাত্রার রেখা কেবলই উর্ধ্বমুখি হয়। এ ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর কোপেনহেগেন সম্মেলনে শিল্প-কারখানার কার্বন দুষণ থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির গল্প ইচ্ছা করেই তৈরি বলে দাবি ওঠে।

সিআরইউর তখন পরিচালক ছিলেন ফিল জোসন (Phil Jones)। তিনি বিজ্ঞানীদের আরও নির্দেশ দেন, তাপমাত্রা কমে যাওয়ার তথ্যগুলো এমন সব সার্ভারে রাখতে যাতে ইন্টারনেট সার্চ করে সেগুলো না পাওয়া যায়।

এ ঘটনার পর অবশ্য ফিল জোনস পদত্যাগ করেন (হোসেন, আলতাব ২০১২)। এনিয়ে বর্তমানে বিচার কার্যক্রম চলছে। তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন। এমনকি কয়েকবার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালান। তিনি দাবি করেছেন, তথ্য ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উপস্থাপনের নির্দেশ দেন নি তিনি। ("I am 100 percent confident

Dhaka University Institutional Repository

that the climate has warmed," Jones says imploringly. "I did not manipulate or fabricate any data.)।

উপরোক্ত ঘটনা প্রকাশের পর জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিদ্রুপকারী ও অবহেলা-অবিশ্বাসীকারীরা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে অনৈতিক-নির্বিচার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত দেশ-জাতিগুলির অট্টহাসির সুযোগ তৈরি হয়। এরপ্রভাব তখন তাৎক্ষণিকভাবে কানকুন সম্মেলনে না পড়লেও ২০১১সালে ডারবান সম্মেলনে পড়ে। যে কারণে দূষণকারী অনেক দেশ নানা অজুহাতে কিয়োটো প্রটোকল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। ডারবানে কিয়োটো প্রটোকলের নবায়ন হয় নি।

তবে পরিবেশদূষণ, কার্বন নির্গমন আর উষ্ণায়ন বা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কর্পোরেট কূটচাল কিংবা বৈশ্বিক রাজনীতি আর যাই হোক, এটা একটা বাস্তবতা। এনিয়ে কোন সংশয় নাই। এরফলে মানবজীবনে সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী প্রভাব পড়েছে। বৈশ্বিক রাজনীতি আর মুনাফাখোর কর্পোরেটতন্ত্র এক্ষেত্রে বিশ্ব আধিপত্য বজায়, কারও অর্থনৈতিক উন্নতি ঠেকানো কিংবা মুনাফা রক্ষায় তথাকথিত বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে, যার উদ্দেশ্য শুভ ও নৈতিক নয়।

৪.৫ পরিবেশ : রাজনীতি, বাণিজ্য, তহবিল ও অন্যান্য

২০১১সালের ডিসেম্বরে ডারবানে (১৭তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন) বিশ্বকে কার্বনমুক্ত করতে কিয়োটো প্রটোকল নিয়ে আলোচনা এবং তার মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে ধনী দেশগুলোর আপত্তির পরের মাসেই প্রভাবশালী পত্রিকা ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের উল্লেখিত নিবন্ধ[৮] সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। কিয়োটো প্রটোকল নিয়ে পরিবেশবাদী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশ, জাতি, গবেষক, পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী সংশ্লিষ্ট সবাই বেশ খুশি হয়েছিলেন। কেননা, এতে ধরিত্রীর (সুরক্ষা বিধান করে) ভবিষ্যত মানবগোষ্ঠীর জন্যে কল্যাণকর সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ছিলো (খানম, রাশিদা আখতার ২০০৯ : ১০৮)। কিন্তু ডারবান সম্মেলনে কানাডা, জাপান, রাশিয়ার চুক্তি থেকে বেরিয়া যাওয়ার হুমকিসহ ধনী দেশগুলোর এই চুক্তি নবায়নে গড়িমসি প্রমাণ করেছে, এটা এখন লাইফ সাপোর্টে বেঁচে আছে (আলতাব হোসেন, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৩)। একইসঙ্গে কার্বন ও উষ্ণায়নের প্রকৃত হিসাব ও বাস্তবতা নিয়ে উত্থাপিত সংশয়-সন্দেহ আরও তীব্র করেছে। কিন্তু এনিয়ে অসংখ্য চুক্তি, ঘোষণা, সংগঠন, পদক্ষেপ, আইন, দিবস পালন ইত্যাদি যখন বিবেচনা করা হয়, তখন আর সন্দিগ্ধ অবস্থা থাকতে চায় না। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে বাস্তবতা থাকা সত্ত্বেও এনিয়ে এত টানাপোড়েন, দণ্ড কষাকষি, টানাহেঁচড়া কেন। জবাবে অনেকেই বলেছেন, প্রথমত রাজনীতি। অর্থনৈতিক আর দুনিয়া নিয়ন্ত্রণের রাজনীতিকে ও ইচ্ছাকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ভারত, ব্রাজিল, ইউরোপীয় দেশগুলো নীতি নিজের মতো করে চায়। এখানে মানব স্বার্থ আর ধরিত্রীর নিরাপত্তা তুচ্ছ হয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক যে,

---

[৮] 'বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে আতঙ্কের কিছু নাই'

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থা থেকে এগিয়ে আসলে হয়তো ফলাফল মিলবে। দুষণকারী প্রত্যেক দেশের আলাদা পারফর্মেন্সে অন্তত তাই মনে হয়েছে।

১৯৯৭সালে স্বাক্ষরিত ও ২০০৫সালে কার্যকর এই কিয়োটো প্রটোকল ১৯৯২সালের ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো সম্মেলনে গৃহিত জলবায়ু কনভেনশন স্বাক্ষরের ফলশ্রুতি। এই চুক্তির আগে-পরে আরও বেশকিছু চুক্তি ও রাজনৈতিক ঘোষণা এসেছে যার সবগুলির লক্ষ্য ছিলো পরিবেশ সুরক্ষা। ওইসব পদক্ষেপের মধ্যে নর্থসাউথ ডায়ালগ, বার্লিন দলিল, মরক্কো ঘোষণা, কোর কার্বন গভর্ণেন্স মডেল, ক্রস কাটিং ফরমেশন, গ্লোবাল কার্বন রিজাইম সিস্টেম, বালি অ্যাকশন, আরইডিডি (রিডাকশন এমিশন ফ্রম ডিকরেস্টেশন অ্যান্ড ডেস্ট্রাক্টিভ ফরেস্ট প্রাকটিস), কার্বন স্টক ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, কার্বন নির্গমন কর্মসূচি, কার্বন মার্কেট, কার্বন ফান্ড, কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং নেগোসিয়েশন ব্লকস এইড প্রজেক্টসহ দেশ, অঞ্চল বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবেশ নিয়ে বিভিন্ন চুক্তি ঘোষণা, কর্মকৌশল, বাণিজ্য কৌশল, সমঝোতা ইত্যাদি গৃহিত হয়েছে। এরবাইরে বিভিন্ন সমন্বয়ে বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি হয়েছে এই পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে। এরমধ্যে ইউরোপের ২৭ দেশের সমন্বয়ে একটি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সময়ে আমেরিকার কয়েকটি দেশ নিয়ে আরেকটিসহ আমব্রেলা গ্রুপ,বেসিক গ্রুপ, এলডিসি, অ্যাওসিস (দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির সংগঠন), জি-৭৭, সিভিএফ, কোচাবামবা সম্মেলন, ১৯৯৬সালের মন্ট্রিল প্রটোকল, সাংসদদের নিয়ে আলাদা সংগঠন, এসব কিছুরই লক্ষ্য পরিবেশ সুরক্ষা। কিন্তু এসব আইনী আর রাজনৈতিক ঘোষণার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তিতে দুষণকারী দেশগুলোর প্রচেষ্টা আর কৌশলের শেষ নেই। বরং ফাঁকে পরিবেশ পরিবর্তন ও দুষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে ওইসব ধনী দেশগুলোর প্রেতাত্মা বহুজাতিক কোম্পানী ও বিশ্ব আর্থিক সংস্থাগুলো ঋণ ব্যবসা নিয়ে সক্রিয় হয়েছে। কৃষি অভিযোজনের নামে সহনশীল বীজ সরবরাহের আড়ালে বীজ ব্যবসা শুরু করতে চায় সক্রিয়। ১৬৫টি বহুজাতিক কোম্পানীর যৌথ ফোরাম আন্তর্জাতিক নির্গমন বাণিজ্য সংস্থা (আইইটিএ) গড়ে উঠেছে। এরবাইরে কোম্পানীগুলো নিজ নিজ দেশের পক্ষে কার্বন ট্রেডিংয়ের নানা ছলাকলা নিয়ে কাজ করছে। এরমাধ্যমে প্রকারান্তরে তারা আরও কার্বন পোড়ানোর অধিকার চায় এখনও।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, যদিও কিয়োটো প্রটোকল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ধরণী গড়ার পথ সুগম করেছে, কিন্তু এটা মুনাফা ও বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে। এরফলে বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানী ও বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইএমএফের মতো ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্ত হয়েছে ও সুযোগ নিচ্ছে। এক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশগুলো বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে ইন্দন যোগাচ্ছে। এমনকি জাতিসংঘের অধীনে কার্বন বাণিজ্য, বন বিষয়ক বিনিয়োগ, কৃষি বনায়ন, রেড প্লাস, কৃষি বনায়ন, আরইডিডি ও পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির নামে ঋন দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অথচ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো এসব খাতেই অর্থ চাচ্ছে, তবে তা ঋণ নয় জাতিসংঘের অধীনে অনুদান হিসাবে।

প্রসঙ্গত, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সাহায্যের জন্য জাতিসংঘের অধীন স্বল্পোন্নত দেশ, তহবিল, অভিযোজন তহবিল, গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড, লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল, অসলো তহবিল নামে কয়েকটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এসব তহবিলে ৪১টি দেশের অর্থায়নের বিধান থাকলেও প্রতিশ্রুতি নিয়েছে মাত্র ২৩টি। আবার

Dhaka University Institutional Repository

আরেকটি দিক লক্ষ্যণীয়, উন্নত দেশগুলো ওইসব ফান্ডের মাধ্যমে অর্থ না দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দিতে বেশি আগ্রহী। এর পেছনের রাজনীতি হলো, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো যাতে বিশ্ব আসরে চক্ষুলজ্জার কারণে হলেও অবস্থান নিতে পারে তাদের বিরুদ্ধে। আবার কেউ কেউ বাংলাদেশকে জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন সময়ে দেয়া দান, অনুদান ও ঋণের অর্থের সঙ্গে জলবায়ু তহবিলের অর্থ গুলিয়ে ফেলতে চায়। ওই অর্থ তারা জলবায়ু সহায়তা হিসাবে আন্তর্জাতিক হলে উপস্থাপন করছে। এরবাইরে উন্নয়ন সহায়তা আর জলবায়ু তহবিলকেও মেলানো হচ্ছে। জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর যুক্তরাষ্ট্র এ কাণ্ড ইতিমধ্যে ঘটিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন মঞ্চে উন্নয়ন সহযোগীদের এসব অপ্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছেন। সর্বশেষ ২০১২সালের জুনে অনুষ্ঠিত 'রিয়ো প্লাস টুয়েন্টি'র সম্মেলনকে সামনে রেখে একইবছর ১৪মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের সংসদ সদস্যদের সম্মেলনে বক্তব্য প্রদানকালেও একই কথার পুনরুক্তি করেন। বলেন, 'উন্নয়ন সহযোগীরা এখন পর্যন্ত তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন নি।বিগত দু'দশক ধরে বৈদেশিক সহায়তা কমছে। এখন দেখছি, জলবায়ু অর্থায়নের সাথে উন্নয়ন অর্থায়নকে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে। জলবায়ু অর্থায়ন কোন দয়া-দাক্ষিণ্য নয়। এটা হচ্ছে, শিল্পোন্নত দেশগুলো যুগ যুগ ধরে যে বায়ু দুষণ করেছে তার ক্ষতিপূরণ। এটি নতুন, অতিরিক্ত এবং অনুদান হিসাবে দিতে হবে।'

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্ব বাস্তবতায় বাংলাদেশের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপন্থা রয়েছে। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকারে রয়েছে অভিযোজন। আর দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে অ্যানেক্স-১ এবং উন্নত দেশগুলির কার্বন নিঃসরন বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন (BCCSAP-2009)। আর এজন্য সরকার ইতিমধ্যে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান ২০০৯' নামে একটি কর্মকৌশলের দলিল প্রণয়ন করেছে। এর অধীনে বিভিন্ন কর্মসুচি বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় গৃহীত ছয়টি উন্নয়ন কর্মসুচি (Six thematic development areas) নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, মোকাবেলা ও স্বল্প-কার্বন উন্নয়ন এবং সক্ষমতা তৈরি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। এগুলোর অধীনে মোট ৪৪টি বিষয়বস্তুও ১৩৩টি প্রধান কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৭৭সালে সরকারের পরিবেশ অধিদফতর প্রতিষ্ঠা পায়। এরআগে ব্রিটিশ আমল থেকেই এদেশে বন বিভাগ ছিলো। ১৯৮৯সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৫সালে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্লান যা পরে ২০০৯সালে BCCSAP হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এধরণের দলিল বিশ্বে এই প্রথম হলো। এছাড়া ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন ২০০৯ (NAPA) সংশোধন করেছে। জলবায়ু ট্রাস্ট বিল (বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট অ্যাক্ট) ২০১০ সংসদে পাশ করেছে। এর অধীনে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) ২০০৯ গঠন করা হয়েছে। এতে নিজস্ব উৎস থেকে ৩০০মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৩শ' কোটি টাকা (২০০৯-২০১১ অর্থবছরে) বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ফান্ডের অর্থের ৬৬% বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন আর ৩৪% ফিক্সড ডিপোজিট হিসাবে থাকছে। এরবাইরে উন্নয়ন সহযোগী ও বৈদেকি

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড' (BCCRF) শীর্ষক ১২৫.৫ মিলিয়ন ডলারের মাল্টি-ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়। বাস্তবভিত্তিক এসব পদক্ষেপের বাইরে পানি, বায়ু, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নীতিমালা ও আইন হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ১৯৯২সালে পরিবেশ নীতি, ১৯৯৫সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০০০সালে পরিবেশ আদালত আইন বলবৎ করা হয়েছে। ১৯৯৫সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন সংশোধন করা হয়েছে ২০১০সালে। একইসাথে ২০০০সালের পরিবেশ আদালত আইন আরও গণতান্ত্রিক করে ২০১০সালে সংশোধন পূর্বক জারি করা হয়েছে।

৪.৬ তিনটি পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ ও ফলাফল মূল্যায়ন

আধেয় বিশ্লেষণে শিরোনামের ৯টি ধরণ বেছে নেয়া হয়েছে। ধরণগুলো হচ্ছে, মোট দিন, রিপোর্ট সংখ্যা, রিপোর্টের বিষয় জাতীয় না আন্তর্জাতিক, সম্পাদকীয়/উপ-সম্পাদকীয়, দৈনন্দিন (daily news item), বিশেষ রিপোর্ট (special news item), কোন পৃষ্ঠাগুলোতে এসব রিপোর্ট ছেপেছে এবং কোনও বিশেষ সংখ্যা আছে কিনা। এখানে ২০০৮ ও ২০০৯সালের একই মাস ডিসেম্বরের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ২০০৯সালে পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত সংবাদ ও সম্পাদকীয়-উপ-সম্পাদকীয় ছাপার হার ২০০৮সালের তুলনায় বেশি। এটা এ জন্য ২০০৯সালে কোপেনহেগেনে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনকে সামনে রেখে 'আলোচ্য সূচি' (Agenda Setting)[9] নির্ধারণ করেছিলো আমাদের গণমাধ্যম। অথচ তার আগের ২০০৮সালের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন নিয়ে মিডিয়াকে তা করতে দেয়া যায়নি। এরকারণে সেই সম্মেলনটি নিয়ে ততটা তোরজোড় ছিলো না। এ কারণে বিষয়টি গণমাধ্যমও সেভাবে টার্গেট করে নামে নি। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, ২০০৮সালে প্রধান তিনটি জাতীয় দৈনিক যুগান্তর, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার যথাক্রমে ১০, ৬ ও ৭দিন পরিবেশের নিউজ কাভার করেছে, সেখানে ২০০৯সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় যুগান্তরে ২৯দিন, প্রথম আলো ২৫ এবং ডেইলি স্টারে ২৮দিন। ২০০৯সালের বিশেষ লক্ষ্যণীয় হলো, এই বছর কোপেনহেগেন সম্মেলনকে সামনে রেখে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার যথাক্রমে ৩ ও ৬.৫পৃষ্ঠা বিশেষ সংখ্যা বের করেছে। এরমধ্যে যুগান্তর ও প্রথম আলো ১দিন এবং ডেইলি স্টার ২দিন বিশেষ সংখ্যা (Supplementary) বের করেছে। মোট নিউজ কাভারেও স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। ২০০৯সালে যুগান্তর ১০২টি, প্রথম আলো ৭১এবং ডেইলি স্টার ১২৯টি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। বিপরীত দিকে ২০০৮সালে যথাক্রমে ১৩টি, ৭টি ও ১২টি প্রকাশ করতে দেখা গেছে। এই তিন পত্রিকাকে পৃষ্ঠা বরাদ্দেও দু'বছরে অগ্রগতি ও তারতম্য দেখা গেছে। ২০০৮সালে যেখানে যুগান্তর ৮, প্রথম আলো ৪ ডেইলি স্টার ৬টি পাতায় নিউজ ছেপেছে, সেখানে ২০০৯সালে যুগান্তর ১৫টি, প্রথ আলো ১১টি এবং ডেইলি স্টার ৯টি পৃষ্ঠায় পরিবেশ সংক্রান্ত খবরাখবর ছাপে। এই তিন পত্রিকার মধ্যে সংবাদপ্রকাশে মৌলিক একটি পার্থক্য

[9] গণমাধ্যমের এজেন্ডা সেটিং নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হলো, যুগান্তর ঢাকার বাইরের পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ যেন, পরিবেশের ওপর (গাছ কাটা,নদীদখল), পরিবেশদুষণ (ইট ভাটা), স্বাস্থ্যসমস্যা (ইটিপি নেইঃ ঝুঁকিতে জনস্বাস্থ্য), আমিষের অভাব (সাগর-নদীতে মাছ নেই), অপরাধ (বরেন্দ্র অঞ্চলে ভেজাল সার), যোগাযোগ সংকট (মাওয়ায় নাব্যতা সংকট), দৈনন্দিন কর্মসূচি (বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক বাস্তু সংস্থানের ওপর ৮ দেশের কর্মশালা), রাজনীতি (টিপাইমুখের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ), কৃষি সমস্যা (সেচের পানির সংকট) ইত্যাদি বেশি ছেপেছে। আর প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ করে ডেইলি স্টার আন্তর্জাতিক খবর বেশি ছেপেছে। সম্পাদকীয় প্রকাশেও ডেইলি স্টার এগিয়ে।

ডিসেম্বর, ২০০৯

শিরোনামের ধরণ	যুগান্তর	প্রথম আলো	ডেইলি স্টার
মোট দিন	২৯	২৫	২৮
রিপোর্ট সংখ্যা	১০২	৭১	১২৯
জাতীয়	৬৫	৩২	৪৩
আন্তর্জাতিক	৩৭	৩৯	৮৬
সম্পাদকীয়/ উপ-সম্পাদকীয়	৮	১৫	২৬
দৈনন্দিন	৫১	৪৩	৫৫
বিশেষ	৪৩	১৩	৪৮
পৃষ্ঠা	১৫	১১টি	৯
বিশেষ সংখ্যা	১দিন/২পৃষ্ঠা	১দিন/৩পৃষ্ঠা	২দিন/৬.৫পৃষ্ঠা

ডিসেম্বর, ২০০৮

শিরোনাম	যুগান্তর	প্রথম আলো	ডেইলি স্টার
মোট দিন	১০	৬	৭
রিপোর্ট সংখ্যা	১৩	৭	১২
জাতীয়	৯	৬	৬
আন্তর্জাতিক	৪	১	৬
সম্পাদকীয়/ উপ-সম্পাদকীয়	২	৩	২
দৈনন্দিন	৬	১	৮
বিশেষ	৫	৩	২
পৃষ্ঠা	৮	৪টি	৬
বিশেষ সংখ্যা	-	-	-

গণমাধ্যম পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র, বৈশ্বিক উষ্ণতা ইত্যাদি ব্যাপারে তথ্য জানিয়ে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি সরকার ও বিশ্ববিবেক বিশেষ করে দুষণকারীদের ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশকে সুরক্ষা করতে পারে। ২০০৯সালের আগে পর্যন্ত এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের ভূমিকায় শিথীলতা দেখা যায়। ২০০৯সালে এসে দেখা গেলো গণমাধ্যম আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করে পরিকল্পিতভাবে কাজ করেছে। এরমাধ্যমে একদিকে গণমাধ্যম একটি সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, অন্যদিকে জনগণকে শিক্ষা দেয়া,

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ের ব্যাখ্যা, আশু বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা, সর্বশেষ তথ্য জনগণকে অবহিত করার মতো কাজ পালন করেছে। তবে এসবই কাজ :ধরণই ছিলো এক ঘেঁয়ে, বিষয়বৈচিত্র্যহীন। প্রধানমন্ত্রী বা সরকার ও ও রাষ্ট্রপ্রধান আর পরিবেশমন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের খবর একদিকে আরেকদিকে গতানুগতিক বিষয়ের বাইরে যেতে দেখা যায় না। গণমাধ্যম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামত দিতেও দেখা যায়। সর্বোপরি, বাংলাদেশের গণাধ্যমের বিশেষ করে পত্রিকার সংবাদ পরিবেশনে সভা-সমাবেশ-সম্মেলন, পরিবেশের বৈরিতা, পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাব, ক্ষতিপূরণ ও আন্ত র্জাতিক তহবিল, জাতীয় তহবিল ও প্রকল্প ইত্যাদি সংবাদ কাভার করে। আর সবচেয়ে বড় দিক হলো ইস্যু এবং দিবসভিত্তিক হয়ে পড়েছে আমাদের গণাধ্যমের কাভারেজ। দিন আর বিশেষ মুহূর্ত আসলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। কিছুদিন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঘটনা আর দিন শেষ হয়ে গেলে আবার ঝিমিয়ে পড়তে দেখা যায়। অর্থ্যাৎ বাংলাদেশের গণমাধ্যমের রীতি হলো ঘটনা দেখলে সে বিষয়ের কাভারেজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

৫.১ বিশেষজ্ঞ সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

১. বাংলাদেশে পরিবেশদুষণসহ জলবায়ু পরিবর্তনের সংবাদ কাভারেজে গণমাধ্যম ভেদে ভিন্নতা রয়েছে। অন্যান্য রিপোর্টের মতো প্রথম ও শেষপাতায় পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদ ঢালাওভাবে কাভারেজ পায় না। এর কারণ হিসাবে পাঠক আগ্রহ এবং বার্তা সম্পাদকের দৃষ্টিতে পত্রিকার সার্কুলেশনের (প্রচার সংখ্যা) গুরুত্বের মানদণ্ড অর্জনের অভাব রয়েছে এধরণের সংবাদের। এক্ষেত্রে অবশ্য বড় ইভেন্ট ও ইস্যু প্রথম বা শেষপৃষ্ঠায় কাভারেজ পাওয়ার গুরুত্ব অর্জন করে। যেমন : কোপেনহেগেনের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন। হাইতিতে ভয়াবহ ভূমিকম্প, সুনামীতে জাপানের পরমাণু কেন্দ্র বিপর্যস্থ ইত্যাদি।

২. পরিবেশ সংক্রান্ত নিউজ কাভারেজ বর্তমানে ঘটনা ও ইস্যুভিত্তিক হয়ে পড়েছে। দুর্ঘটনা, পরিবেশ দিবসপালন, নানা সভা-সমাবেশ-সম্মেলন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের বানী প্রচারসহ নানা কর্মসূচিকেন্দ্রিক এটা। এ অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে তুলনামূলক কাভারেজ আরও বাড়তে পারে।

৩. বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশদুষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সম্ভাব্য মহাদুর্যোগ। এই মুহূর্তে সমাজের একমাত্র সমস্যা নয় এটা। কিন্তু এরপরও এ বিষয়ের চেয়ে এখানে অসুস্থ রাজনৈতিক খবর বেশি প্রাধান্য পায়।

৪. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা সমস্যাটি একটি তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক ও জটিল বিষয়। আমাদের দেশের অনেক মানুষ শিক্ষাবঞ্চিত। তাই বিষয়টি বেশি বেশি সহজ ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন জরুরি। তবেই মানুষের সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি তারা পরিবেশ সুরক্ষা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবে। যেমন অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি কেন হয়, তাপমাত্রা কেন বাড়লো, ঘূর্ণিঝড় কেন হয় ইত্যাদি জানাতে হবে। এতে মানুষ সতর্ক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. গণমাধ্যমে বর্তমানে পরিবেশের সংবাদ যা প্রকাশ-প্রচার পাচ্ছে, তা বেশির ভাগই প্রাথমিক পর্যায়ের। সাংবাদিকরা এব্যাপারে খোঁজ-খবর কম রাখেন। অনেক সময়ে মনগড়া তথ্য উপস্থাপন করছেন। কোনও কোনও পত্রিকা অবশ্য ভালো করছে। তবে যারা আরও ভালো করতে চান, তাদের লেখাপড়া করা উচিত। তাত্ত্বিক কাভারেজ যথেষ্ট হয়েছে। এবার সরেজমিন ও বাস্তবউপাদান যুক্ত সংবাদ জনগণের জন্য হাজির করা প্রয়োজন।

৬. পরিবেশের বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে দেখা উচিত। প্রধান বড় দু'দলের এব্যাপারে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছাড়া পরিবেশ সমস্যার সমাধান হবে না।

৭. বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার কেবল তাই সম্প্রচার কও যা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারি লোকজন বলেন। এরবাইরে আর কিছু বলে না। এমনকি সেমিনারও কাভার করে না। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বেশি, যেহেতু তাদের জনগণের কাছে পৌছার সুযোগ ও সক্ষমতা বোশি। তাই দায়িত্বও বেশি। উদাহরণ স্বরূপ : বিন লাদেন যে দিন মারা যান, সারাবিশ্বের মিডিয়া ও পত্রিকায় তা লীড খবর। অথচ বিটিভিতে তা ছিলো চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ খবর। অথচ সেদিন সরকারি কম গুরুত্বপূর্ণ নিউজ প্রথম তিনটিতে স্থান করে নেয়।

৮. টেলিভিশন ও বেতার মাধ্যমে সবাই খবরের সবটুকু দেখে না। তাই পরিবেশের বিষয়গুলি খবরের শিরোনামে আসা উচিত। স্যাটেলাইট টেলিভিশন ও এফএম রেডিওতেও পরিবেশের সংবাদ কাভারেজ সভা-সমাবেশ এবং সেমিনারভিত্তিক হয়ে পড়েছে। সরেজমিন প্রতিবেদন জরুরি। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে পানির উচ্চতার বিপদের তথ্যের চেয়ে এই মুহূর্তে লবনাক্ততা কি সমস্যা করছে, উপকূল বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় চিংড়ি চাষের কারণে লবনাক্ততা ও জীববৈচিত্র্য, ফসলহানি, চাষাবাদ বন্ধ থাকা, আইলার পর ৪বছর কেটে গেলেও পুনর্বাসনের কি অবস্থা, সুপেয় পানির হাহাকার, লবন সহিষ্ণু ধানের জাতের আবিষ্কার, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তা ইত্যাদি প্রাধান্য পেতে পারে।

৯. পরিবেশ সমস্যাকে সাংবাদিকরা দু'ভাবে দেখতে পারেন- ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী (individualistic) ও সামগ্রিক (holistic)। সাংবাদিক বামপন্থীসহ বিভিন্ন মতাদর্শী হতে পারেন। নাও পারেন। পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। আবার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী হলেও তিনি সমাজের বাইরে নন। তাকে একা নিজের দিক দেখলে চলবে না।

১০. কর্মপন্থা নির্ধারণে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকরা স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী- এই দু'টি ভাগে বিভক্ত করে নিতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

১১. পরিবেশ সমস্যার সংবাদ লিখনে কারণ উদঘাটন করতে হবে। এটা বাহ্যিক (external) ও অভ্যন্তরীণ (internal) যে কোন একটি বা উভয়টি হতে পারে। আর সমাজের ভালো করতে হবে নিজের ক্ষতি না করে। ভূমিকা এমন হবে যেন একটির সমাধান করতে গিয়ে আরেকটি সংকট তৈরি না হয়। কেননা, ভালো কাজ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ডারউইন জীবের বংশগতি বা আইনস্টাইন মধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব দিয়ে অন্যায় করেন নি। কিন্তু তাদের ব্যঙ্গ কার্টুন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে (খান, গালিব আহসান ২০০২ : ৫২)। তাই সাংবাদিক এক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিতবাদকে (contexualism) সামনে রেখে কাজ করতে পারেন। উদ্দেশ্যই মূলকথা।

১২. তথ্য গোপন বা অতিরঞ্জিত করা যাবে না। আবার তথ্যপ্রকাশ যদি অনিষ্টের কারণ হয়, সে ক্ষেত্রে সংযম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। পন্থাটি চরম (extreme) হবে না। আবার চুপও থাকা যাবে না। হবে দু'য়ের মাঝামাঝি। এরিস্টটল যাকে বলেছেন 'Golden mean'। ইসলাম ধর্ম একে সমর্থন করেছে। সমস্যা তুলে ধরার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধান। দৃষ্টান্তস্বরূপ অফিসে যাওয়ার পথে পুকুরে একটি বাচ্চা পড়ে ডুবে যেতে দেখেও কাপড় ভেজা কিংবা অফিসে বিলম্বে পৌঁছার আশংকা বাচ্চাটিকে উদ্ধার না করা যেমন ঠিক নয়, আবার নিজে সাঁতার না জানা সত্ত্বেও ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের জীবন বিপন্ন করাও ঠিক নয়। দু'টিই চরম অবস্থা। পদক্ষেপ হবে বাস্তবতা অনুযায়ী।

১৩. গণমাধ্যম বা এর কর্মীদের পাথেয় হলো বস্তুনিষ্ঠতা (objectivity) ও সত্য (truth)। এই দু'টোর সামনে দেশপ্রেম 'ভুয়া'। সাংবাদিকের কাজ দেশপ্রেমিক হওয়া নয়, দেশবিরোধী হওয়াও নয়। বস্তুনিষ্ঠতা আর সত্যের সঙ্গে দেশপ্রেমের বিরোধ নাই। এই দু'টো নিয়ে কাজ করলে সাংবাদিকের দেশ উপকৃত হবে।

১৪. গণমাধ্যমের অনেকে দেশের পরিবর্তে দেশের বাইরের শক্তির প্রতি আনুগত্য দেখায়। সার্বিকভাবে এক্ষেত্রে দেশবিরোধী অবস্থান প্রদর্শিত হয় (নিছক রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে)। এ কারণে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি আছে। তবে এটাও সত্য জীবন বিপন্ন করে অনেকেই দেশের জন্য ও মানুষের জন্য ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন।

১৫. অনেক সময়ই গণমাধ্যমের রিপোর্ট অসত্য মনে হয়। এর কারণ হলো, বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা হয় না। তথ্য সত্যের কাছাকাছি থাকে না। 'ইন ডেপথ রিপোর্টিং' থাকে না। দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থকে সামনে রেখে কাজ করা হয়। গণমাধ্যমের মালিকানাও এক্ষেত্রে একটি সমস্যা। বাংলাদেশের অধিকাংশ গণমাধ্যমের

Dhaka University Institutional Repository

মালিক ব্যবসায়ী। ব্যবসার স্বার্থে অনেক নিউজ হয়। একারণে ইচ্ছা থাকলেও অবশ্য অনেক সাংবাদিক পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে পারেন না।

১৬. দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন নয়, সমস্যা দলপ্রেমে আর রাজনীতি। রাজনৈতিক কারণে মিডিয়া জগৎ দু'ভাগে বিভক্ত। যেহেতু সাংবাদিকদের সংগঠন দু'টি। তার কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদপ্রকাশে বাধা। পেশাদার সাংবাদিকদের কোনও দলমত থাকা উচিত নয়। এটা সত্য প্রকাশে অন্তরায়। এসবই গণমাধ্যমের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি করে।

৫.২ সারাংশ ও সুপারিশ

"বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা : একটি নৈতিক বিশ্লেষণ" বিষয়ক গবেষণা থেকে দেশের বিদ্যমান পরিবেশ পরিস্থিতি এবং তা সুরক্ষায় গণমাধ্যম বর্তমানে কি ভূমিকা পালন করছে তার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। সেই সাথে গণমাধ্যম বর্তমানে যে ভূমিকা পালন করছে তাতে দেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে কি না এবং জনগণ এব্যাপারে গণমাধ্যম থেকে আরও কি ভূমিকা বা দায়িত্ব-কর্তব্য প্রতিপালন প্রত্যাশা করে, তাও বের করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে কর্পোরেট দুনিয়ার গণমাধ্যম পরিবেশের মতো ইস্যুতে তারই জ্ঞাতি ভাই বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণসহ ক্ষমতাবানদের পরিবেশ দূষণের খবরাখবর স্বার্থের বাইরে গিয়ে আসলেই বস্তুনিষ্ঠভাবে সততার সাথে জনগণকে জানিয়ে পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারবে কি না, সে ধারণাও দেয়া হয়েছে গণমাধ্যমের 'সেল্ফ সেন্সরশীপ'র আড়ালে কি ঘটে সে কার্যক্রম নিরূপনের মধ্য দিয়ে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেশের মানুষের গণমাধ্যম নির্ভরতা এবং পরিবেশ সচেতনতার একটি চিত্রও ফুটে উঠেছে। এ গবেষণায় দেখা যায়, মানুষ সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রেডিও ছাড়াও অন্যান্য গণমাধ্যম যেমন ইন্টারনেট, সভা-সমাবেশ, ক্লাস লেকচার, গান ইত্যাদি মধ্য দিয়ে তথ্য জানে। এছাড়া লোকমুখে পরিবেশ পরিবর্তন আর দুর্যোগের তথ্য জেনে আসছে। সেই সাথে মানুষ সাধারণত পত্রিকার কোন পাতা পড়ে বা টিভি কখন দেখে থাকে তা বের করার পাশাপাশি অধিক পঠিত পাতা কোনগুলো, সেগুলোতে পরিবেশ সংক্রান্ত খবর কতটা ছাপা হয় বা টিভি-রেডিও নিয়ে মানুষ যখন বসে, সেইসময়ে পরিবেশ সংক্রান্ত খবরাখবর দেখতে পায় কি না বা কতটা পায় সেটাও বের করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বের পরিবেশ পরিবর্তন ও জলবায়ুর নানা রকম নেতিবাচক প্রভাব ও ভোগান্তি সম্পর্কে মানুষ জানে। জনগণকে এই অবগতিতে বেশি ভূমিকা রাখছে পত্রিকা। এরপরই পত্রিকা আর টিভির ভূমিকা যৌথভাবে রয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য এককভাবে টিভির ভূমিকা বেশী নেই যা পত্রিকার রয়েছে। আর এব্যাপারে রেডিওর ভূমিকা হতাশাজনক। মানুষের সবচেয়ে বেশি হতাশা রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন সম্পর্কে। টেরিস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট এই দুইভাবে ব্রডকাস্ট হয় বিটিভির কার্যক্রম। সে হিসেবে তাদের সারাদেশ ও বিশ্বে পৌছার সুযোগ রয়েছে। এ অবস্থায় বিটিভি পারে পরিবেশ বিষয়ে গঠনমূলক,

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্রসহ সরেজমিন প্রতিবেদন প্রচার করতে। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ দূষণকারীদের ওপর কার্যকর চাপ তৈরি হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা কেবল মন্ত্রী-এমপি ও সরকারের নীতি-নির্ধারকরা কি করলেন আর বললেন তা ব্রডকাস্ট করার মধ্য দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করছে। অন্যদিকে গণমাধ্যম বিশেষ করে দৈনিক পত্রিকায় পরিবেশ-ইস্যুর কাভারেজ দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু পরিবেশের মতো তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে সাংবাদিকদের যে পরিমাণ অধ্যয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ থাকা দরকার, তার যেমন অভাব আছে, তেমনি সব পত্রিকা ও টেলিভিশনে এই দিকটি বিট হিসাবে গড়ে উঠেনি। তাই সরকার ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্টরা সাংবাদিকদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। পাশাপাশি পরিবেশকে পূর্ণাঙ্গ বিট হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুপারিশ রইলো। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ গণমাধ্যম থেকেই তথ্য পেতে চায়। তাই বিষয়টি পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করা নীতি-নির্ধারক, আন্দোলনকারী, বিজ্ঞানী, গবেষক সবার জন্যই ইতিবাচক দিক এ জন্য যে, বর্তমান যুগ গণমাধ্যম অনুশাসিত। পরিবেশ দূষণ ও এর ফলে অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাবের খবর (যেমন জলবায়ু পরিবর্তন) গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জনগণকে নির্ভুল তথ্য দেয়ার সুযোগ অবশিষ্ট রয়েছে বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের আরও বেশী কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। এখন এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের নৈতিকবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালন জরুরি। কর্পোরেট দুনিয়ায় গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দ্বারা। বেশির ভাগ পত্রিকার মালিকানাও ব্যবসায়ীদের হাতে। বিজ্ঞাপন না হলে সাংবাদিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক দিকটি ন্যায্যতা পায় না। আবার বিজ্ঞাপনদাতারা নাখোশ হলে অর্থের প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। এই বাস্তবতায় বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে সেল্ফ সেন্সরশীপ দেখা যায়। একারণে নৈতিকতাসহ দায়িত্বপালনে ঝক্কি পোহাতে হয় সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকে। গবেষণায় সাংবাদিকদের দেশপ্রেমকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। আর সেটা হলো 'সততা ও বস্তুনিষ্ঠতার সাথে দায়িত্ব পালন'ই হচ্ছে দেশপ্রেম। সাংবাদিককে দেশপ্রেমিক হওয়ার যেমন প্রয়োজন নাই। সাংবাদিকরা যদি সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করেন তাহলেই তাদের দেশপ্রেম প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ সাংবাদিক বা গণমাধ্যমের ব্যবসাই হলো 'সত্যতা' ও 'বস্তুনিষ্ঠতা' (truth and objectivity) নিয়ে। এক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠভাবে সত্য প্রকাশিত হলেই বরং ভালো। সাংবাদিকদের দেশপ্রেম বরং তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই অর্থেই বলা হয়েছে যে সাংবাদিকদের তথাকথিত দেশপ্রেমিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই এই বাস্তবতায় 'পরিপ্রেক্ষিতবাদ'কে সামনে রেখে সাংবাদিকরা কাজ করতে পারেন। সর্বোপরি পরিবেশ ইস্যু যেহেতু বর্তমান সময়ের সবচেয়ে সুদুরপ্রসারী ইস্যু এবং মানবসভ্যতার সম্ভাব্য মহাবিপদ, বিপন্নতা ও অস্তিত্ব সঙ্কটের হুমকি নিয়ে আসছে, তাই এসব বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা দরকার। পাশাপাশি দূষণকারী ও নীতি-নির্ধারকসহ বিশ্ববিবেকের ওপর চাপ সৃষ্টি প্রয়োজন, এবং এক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই সীমিত পরিসরে হলেও আমার এ গবেষণা নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ ও গণমাধ্যম বিষয়ে আগ্রহী নীতি-নির্ধারক, গবেষক ও সাধারণ মানুষকে সামান্য হলেও সহায়তা দেবে বলে আশাবাদী।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

- Aquinas, T. *Summa Contra Gentiles*, (Bk-3, Pt-2, Ch-112) trans. V. J. Bourke, London: University of Notre Dame Press, 1975.
- Asia, Climate Change 2007 : Impact, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group 2 to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
- *Bangladesh Climate Change Strategic and Action Plan*, (2009), Ministry of Environment and Forest, GoB, Dhaka-2009.
- Brennan, Andrew and Lo, Yeuk-Sze, "Environmental Ethics", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition)*, Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/ethics-environmental/.
- Carvalho, A. & Burgess, J. (2006) Cultural Circuits of Climate Change : An Analysis of Representations of `Dangerous' Climate Change in the UK, Broadsheet Pres 1985-03, *Risk Analysis,* 25, 1457-69.
- Dominick, Joseph R., *The Dynamics of Mass Communication*, Third ed., McGraw Hill Publishing Company, 1990.
- Hargrove, Eugene C. *Foundations of environmental Ethics,* Prentice Hall, New Jersey, 1998.
- IPCC, *Special Report on Emissions Scenarios*, Cambridge University Press, New York, 2007.
- Islam, Monowar, Responses of Bangladesh Government to the challenges of climate change, a paper presented in International Meeting of Parliamentarians on Climate Change : Beyond 17, March-14, 2012.
- Jary, David & Jary Julia, *Collins Dictionary of Sociology*, Glasgow, Harper Collins Publishers, 1991.

Dhaka University Institutional Repository

- Mitra, Madhabendra Nath, Ethics for the use of the Environment VS. Ethics of the Environment, *Philosophy And Progress*, V-XXII-XXIII, June-December 1997.
- Lillie, William, *An Introduction to Ethics*, Methuen, London, 1956.
- Mackenzie, John, S, *A Manual of Ethics*, Surject publishers, Delhi, 1997.
- McCombs, M, E, and D. L. Shaw (1993), The Evaluation of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in the Marketplace of Ideas, *Journal of Communication,* Vol. 43, No-2, P-58-67.
- O'Neill, John, `The Varieties of Intrinsic Value', *The Monist,* Vol. 75, No 2, April, 1992.
- Schramm, Wilber, *Mass Media and National Development*, Stanford University Press, California, 1964.
- Scherer, Donald and Attig, Thomas (edited), *Ethics and the Environment,* Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1983.
- Severin, Werner J. and Tankard Jr. James, W., *Communication Theories*: *Origin, Method, Uses,* 2nd edition, Longman, New York, 1988.
- Wimmer, R. D. ও Doinick, J. R., 2000 (*Mass Media Research : An Introduction*, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company.
- W. Wyatt, Woodrow, 1996, *Statistics for behavioral sciences*, D. C. Health and Company, Boston.
- www.epa.ie
- http://en.wikipedia.org/wiki/Environmentalism.
- ১http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204301404577171531838421366.html.
- http://www.spiegel.de/international/world/a-687259.html.
- http://www.spiegel.de/international/world/a-687259.html.

Dhaka University Institutional Repository

- আলম, খুরশীদ, *পরিবেশ সমাজ ও সামাজিক বিকাশ*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১।
- আসাদুজ্জামান, এএসএম ও মুহিউদ্দীন, খালেদ, *যোগাযোগের তত্ত্ব*, বিসিডিজেসি, ঢাকা, ২০০২।
- আহমেদ, আহসান উদ্দিন *জলবায়ু পরিবর্তন : গভীর সঙ্কটের আবর্তে বাংলাদেশ*, সিএসআরএল, ২০০৮।
- আলী, মোহাম্মদ, *মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও পরিবেশ নৈতিকতা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০১০।
- আহমেদ, মুসতাক ও অন্যান্য অনুবাদ সংকলন, *কর্পোরেট মিডিয়ার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন*, শ্রাবন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯।
- আহমদ, মুসতাক, পুনর্ভবা-আত্রাই পাড়ের মানুষের দুঃখগাঁথা, *দৈনিক যুগান্তর*, সংখ্যা, ডিসেম্বর ১-৪, ২০০৯।
- এনওএএ (২০১০), *Astronomical Theory of Climate Change*, জাতীয় পরিবেশ উপগ্রহ, উপাত্ত ও তথ্য পরিসেবা কেন্দ্র (NESDIS), নিউজার্সি, আগস্ট, ২০১০।
- এল ডেভিড রোপার, *Global Warming Prediction Due to Burning Fossil Fuels and Other Emissions*, ভার্জিনিয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ২০১০।
- উলসলে, রোল্যান্ড ই (সম্পাদক), অনুবাদ : আশফাক-উল-আলম, *আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।
- করিম, সরদার ফজলুল, *এরিস্টটলের পলিটিকস*, প্রথম পুস্তক-অষ্টম অধ্যায়, (অনূদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৬।
- খালেক, আবদুল এএসএম, *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৩।
- খানম, রাশিদা আখতার, *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯।
- খান, গালিব আহসান, *বিজ্ঞানের দর্শন*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২।
- গুপ্ত, সন্তোষ, *সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বনাম সংবাদপত্র*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০
- চন্দ্র, বিপান ও অন্যান্য, অনুবাদ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৫৭-১৯৪৭)*, কে পি বাগচী কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

- চমস্কি, নোয়াম, অনুবাদ : নেসা, মেহেরুন ও আবদুর রশীদ, মোহাম্মদ, *ফেইল্ড স্টেটস : ক্ষমতার অপব্যবহার ও গণতন্ত্রের অমর্যাদাকরণ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯।
- চৌধুরী, এ কে এম শামীম (প্রকাশক), *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ : সময়ের বিবর্তনে গুরুত্ব ও প্রবণতা*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৯।
- জসীমউদ্দিন ও কালিপ্রসন্ন দাস, পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও স্বতঃমূল্য : একটি বিভ্রান্তি নিরসন, *দর্শন ও প্রগতি*, ২৩শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যাঃ জুন-ডিসেম্বর ২০০৬।
- চৌধুরী, ফখরুজ্জামান, জলবায়ু, পরিবেশ এবং বৈপরীত্য, *দৈনিক যুগান্তর*, যুগপূর্তি বিশেষ সংখ্যা, ২৯মার্চ, ২০১২।
- *দৈনিক যুগান্তর*, ৩১ডিসেম্বর ২০০৮।
- *দৈনিক যুগান্তর*, ৫ডিসেম্বর ২০০৯।
- *দৈনিক যুগান্তর*, ১৫মার্চ, ২০১২।
- টম নুস্টন, *Tropical cyclones and climate change : an Atlantic and Australian Basin perspective*, জাতীয় সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডল বিষয়ক কর্তৃপক্ষ (এনওএএ), নিউজার্সি, ২০১১।
- টেলর, জেমস (অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান), *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, অবসর, ঢাকা, ২০০১।
- ফ্লার, মেলভিন এল ডি ও বল-রোকেশ, স্যান্ড্রা জে, অনুবাদ হোসেন, আফতাব, *গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
- ফুয়াদ, শেখ মজলিশ (মুখ্য গবেষক), *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার প্রকাশিত সংবাদ ঃ সময়ের বিবর্তনে গুরুত্ব ও প্রবণতা*, বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০৯।
- বিশ্বাস, দুলাল চন্দ্র, (সম্পাদক), *দুর্যোগ সাংবাদিকতা*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১২।
- মেহেদী, হাসান ও হক, সৈয়দ আমিনুল, *জলবায়ু পরিবর্তন : রাজনৈতিক অর্থনীতি*, হিউম্যানিটিওয়াচ ও অন্যান্য, ঢাকা, ২০১১।
- ফেরদৌস, রোবায়েত ও ইসলাম, রাইসুল, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও গণমাধ্যমের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি), খণ্ড ৪, সংখ্যা ৪, পৌষ ১৪১৬।
- মনিরুজ্জামান, এফএম, *বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

- রাসেল, বার্ট্রান্ড, অনুবাদ : কাজী মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সুখ*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮১।
- রায়, সুধাংশু শেখর, বাংলাদেশে মফস্বল (স্থানীয়) সংবাদপত্রের সমস্যা ও বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা, *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি, ডিসেম্বর ২০১১।
- রহমান, শামসুর, *পরিবেশবিজ্ঞান ও জীবভূগোল*, অবসর ২০০৫।
- শর্মা, দ্বিজেন, *বিজ্ঞান ও শিক্ষা : দায়বদ্ধতার নিরিখ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২।
- ইসলাম, সালমা, *নারীর ক্ষমতায়ন ও বিশ্ববাস্তবতা*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২।
- সিঙ্গার, পিটার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, (প্রদীপ কুমার রায় অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪।
- হোসেন, আলতাব, *জলবায়ু রাজনীতি*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা-১১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ক

গবেষণার প্রশ্নমালা

এমফিল থিসিস

গবেষণার বিষয় : বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা : একটি নৈতিক বিশেষণ

সুপারভাইজার : অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানম

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষকের নাম : মুসতাক আহমদ

শিক্ষাবর্ষ : ২০০৪-২০০৫

১. আাপনি দৈনিকই কি পত্রিকা পড়েন বা টিভির খবর দেখেন, কেন?

উত্তর : ....

....

২. কোনপাতার খবর বেশি পড়েন বা কোনধরণের খবর বেশি দেখে থাকেন?

উত্তর : ....

....

৩. সাধারণত কখন পত্রিকা পড়েন বা টেলিভিশন দেখে থাকেন?

উত্তর : ....

....

৪. পত্রিকা বা টিভির খবর কি আপনার কাছে কখনো অসত্য মনে হয়? কেন? অসত্য মনে হলে সে ক্ষেত্রে কোন একটি ঘটনার ব্যাপারে সঠিক/প্রকৃত তথ্যটা জানতে আপনি কি করেন? (সবার জন্য)

উত্তর : ....

....

Dhaka University Institutional Repository

৫. পাঠক পত্রিকার কোন পৃষ্ঠাগুলো বেশি পড়েন বলে আপনি মনে করেন? পরিবেশ/জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর খবর কিভাবে ও কোন পৃষ্ঠায় সাধারণত ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়? (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের জন্য)

উত্তর : ....

....

৬. দর্শকরা কোন কোন সময়ে টিভি দেখে থাকে বলে মনে করেন? পিকআওয়ারে (সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা) পর্যন্ত কোনধরণের নিউজকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়? পরিবেশ/জলবায়ু সংক্রান্ত সংবাদের ব্যাপারে পলিসি কি হয়ে থাকে? (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের জন্য)

উত্তর : ....

....

৭. পরিবেশ/জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর খবর পত্রিকা/গণমাধ্যমে যে পরিমাণ কাভারেজ পাচ্ছে, তা কি যথেষ্ট? এব্যাপারে গণমাধ্যম কি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে বলে মনে করেন কি? আপনার কোন সুপারিশ আছে বা সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এব্যাপারে কি করা উচিত বলে মনে করেন? (সবার জন্য)

উত্তর : ....

....

৮. বেতার কি শোনা হয়? না/হ্যাঁ হলে কেন? বাংলাদেশ বেতার না এফএম শুনে থাকেন? (সবার জন্য)

উত্তর : ....

....

৯. বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার পরিবেশ/জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর খবর কতটা কাভারেজ করে? এতে কি আপনি সন্তুষ্ট? (সবার জন্য)

উত্তর : ....

....

Dhaka University Institutional Repository

১০. অন্যান্য বিটের মতো জলবায়ু বা পরিবেশ পরিবর্তন নিয়ে আপনার প্রতিষ্ঠানে কি নির্দিষ্ট কেউ দায়িত্বপ্রাপ্ত রিপোর্টার আছেন? (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের জন্য)

উত্তর : ....

....

১১. জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার কারণে বাংলাদেশের ১৭ভাগ ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভে হারিয়ে যাবে কিংবা উষ্ণায়নের কারণে ফসল উৎপাদন হ্রাস, মৎসসম্পদের বিলুপ্তি বা লোকালয়ে সাগরের পানি প্রবেশ করছে - এসব খবর জানেন? কিভাবে জানলেন? (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব বাদে)

উত্তর : ....

....

১২. দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবনের সমস্যা, সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লবনাক্ততার কারণে মরে যাচ্ছে, উত্তরাঞ্চলে মরুকরণের ইত্যাদির তথ্য কি জানেন? কিভাবে? (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব বাদে)

উত্তর : ....

....

১৩. অ্যান্টার্কটিকায় ও হিমালয়ের বরফ গলছে এ তথ্য কি আপনি জানেন? কিভাবে? (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব বাদে)

উত্তর : ....

....

১৪. মালদ্বীপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দ্বীপরাষ্ট্র সমুদ্র বা মহাসাগরে ডুবে যাবে। একারণে আতঙ্কিত মালদ্বীপের সরকার সমুদ্রের নীচে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছেন প্রতিবাদস্বরূপ- এটা জানেন কী? কিভাবে? (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব বাদে)

উত্তর : ....

....

১৫. বিজ্ঞাপনের কারণে সংবাদ প্রকাশে কেমন সেল্ফ সেন্সরশীপ আরোপ করতে হয়? যদি হয় তাহলে এক্ষেত্রে পাঠক চাহিদাপূরণে কোনো বিকল্প কি অনুসরণ করা? না হলে যে সংখ্যক/পরিমাণ সংবাদ কাভারেজ হয় তা কি যথেষ্ট? (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের জন্য)

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর : ....

....

১৬. বিজ্ঞাপন দেয় এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের পরিবেশ দুষণের রিপোর্ট কাভারেজ ও প্রকাশে/ব্রডকাস্ট কোনও সেন্সর করতে হয় কি? (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের জন্য)

উত্তর : ....

....

১৭. সার্বিকভাবে আমাদের গণমাধ্যমের দেশপ্রেম নিয়ে কি আপনার কোন প্রশ্ন আছে? থাকলে কেন? (সবার জন্য)

উত্তর : ....

....

মতামত দাতার নাম :

পেশা : বয়স :

শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপের এলাকার নাম

তারিখ ও সময়

স্বাক্ষর

(মতামত প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : খ

তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরে তালিকা অনুযায়ী ২০১১সালের ২৯ডিসেম্বর তারিখে সর্বশেষ হালনাগাদকৃত দেশের মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান।

ক্রমিক নং	বিবরণী	ঢাকা	মফস্বল	সর্বমোট
০১	দৈনিক পত্রিকা	১১৫	১৯৮	৩১৩
০২	সাপ্তাহিক পত্রিকা	৬৪	৪৭	১১১
০৩	পাক্ষিক পত্রিকা	১৩	০৪	১৭
০৪	মাসিক পত্রিকা	২৬	০৪	৩০
০৫	ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা	০১	০০	০১
০৬	ষান্মাসিক	০০	০১	০১
	মোট =	২১৯	২৫৪	৪৭৩

ঢাকা মহানগরীর মিডিয়া তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম
১	প্রথম আলো
২	বাংলাদেশ প্রতিদিন
৩	কালের কণ্ঠ
৪	আমাদের সময়
৫	যুগান্তর
৬	সমকাল
৭	ইত্তেফাক
৮	জনকণ্ঠ
৯	ইনকিলাব
১০	নয়াদিগন্ত
১১	আমার দেশ মাহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে ১৯/০২/২০১২ তারিখ পর্যন্ত মিডিয়া তালিকাভুক্তি বহাল রয়েছে।
১২	ভোরের ডাক
১৩	ভোরের কাগজ
১৪	মানব জমিন
১৫	যায়যায়দিন
১৬	The Daily Star
১৭	ডেসটিনি
১৮	সংবাদ
১৯	সংগ্রাম
২০	গণকণ্ঠ
২১	আজকালের খবর
২২	খবর

Dhaka University Institutional Repository

২৩	The Financial Express
২৪	The Independent
২৫	daily sun
২৬	গণজাগরণ
২৭	বাংলাদেশ সময়
২৮	জনতা
২৯	দিনকাল
৩০	The New Age
৩১	আমাদের অর্থনীতি
৩২	The News Today
৩৩	বাংলাবাজার পত্রিকা
৩৪	খবরপত্র
৩৫	The New Nation
৩৬	The Bangladesh Today
৩৭	শেয়ার বিজ্ কড়চা
৩৮	সকালের খবর
৩৯	কক্তি
৪০	অপরাধ কণ্ঠ
৪১	নওরোজ
৪২	প্রথম সূর্যোদয়
৪৩	আজকের জীবন
৪৪	আল-ইহ্সান
৪৫	আজক্ষের প্রত্যাশা
৪৬	দিনের শেষে
৪৭	কালবেলা
৪৮	আলোর বার্তা
৪৯	রূপালী দেশ
৫০	সমাচার
৫১	দেশ জনতা
৫২	ঢাকা রিপোর্ট
৫৩	সবুজ দেশ
৫৪	সোনালী বার্তা
৫৫	মুক্ত খবর
৫৬	The Muslim Times
৫৭	The People
৫৮	ঢাকা ডায়লগ
৫৯	ভোরের আওয়াজ
৬০	The Banner
৬১	আল আমিন
৬২	ভোরের কণ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

৬৩	একুশে সংবাদ
৬৪	দিনের আলো
৬৫	পথযাত্রা
৬৬	স্বাধীন ভাষা
৬৭	The Good Morning
৬৮	গণমুক্তি
৬৯	বঙ্গজননী
৭০	দৈনিক ঢাকা
৭১	The Daily Earth
৭২	হাজারিকা প্রতিদিন
৭৩	সকাল বেলা
৭৪	প্রভাত
৭৫	নিরপেক্ষ
৭৬	মানবকণ্ঠ
৭৭	দৈনিক সংবাদপত্র
৭৮	দেশ পত্রিকা
৭৯	বর্তমান বাংলা
৮০	সোনার আলো
৮১	উন্নয়ন বার্তা
৮২	ভোরের চেতনা
৮৩	জাতীয় অর্থনীতি
৮৪	দেশবার্তা
৮৫	ঘোষণা
৮৬	আমার কাগজ
৮৭	খোলাকাগজ
৮৮	জনতার সংবাদ
৮৯	ঢাকার ডাক
৯০	এশিয়ান এক্সপ্রেস
৯১	আজকের প্রভাত
৯২	The Orientation
৯৩	সংবাদ মোহনা
৯৪	The Daily Economic Post
৯৫	মুক্তমত
৯৬	জনতার মঞ্চ
৯৭	মাতৃছায়া
৯৮	জয় বাংলা
৯৯	সবুজ সিলেট
১০০	আজকের সত্যের আলো
১০১	আজকের বসুন্ধরা
১০২	অর্থনীতির কাগজ

Dhaka University Institutional Repository

১০৩	অনুপমা
১০৪	রূপবাণী
১০৫	অন্য দিগন্ত
১০৬	দেশের পত্র
১০৭	উষার বাণী
১০৮	নবচেতনা
১০৯	মাতৃভাষা
১১০	আলোর দিগন্ত
১১১	The Daily Evning News
১১২	নববাণী
১১৩	The News Line
১১৪	বঙ্গবাণী
১১৫	প্রেস এক্সপ্রেস

মফস্বল থেকে প্রকাশিত মিডিয়া তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশের স্থান
১	দৈনিক দেশের আলো	নারায়নগঞ্জ
২	দৈনিক খবরের পাতা	”
৩	দৈনিক শীতলক্ষা	"
৪	দৈনিক সচেতন	”
৫	দৈনিক সোজাসাপ্টা	”
৬	দৈনিক ভাস্তি বার্তা	”
৭	দৈনিক যুগের চিন্তা	”
৮	দৈনিক গ্রামীণ দর্পণ	নরসিংদী
৯	দৈনিক নতুন ভোর	গাজীপুর
১০	দৈনিক গণমুখ	”
১১	দৈনিক আজকের জনতা	”
১২	দৈনিক মুক্ত সংবাদ	”
১৩	দৈনিক মুন্সিগঞ্জের কাগজ	মুন্সীগঞ্জ
১৪	দৈনিক জাহান	এয়মনসিংহ
১৫	দৈনিক স্বদেশ সংবাদ	”
১৬	দৈনিক আজকের খবর	”
১৭	দৈনিক সবুজ	”
১৮	দৈনিক আজকের ময়মনসিংহ	”
১৯	দৈনিক স্বজন	”
২০	দৈনিক দেশের খবর	”
২১	দৈনিক আজকের বাংলাদেশ	”
২২	দৈনিক বাংলার দর্পন	নেত্রকোনা
২৩	দৈনিক জননেত্র	”

Dhaka University Institutional Repository

২৪	দৈনিক আজকের দেশ	কিশোরগঞ্জ
২৫	দৈনিক শতাব্দীর কণ্ঠ	”
২৬	দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ	টাঙ্গাইল
২৭	দৈনিক প্রগতির আলো	”
২৮	দৈনিক লোক কাথা	”
২৯	দৈনিক কালের স্রোত	”
৩০	দৈনিক ভোরের রানার	উরিদপুর
৩১	দৈনিক ফরিদপুর	”
৩২	দৈনিক ঠিকানা	”
৩৩	দৈনিক যুগকথা	গোপালগঞ্জ
৩৪	দৈনিক যুগের সাথী	”
৩৫	দৈনিক ভোরের বাণী	”
৩৬	দৈনিক সুবর্ণ গ্রাম	মাদারীপুর
৩৭	দৈনিক হুংকার	শরীয়তপুর
৩৮	দৈনিক রুদ্র বার্তা	”
৩৯	দৈনিক আল-আযান	মানিকগঞ্জ
৪০	দৈনিক মানিকগঞ্জের কাগজ	”
৪১	দৈনিক আজকের জামালপুর	জামালপুর
৪২	দৈনিক মুক্ত আলো	”
৪৩	দৈনিক পল্লীর আলো	”
৪৪	দৈনিক তথ্যধারা	শেরপুর
৪৫	দৈনিক ফুলকী	গাভার (ঢাকা)
৪৬	দৈনিক মাতৃকণ্ঠ	রাজবাড়ী
৪৭	দৈনিক আজাদী	চট্টগ্রাম
৪৮	দৈনিক পূর্বকোণ	”
৪৯	দৈনিক কর্ণফুলী	”
৫০	দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ	"
৫১	দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ	”
৫২	দৈনিক People's View	”
৫৩	দৈনিক আজকের চট্টগ্রাম	”
৫৪	দৈনিক Com. Times	”
৫৫	The Daily Life	"
৫৬	দৈনিক সত্যবাণী	”
৫৭	দৈনিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা	”
৫৮	দৈনিক শাহ্ আমানত	”
৫৯	দৈনিক নয়াবাংলা	”
৬০	দৈনিক দেশের কথা	”
৬১	দৈনিক কক্সবাজার	কক্সবাজার
৬২	দৈনিক আজকের দেশ বিদেশ	”
৬৩	দৈনিক সৈকত	”

Dhaka University Institutional Repository

৬৪	দৈনিক আপন কণ্ঠ	"
৬৫	দৈনিক দৈনন্দিন	"
৬৬	দৈনিক সমুদ্র বার্তা	"
৬৭	দৈনিক হিমছড়ি	"
৬৮	দৈনিক গিরিদর্পন	রাঙামাটি
৬৯	দৈনিক পার্বত্য বার্তা	"
৭০	দৈনিক রাঙামাটি	"
৭১	দৈনিক নতুন বাংলাদেশ	বান্দরবান
৭২	দৈনিক সচিত্র মৈত্রী	"
৭৩	দৈনিক অরণ্য বার্তা	খাগড়াছড়ি
৭৪	দৈনিক প্রতিদিন খাগড়াছড়ি	"
৭৫	দৈনিক রূপসী বাংলা	কুমিল্লা
৭৬	দৈনিক আমাদের কুমিল্লা	"
৭৭	দৈনিক পূর্বাশা	"
৭৮	দৈনিক কুমিল্লা মুক্তকণ্ঠ	"
৭৯	দৈনিক শিরোনাম	"
৮০	দৈনিক কুমিলার কাগজ	"
৮১	দৈনিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮২	দৈনিক আজকের হালচাল	"
৮৩	দৈনিক প্রজাবন্ধু	"
৮৪	দৈনিক তিতাস কণ্ঠ	"
৮৫	দৈনিক সমতট বার্তা	"
৮৬	দৈনিক দিন দর্পন	"
৮৭	দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ	চাঁদপুর
৮৮	দৈনিক চাঁদপুর দর্পন	"
৮৯	দৈনিক চাঁদপুর জমিন	"
৯০	দৈনিক জাতীয় নিশান	নোয়াখালী
৯১	দৈনিক নোয়াখালীর খবর	"
৯২	দৈনিক আল-চিশ্‌ত	লক্ষীপুর
৯৩	দৈনিক সোনালী সংবাদ	রাজশাহী
৯৪	দৈনিক সানসাইন	"
৯৫	দৈনিক নতুন প্রভাত	"
৯৬	দৈনিক সোনার দেশ	"
৯৭	দৈনিক জনদেশ	নাটোর
৯৮	দৈনিক উত্তরবঙ্গ বার্তা	"
৯৯	দৈনিক যুগের আলো	রংপুর
১০০	দৈনিক পরিবেশ	"
১০১	দৈনিক দাবানল	"
১০২	দৈনিক আখিরা	"
১০৩	দৈনিক অর্জন	"

Dhaka University Institutional Repository

১০৪	দৈনিক ঘাঘট	গাইবান্ধা
১০৫	দৈনিক মাধুকর	"
১০৬	দৈনিক নীল কথা	নীলফামারী
১০৭	দৈনিক কুড়িগ্রাম খবর	কুড়িগ্রাম
১০৮	দৈনিক চাওয়া পাওয়া	"
১০৯	দৈনিক প্রতিদিন	দিনাজপুর
১১০	দৈনিক উত্তর বাংলা	"
১১১	দৈনিক আজকের প্রতিভা	"
১১২	দৈনিক তিস্তা	"
১১৩	দৈনিক জনমত	"
১১৪	দৈনিক পত্রালাপ	"
১১৫	দৈনিক মানব বার্তা	"
১১৬	দৈনিক অন্তরকণ্ঠ	"
১১৭	দৈনিক করতোয়া	বগুড়া
১১৮	দৈনিক আজ ও আগামীকাল	"
১১৯	দৈনিক বগুড়া	"
১২০	দৈনিক উত্তর কোণ	"
১২১	দৈনিক দুর্জয় বাংলা	"
১২২	দৈনিক চাঁদনী বাজার	"
১২৩	দৈনিক সাত মাথা	"
১২৪	দৈনিক মুক্ত বার্তা	"
১২৫	দৈনিক ইছামতি	পাবনা
১২৬	দৈনিক স্বতঃকণ্ঠ	"
১২৭	দৈনিক বিবৃতি	"
১২৮	দৈনিক নতুন বিশ্ববার্তা	"
১২৯	দৈনিক চাঁদতারা	সিরাজগঞ্জ
১৩০	দৈনিক যুগের কথা	"
১৩১	দৈনিক যমুনা প্রবাহ	"
১৩২	দৈনিক পূর্বাঞ্চল	খুলনা
১৩৩	দৈনিক জন্মভূমি	"
১৩৪	দৈনিক প্রবাহ	"
১৩৫	দৈনিক প্রবর্তন	"
১৩৬	দৈনিক অনির্বাণ	"
১৩৭	দৈনিক তথ্য	"
১৩৮	The Daily Tribune	"
১৩৯	দৈনিক রাজপথের দাবী	"
১৪০	দৈনিক সুন্দরবন	বাগেরহাট
১৪১	দৈনিক দৃষ্টিপাত	সাতক্ষীরা
১৪২	দৈনিক কাফেলা	সাতক্ষিরা
১৪৩	দৈনিক পত্রদূত	"

Dhaka University Institutional Repository

১৪৪	দৈনিক যুগের বার্তা	"
১৪৫	দৈনিক লোক সমাজ	যশোর
১৪৬	দৈনিক গ্রামের কাগজ	"
১৪৭	দৈনিক স্পন্দন	"
১৪৮	দৈনিক সমাজের কথা	"
১৪৯	দৈনিক গ্রামের কণ্ঠ	"
১৫০	দৈনিক নবচিত্র	ঝিনাইদহ
১৫১	দৈনিক ওশান	নড়াইল
১৫২	দৈনিক খেদমত	মাগুরা
১৫৩	দৈনিক বজ্রপাত	কুষ্টিয়া
১৫৪	দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা	"
১৫৫	দৈনিক আন্দোলনের বাজার	"
১৫৬	দৈনিক কুষ্টিয়া	"
১৫৭	দৈনিক আজকের আলো	"
১৫৮	দৈনিক দেশ তথ্য	"
১৫৯	দৈনিক হাওয়া	"
১৬০	দৈনিক মাথাভাঙ্গা	চুয়াডাংগা
১৬১	দৈনিক আজকের বার্তা	বরিশাল
১৬২	দৈনিক আজকের পরিবর্তন	"
১৬৩	দৈনিক মতবাদ	"
১৬৪	দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল	"
১৬৫	দৈনিক শাহনামা	"
১৬৬	দৈনিক সত্য সংবাদ	"
১৬৭	দৈনিক বরিশাল বার্তা	"
১৬৮	দৈনিক বাংলার বনে	"
১৬৯	দৈনিক বরিশাল প্রতিদিন	"
১৭০	দৈনিক ভোরের অঙ্গীকার	"
১৭১	দৈনিক শতকণ্ঠ	ঝালকাঠি
১৭২	দৈনিক ঝালকাঠি বার্তা	"
১৭৩	দৈনিক জনগণ	পিরোজপুর
১৭৪	দৈনিক পিরোজপুরের কথা	"
১৭৫	দৈনিক বাংলার কণ্ঠ	ভোলা
১৭৬	দৈনিক আজকের ভোলা	"
১৭৭	দৈনিক রূপান্তর	পটুয়াখালী
১৭৮	দৈনিক সাথী	"
১৭৯	দৈনিক গণদাবী	"
১৮০	দৈনিক তেতুলিয়া	"
১৮১	দৈনিক দীপাঞ্চল	বরগুনা
১৮২	দৈনিক সৈকত সংবাদ	"
১৮৩	দৈনিক সিলেটের ডাক	সিলেট

Dhaka University Institutional Repository

১৮৪	দৈনিক জালালাবাদ	"
১৮৫	দৈনিক শ্যামল সিলেট	"
১৮৬	দৈনিক সিলেট বাণী	"
১৮৭	দৈনিক সিলেট সংলাপ	"
১৮৮	দৈনিক কাজিরবাজার	"
১৮৯	দৈনিক যুগভেরী	"
১৯০	দৈনিক জৈন্তাবার্তা	"
১৯১	দৈনিক বৃহত্তর সিলেটের মানচিত্র	"
১৯২	দৈনিক উত্তরপূর্ব	"
১৯৩	দৈনিক বাংলার দিন	মৌলভীবাজার
১৯৪	দৈনিক প্রতিদিনের বাণী	হবিগঞ্জ
১৯৫	দৈনিক প্রভাকর	"
১৯৬	দৈনিক হবিগঞ্জ এক্সপ্রেস	"
১৯৭	দৈনিক খোয়াই	"
১৯৮	দৈনিক দেশপ্রান্ত	সুনামগঞ্জ

ঢাকা থেকে প্রকাশিত মিডিয়াভুক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম
১।	সাপ্তাহিক রোববার
২।	" চিত্র বাংলা
৩।	" সোনার বাংলা
৪।	" হলিডে
৫।	" ঢাকা কোরিয়ার
৬।	" সাঃ ২০০০
৭।	" বিচিত্রা
৮।	" শীর্ষ কাগজ
৯।	" বর্তমান দিনকাল
১০।	" আজকের সূর্যোদয়
১১।	" প্রতিবেশী
১২।	" ইকনোমিক টাইমস
১৩।	" প্রতিযুগ
১৪।	" চাকুরীর খবর
১৫।	" স্পষ্ট কথা
১৬।	" বেগম
১৭।	" মুসলিম জাহান
১৮।	" দেওয়ানবাগ
১৯।	" উদয়ের পথে
২০।	" একুশে
২১।	" পেনসিল
২২।	" আপাতত

Dhaka University Institutional Repository

২৩।	" অর্থ বাণিজ্য
২৪।	" সভ্যতা
২৫।	" দি ম্যাসেজ
২৬।	" বিন্দু থেকে বৃত্ত
২৭।	" অর্থ নৈতিক পরিক্রমা
২৮।	" সুসময়
২৯।	" সত্যকণ্ঠ
৩০।	" এদিন
৩১।	" তথ্য বাণী
৩২।	" দেশ মাতৃকা
৩৩।	" দেশপত্র
৩৪।	" যুব কণ্ঠ
৩৫।	" নতুন বাংলা
৩৬।	" কাবেরী
৩৭।	" অগ্রযাত্রা
৩৮।	" আইন সমাজ
৩৯।	" দেশচিন্তা
৪০।	" আজকের নিবেদন
৪১।	" একতা
৪২।	" নিয়োগ
৪৩।	" ঢাকা মিডিয়া
৪৪।	" বর্তমান সংলাপ
৪৫।	" কুশল
৪৬।	" পাঞ্জেরী
৪৭।	" রহস্য জগৎ
৪৮।	সাপ্তাহিক সিটিজেন
৪৯।	" অপরাধ বিচিত্রা
৫০।	" বাংলার একুশ
৫১।	" চূড়ান্ত রিপোর্ট
৫২।	" আইনকোষ
৫৩।	" তথ্য প্রযুক্তি
৫৪।	" চিরন্তন
৫৫।	" আইন পক্ষ
৫৬।	" প্যানোরমা
৫৭।	" স্বদেশ খবর
৫৮।	" অন্যায়ের প্রতিবাদ
৫৯।	" রক্তিম সূর্য
৬০।	" নতুন কথা
৬১।	" গোর্কি পত্রিকা
৬২।	" শারদীয়া

Dhaka University Institutional Repository

৬৩।	" সত্য সমাচার
৬৪।	" নয়া অর্থনীতি

মফস্বলের মিডিয়া তালিকাভুক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	জেলার নাম
০১.	সাপ্তাহিক ইসতেহাদ	চট্টগ্রাম
০২.	" চট্টলা	"
০৩.	" বরগুনা	বরগুনা
০৪.	" নাটোর বার্তা	নাটোর
০৫.	" খুলনার বাণী	খুলনা
০৬.	" লাকসাম বার্তা	কুমিল্লা
০৭.	" বাংলা বার্তা	"
০৮.	" টেলিফোন	"
০৯.	" অপরাধ সংবাদ	"
১০.	" নতুন পত্র	"
১১.	" আলোর দিশারী	"
১২.	" জাতীয় বাংলাদেশ	নোয়াখালী
১৩.	" হাজারিকা	ফেনী
১৪.	" হকার্স	"
১৫	" জাতীয় বার্তা	"
১৬	" ফেনী বার্তা	"
১৭.	" দামামা	লক্ষ্মীপুর
১৮.	" নরসিংদীর খবর	নরসিংদী
১৯.	" খোরাক	"
২০.	" নরসিংদীর কথা	"
২১.	" আবাবিল	মানিকগঞ্জ
২২.	" সুবাণী	গাজীপুর
২৩.	" জামালপুর সংবাদ	জামালপুর
২৪.	" আল মিনার	ময়মনসিংহ
২৫.	" আলাপসিংহ	"
২৬.	" গণমন	উরিদপুর
২৭.	" আল হেলাল	"
২৮.	" দেশের সংবাদ	শরীয়তপুর
২৯.	" আজকের শেরপুর	বগুড়া
৩০.	" রাজবাড়ী কণ্ঠ	রাজবাড়ী
৩১.	" সাহসী সময়	"
৩২.	" অনুসন্ধান	"
৩৩.	" পিরোজপুরের খবর	পিরোজপুর
৩৪.	" দখিন বার্তা	বাগেরহাট
৩৫.	" ইস্পাত	কুষ্টিয়া

Dhaka University Institutional Repository

৩৬.	" তথ্য কথা	কুড়িগ্রাম
৩৭.	সাপ্তাহিক দশকাহনীয়া	শেরপুর
৩৮.	" শেরপুর	"
৩৯	" নির্বাণ	ঝিনাইদহ
৪০	" সীমান্ত বাণী	"
৪১.	" চুয়াডাংগা দর্পন	চুয়াডাংগা
৪২.	" নীলফামারী বার্তা	নীলফামারী
৪৩.	" আলাপন	"
৪৪.	সাপ্তাহিক দাগ	"
৪৫.	" তরক বার্তা	হবিগঞ্জ
৪৬.	" জীবন বার্তা	সিরাজগঞ্জ
৪৭.	" প্রতিচ্ছবি	বি-বাড়িয়া

ঢাকা ও মফস্বলের মিডিয়া তালিকাভুক্ত পাক্ষিক পত্রিকা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম
০১.	পাক্ষিক অনন্যা
০২.	" ফিন্যান্সিয়াল নিউজ
০৩.	" দি মনিটর
০৪.	" ক্রীড়ালোক
০৫.	" কৃষি বিপ্লব
০৬.	" আনন্দ ধারা
০৭.	" ব্যাংক বীমা
০৮.	" আনন্দ ভুবন
০৯.	" শীর্ষ সংবাদ
১০.	" দি স্পোকস ম্যান
১১.	" আনন্দ নগর
১২.	" অন্যদিন
১৩.	" মানবাধিকার
১৪.	" সচিত্র মহিলা (চট্টগ্রাম)
১৫.	" তাবলীগ (পিরোজপুর)
১৬.	" মেহেদী (কক্সবাজার)
১৭.	" কচুয়া বার্তা (কুমিল্লা)

ঢাকা ও মফস্বলের মিডিয়া তালিকাভুক্ত মাসিক পত্রিকা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম
০১.	মাসিক আত্মার বাণী
০২.	" মদিনা
০৩.	" পৃথিবী
০৪.	" প্রতিফলন

Dhaka University Institutional Repository

০৫.	" কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
০৬.	" অবাক পৃথিবী
০৭.	" লক্ষ্মীপুর বার্তা
০৮.	" দারুসসালাম
০৯.	" আপনার স্বাস্থ্য
১০.	" ইছামতি বাণী
১১.	" চন্দ্রপাড়া
১২.	" আইন বার্তা
১৩.	" বাণিজ্য বিচিত্রা
১৪.	" মনোজগৎ
১৫.	" নিরীক্ষা
১৬.	" আল বাইয়্যিনাত
১৭.	" সত্যপ্রবাহ
১৮.	"ইকনমিক অবজারভার
১৯.	" রাজস্ব
২০.	" বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট
২১.	" বাংলার মেইল
২২.	" বিশ্ব বার্তা
২৩.	" সরগম
২৪.	" রাহমানী পয়গাম
২৫.	" পোল্ট্রি খামার বিচিত্রা
২৬.	" অগ্রদূত
২৭.	" আলোক ধারা (চট্টগ্রাম)
২৮.	" জয়ভেরী (কুমিল্লা)
২৯.	" গ্রামীণ খবর (নরসিংদী)
৩০.	" সরাসরি (ফেনী)

মিডিয়া তালিকাভুক্ত ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম
০১.	ত্রৈমাসিক চয়ন

মিডিয়া তালিকাভুক্ত ষান্মাসিক পত্রিকা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম
০১.	ষান্মাসিক অঞ্জলি লহ মোর (নওগাঁ)

সূত্র : www.DFP.Gov.BD.com

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা কেন্দ্রীক বাংলাদেশের প্রধান টেলিভিশন

১. বাংলাদেশ টেলিভিশন
২. এটিএনবাংলা
৩. চ্যানেল আই
৪. এনটিভি
৫. একুশে টেলিভিশন
৬. আরটিভি
৭. বাংলাভিশন
৮. বৈশাখী
৯. দিগন্ত টেলিভিশন
১০. ইসলামী টেলিভিশন
১১. এটিএননিউজ
১২. সময় টেলিভিশন
১৩. মাছরাঙা টেলিভিশন
১৪. ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশন
১৫. মোহনা টেলিভিশন
১৬. মাইটিভি
১৭. গাজী টেলিভিশন
১৮. চ্যানেল ৯
১৯. চ্যানেল ৪
২০. যমুনা টেলিভিশন (আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে)

* এছাড়া আরও কয়েকটি টিভি রয়েছে।

ঢাকা কেন্দ্রীক বাংলাদেশের প্রধান বেতারগুলো

১. বাংলাদেশ বেতার
২. রেডিওটুডে
৩. রেডিওআমার
৪. রেডিওফুর্তি
৫. এবিসি রেডিও

* এছাড়া আরও কিছু বার্তা সংস্থা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা কেন্দ্রীক বাংলাদেশের প্রধান বার্তা সংস্থাসমুহ

১. বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
২. ইউএনবি
৩. বিডিনিউজ২৪ডটকম
৪. বাংলানিউজ২৪ডটকম
৫. বার্তা২৪ডটকম

* এছাড়া আরও কিছু বার্তা সংস্থা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট গ

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য

লিঙ্গ ও বাসস্থান বা অবস্থান

লিঙ্গ	শহর	মফস্বল**	গ্রাম*	মোট
পুরুষ	৪৩	১৩	৪	৬০
	৬৬.১৫%	২০%	৬.১৫%	
নারী	১		৩	৪
	১.৫৩%		৪.৬১%	
				৬৪জন
				৯৮.৪৬%

পেশা

লিঙ্গ	চাকরি সরকারি	চাকরি বেসরকারি	শিক্ষক	সাংবাদিক	রাজনীতি	ব্যবসা	ছাত্রছাত্রী	দিনমজুর শ্রমিক	এনজিও কর্মী	গৃহিণী
পুরুষ	৫	৫	২	১৫	১	৫	১৭	১০	১	
	৭.৬৯%	৭.৬৯%	৩.০৭%	২৩.০৭%	১.৫৩%	৭.৬৯%	২৬.১৫%	১৫.৩৮%	১.৫৩%	
নারী							১			৩
							১.৫৩%			৪.৬১%

বয়স

লিঙ্গ	১০-২০	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-তদুর্ধ্ব
পুরুষ	১০	২৫	১০	১০	৬
	১৫.৩৮%	৩৮.৪৬%	১৫.৩৮%	১৫.৩৮%	৯.২৩%
নারী		১	২	১	
		১.৫৩%	৩.০৭%	১.৫৩%	

শিক্ষাগত যোগ্যতা

লিঙ্গ	১ম-৫ম	৬ষ্ঠ-এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক-স্নাতকোত্তর	ডপ্এইচডি	নিরক্ষর/ সাক্ষর
পুরুষ	২	১০	১৫	২৬	৩	৫
	৩.০৭%	১৫.৩৮%	২৩.০৭%	৪০%	৪.৬১%	৭.৬৯%
নারী	১	২		১		
	১.৫৩%	৩.০৭%		১.৫৩%		